বাগদাদের
ঈগল
[দ্বিতীয় খণ্ড]
এম আর মাছুম বিল্লাহ

বাগদাদের ঈগল

২য় খণ্ড

লেখকের কৈফিয়ত

সম্মানিত পাঠক! সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর আজ আপনাদের হাতে 'বাগদাদের ঈগল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডটি তুলে দিতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জানাচ্ছি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তাঁর করুণা ব্যতীত এরকম একটি স্পর্শকাতর যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত প্রান্তর চষে গল্প-উপন্যাসের তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ করার মতো যোগ্যতা বা সামর্থ্য কোনোটিই আমার ছিল না। সুতরাং সব প্রশংসা পাওয়ার হকদার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

সুপ্রিয় পাঠক! এই লেখাটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'লেখকের কৈফিয়ত'। এর কারণ হলো, সেই ২০০৭ সাল থেকে আজ প্রায় ৭-৮টি বছর আপনারা অপেক্ষার প্রহর গুণেছেন; যেটা আসলেই একটা অগ্রহণযোগ্য কাজ। এ জন্যে আপনাদের সমীপে দু-একটি কথা বলতে চাই। এই লম্বা সময় অপেক্ষার পেছনে অন্যতম কারণ হলো আমাদের সাবেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। যে বছর বাগদাদের ঈগল ওই প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়, তার কিছুকাল পরেই বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা থেকে নোয়াখালীতে স্থানান্তর করা হয়। এর মধ্যে ২০০৮ সালে আমি দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিও সেখানে পাঠাই। কিন্তু আজ-কাল করে-করে বইটি প্রকাশিতও হয়নি, পাণ্ডুলিপিটিও ফেরত আসেনি। আর সে কারণেই অপেক্ষার পালা এত দীর্ঘ। অবশ্য এর পরেও ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য একথাগুলো বলিনি। প্রসঙ্গ এসে গেল; তাই বলে ফেললাম। আমি এখনও ওই প্রতিষ্ঠান ও তার মালিকের কল্যাণ কামনা করি।

প্রিয় পাঠক! সেই পুরনো কথাটিই পুনরুল্লেখ করতে চাই যে, ভুল-ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন। সম্ভব হলে আমাদের জ্ঞাত করবেন। আমাদের পক্ষ থেকে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

অপেক্ষার পালা শেষ করে 'বাগদাদের ঈগল' ২য় খণ্ড এখন আপনাদের হাতে। আশা করি প্রথম খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও আপনাদের সমাদর লাভ করতে সক্ষম হবে।

রফরফ বুক পয়েন্টেরে সত্ত্বাধিকারী মাওলানা আব্দুল আজীজ প্রথম খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিমার্জিতরূপে বাজারজাতের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর এই শ্রম কবুল করুন এবং তাঁকে আরও বেশি-বেশি তাওফীক দান করুন। তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি আল্লাহ কবুল করুন। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন।

বিনীত
এম. আর মাছুম বিল্লাহ

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী আজ চলছে মুসলিম-নিধনের মহোৎসব। আপনি যেদিকে নজর দিবেন, সেদিকেই দেখতে পাবেন নির্যাতিত মুসলমানের হাহাকার আর কান্নার রোল। কান পাতলেই শুনতে পাবেন নিষ্পাপ শিশুদের কলিজাছেঁড়া সকরুণ আর্তনাদ। এরই ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ এক সময়কার ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন জোটবাহিনীর নিধনযজ্ঞ শুরু হলো। কূটচালের মাধ্যমে মার্কিনিরা মাত্র বিশ দিনের যুদ্ধে রাজধানী বাগদাদসহ সমগ্র ইরাক দখলে নিল। তারপর শুরু হলো ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা। কিন্তু কেন এই আগ্রাসন? কেন এই আক্রমণ? কেন এই নিধনযজ্ঞ? কেন এই অমানবিক তাণ্ডবলীলা? এই 'কেনগুলো'র উত্তরে বিশ্ববিবেক আজ নিশ্চুপ, নির্বিকার!

যুদ্ধ মানেই আপাতত ধ্বংস, কান্না আর আর্তনাদ। তাই যুদ্ধ মানুষের কাম্য হতে পারে না। যুদ্ধ বাঞ্ছিত কোনো বিষয় নয়। কিন্তু কোনো কারণে যদি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন তাকে এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ থাকে না। যেমন– ১৯৭১ সালে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল একটি অসম যুদ্ধ। শান্তিপ্রিয় বাঙালিরা সেদিন চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধকে এড়িয়ে যায়নি। আত্মাভিমানী ইরাকি জাতিও মার্কিনিদের অযৌক্তিক দখলদারিত্বকে মেনে নেয়নি। স্বদেশভূমিতে বিদেশিদের উপস্থিতি দেশপ্রেমিক ইরাকিরা বরদাশত করেনি। আর তাই তারা ভাঙাচোরা অস্ত্র-বন্দুক, যার কাছে যা ছিল তা নিয়েই আগ্রাসী বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিল। প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে শুরু করেছিল মুক্তির লড়াই। তাদের প্রতিরোধের মুখে হানাদার বাহিনীর উন্নতসব প্রযুক্তিও একপ্রকার অকেজো হয়ে পড়েছিল।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, ইরাকি মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের পাশে কোনো বন্ধু বা ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্রের সহায়তা না পাওয়ায় হানাদাররা বিজয়ের পতাকা উড়াতে সক্ষম হয়েছে। উপরন্তু হানাদারদের দোসর-দালালদের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে একটা পুতুল সরকার। ইরাকে আজ দেশবিরোধী বিশ্বাসঘাতকদের সুদিন। তবে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের শেষ সৈন্যটার ইরাক ত্যাগ না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবে গর্বিত একটি জাতি হিসেবে আমরা ইরাকি মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। কেননা, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশটি হলো ইরাক। তাই তাদের মুক্তির লড়াইয়ে আমাদের সমর্থন ও সহানুভূতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর সেই অনুভূতি থেকেই আমার 'বাগদাদের ঈগল' উপন্যাসটি লেখা।

'বাগদাদের ঈগল' ইরাকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি প্রামাণ্য উপন্যাস। এর চরিত্রগুলো উপন্যাসধর্মী হলেও তথ্য-উপাত্তগুলো বাস্তব। এতে ঠাঁই পেয়েছে ইরাকি মুজাহিদ তথা মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার দাস্তান, কারাগারগুলোতে নিরপরাধ বন্দীদের উপর পৈশাচিক ও অমানবিক নির্যাতনের করুণ কাহিনী এবং আমেরিকার তথাকথিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপ। সেই সাথে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের জানা-অজানা বিস্ময়কর নানা তথ্য। এছাড়া আছে অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর বাংকার কাহিনী। নিরস্ত্রপ্রায় ইরাকি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সুপার পাওয়ার মার্কিন বাহিনীর রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার কাহিনীমালা এবং ইরাকের ইতিহাস-ঐতিহ্যের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ।

প্রিয় পাঠকসমাজের প্রতি আমার সবিনয় আরজ, আমি একজন নতুন লেখক! 'বাগদাদের ঈগল' আমার প্রথম বই। কিন্তু এ ধরনের বই লিখতে যে পরিমাণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তার কোনটাই বলতে গেলে আমার নেই! তদুপরি অত্যধিক আবেগপ্রবণতাই আমাকে এরকম একটি বিশাল কাজে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভরসাকে পুঁজি করে হাতে কলম তুলে নিলাম। কী লিখলাম তা আপনার সম্মুখে! আমি জানি, আপনার সতর্ক দৃষ্টিতে এই লেখার অসংখ্য ভুলই ধরা পড়বে। সেজন্য অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সেই সাথে আপনার গোচরীভূত ত্রুটিগুলো অবগত করাবেন বলে প্রত্যাশা রাখছি। পরিশেষে আল্লাহ এই বই প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহ-পরকালে সাফল্য দান করুন এবং ইরাকসহ গোটা মুসলিম উম্মাহকে জালিমদের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দিন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

এম. আর. মাসুম বিল্লাহ
১৪.০৪.২০০৪ ইং

প্রকাশকের কথা

উপন্যাস সাহিত্যে বাংলাদেশের ইসলামী বইয়ের বাজার এখন বেশ সমৃদ্ধ। বেশিরভাগ ইসলামী উপন্যাসই ইসলামের সংগ্রামী ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা। বাংলাভাষী পাঠকসমাজেও এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো বেশ সমাদৃত। এতে একদিকে যেমন অতীতের ইতিহাস জানা যায়, তেমনি অপরদিকে উপন্যাসের স্বাদ-রোমাঞ্চও উপভোগ করা যায়।

'বাগদাদের ঈগল' এ-জাতীয় একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। বইটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ভূখণ্ড ইরাকের উপর মার্কিন আগ্রাসনের রোমহর্ষক কাহিনী ও ঈমানদার দেশপ্রেমিক ইরাকিদের দুর্ধর্ষ প্রতিরোধের উপাখ্যান নিয়ে রচিত। তরুণ আলেমে দ্বীন **এম. আর মাছুম বিল্লাহ** ঘামঝরা পরিশ্রমের মাধ্যমে বইটি রচনা করেছেন। ২০০৭ সালে একটি প্রকাশনী বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছিল। আমরা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে এই খণ্ডটি প্রকাশ করার পর এবার দ্বিতীয় খণ্ডটিও পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

সুপ্রিয় পাঠক! আশা করি, আপনারা আমাদের উৎসাহিত করবেন। আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় অনুপ্রাণিত করবেন। মহান আল্লাহর করুণাই আমাদের বড় পুঁজি। তিনি আমাদের কবুল করুন। সারা পৃথিবীর সমস্ত ঈমানদার জনতাকে নিরাপদ রাখুন। আমীন। আল্লাহ চাইলে আবার দেখা হবে পরবর্তী প্রকাশনায়।

আব্দুল আজীজ
২০. ২. ২০১৪

এক.

সালমান দ্বিতীয়বার ইরাক সফরে যাচ্ছে। বিমানে চোখ বন্ধ অবস্থায় সে তার প্রিয়তমার কথা ভাবতে-ভাবতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে-করতে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল। নিদ্রিত সালমান দেহখানা বিমানে রেখে স্বপ্নডানায় ভর করে মনপাখির সহায়তায় সত্যিই তার প্রেয়সীর শহর বাগদাদে চলে এল। সেখানে সে নিজেকে আবিষ্কার করল কারাগারে। কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেও সে নির্বিঘ্নে হেঁটে বেড়াচ্ছে; কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না।

সালমান কারাগারে হাঁটতে-হাঁটতে একসময় টর্চার সেলের নিকট উপস্থিত হল। বন্দি নির্যাতনের দৃশ্য দেখে সে আঁৎকে উঠল। এক-একজন বন্দিকে একেক ধরনের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সহসা নির্যাতিত এক বন্দির উপর তার দৃষ্টি আটকে গেল। সে উক্ত বন্দীকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। তার চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। যেন সমগ্র শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। নিজের ভারসাম্য বহন করে সে আর দাঁড়িয়েও থাকতে পারছে না। চোখ তুলে এ করুণ দৃশ্য দেখার মতো শক্তি-ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

উক্ত বন্দি হলেন মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব। সালমানের শ্বশুর। মেজর সাহেব তাকে দেখে জানালার পার্শ্বে এলেন। তিনি তাকে কিছু বলতে চাচ্ছেন; কিন্তু কষ্টের কারণে বলতে পারছেন না। প্রতিবারই তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি যা মুখে ব্যক্ত করতে পারছেন না, তা তার চোখের অশ্রুমালা বুঝিয়ে দিচ্ছে সালমানকে। শ্বশুরের অসহায়ত্ব ও কান্না দেখে সেও বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তার বুকটাও অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার মতো ভাষা সে তার মনের অভিধানে খুঁজে পেল না। সেও কান্না জুড়ে দিল। অবশেষে মেজর সাহেব কান্না থামিয়ে বললেন, 'বেটা সালমান! তুমি জলদি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। নতুবা তোমাকেও আমার মতো বন্দিত্ব বরণ করতে হবে। আর এত কিছুর পর তুমিও যদি বন্দি হও, তাহলে আমার মা-মণি রুকাইয়া একদম পাগল হয়ে যাবে। তোমাকে সে উদ্ভ্রান্তের মতো খুঁজে ফিরছে। আমি কোনোমতেই তাকে বিশ্বাস করাতে পারিনি, তুমি ইরাকে নেই।'

সালমান কিছু বলতে যাবে এরই মধ্যে পাশের সিটের ভদ্রলোকের ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙে গেল। এমন একটি মুহূর্তে ঘুম ভেঙে দেওয়ায় তার মেজাজটা গরম হয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক হাসি মুখে বললেন, 'জনাব! আপনি ঘুমের ঘোরে কাঁদছিলেন কেন? কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলেন নাকি?'

ভদ্রলোকের এমন সহানুভূতিমূলক প্রশ্নের জবাবে সালমান তাকে কিছু বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। তবে তার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সে স্বপ্নের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগল। হায়! হায়! বিমানে বসে আজ এ কী দেখল সে! তবে কি তার শ্বশুরকে...! না। সে আর ভাবতে পারল না।

মানুষের জীবনের অসংখ্য রহস্যের মধ্যে স্বপ্ন এমন একটি রহস্য, যার দ্বার উন্মোচন করা মানুষের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে মানুষের জীবনে স্বপ্নের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকে, যা অস্বীকার করার কোনো জো নেই। বাস্তব ঘটনাবলি যে শক্তির প্রভাবে মনের মধ্যে রেখাপাত করে, সেই একই শক্তির প্রভাবে স্বপ্নে দেখা ঘটনাসমূহ মানসপটে রেখাপাত করে।

সালমান তার দেখা স্বপ্নটিকে নিছক স্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দিতে পারল না। স্বপ্নের বিষয়টি তাকে এক গভীর ভাবনায় ফেলে দিল। ব্যাপারটি নিয়ে যত ভাবে, ততই তার মন বিষিয়ে উঠতে থাকে। তবে কি মার্কিনিরা সত্যি-সত্যি মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবকে গ্রেফতার করেছে? না, এ বিষয়টি নিয়ে সে আর ভাবতে পারছে না। ঘটনা যা-ই ঘটুক, ইরাক গিয়ে সবই জানা যাবে ভেবে সে আপাতত মনকে প্রবোধ দিল। এছাড়া এ মুহূর্তে তার আর কি-ইবা করার আছে? মনে-মনে সে শ্বশুরসহ তার পরিবারের ও দেশের সকলের কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করছে এবং দ্রুত তাদের সাথে মিলিত হওয়ার উদগ্র বাসনা বুকে চেপে চুপচাপ বসে আছে।

কিছুক্ষণ পরই বিমানের কন্ট্রোল রুম থেকে ভেসে এল বিমান অবতরণের ঘোষণা। ঘোষণা শুনে সালমানের চমক ভাঙল। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল রাত ১০টা। আশপাশে তাকিয়ে দেখল, যাত্রীরা সবাই নামার জন্য ব্যস্ত। অন্যদের সাথে সেও নেমে এল বিমান থেকে। বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের কাজ সেরে বের হতে রাত ১১টা বাজল। রাতের দামেস্ক নগরী তার কাছে এক স্বপ্নপুরী বলে মনে হতে লাগল। সালমান বিমানবন্দর থেকে বের হল এবং বন্দরের বাইরে সারিবদ্ধ পার্ক করা গাড়ি থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করল। গাড়িতে মালামাল উঠানো হল। নিজে উঠে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল।

দামেস্ক শহরের প্রশস্ত রাস্তায় ছুটে চলল গাড়ি। প্রায় ২০ মিনিটের মাথায় ট্যাক্সিক্যাবটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পাঁচতারা হোটেল 'ফিন্দাক আল-বুরদা'র সম্মুখে এসে থামল।

সালমান গাড়ি থেকে নেমে লাগেজপত্র নিয়ে হোটেলের প্রবেশপথের দিকে অগ্রসর হল। গেটে নিরাপত্তাকর্মীরা তার পরিচয় জানতে চাইলে সে তার ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিজমের আইডি কার্ড শো করল। তারা সেটা নিরীক্ষা করে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দিল। সে হোটেলে প্রবেশ করে কিছুদূর ভিতরে অগ্রসর হতেই সুদর্শন এক নওজোয়ান তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। হোটেলের

কর্মচারীরা তার হাত থেকে মালামালগুলো একপ্রকার ছিনিয়েই নিল। সে হতচকিতের মতো তাকিয়ে রইল সম্মুখে দণ্ডায়মান যুবকের দিকে। কোনো কিছু বলার মতো ভাষা সে খুঁজে পেল না এ মুহূর্তে।

পথরোধকারী যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে সালমান কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। যুবকও কিছু বলছে না। শুধু তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। যুবকটিকে তার কেমন পরিচিত-পরিচিত মনে হচ্ছে। আর তাই স্মৃতির পাতা হাতড়িয়ে সে যুবকের পরিচয় খুঁজতে লাগল। পাকিস্তানেই তাকে কোথাও একাধিকবার দেখেছে মনে পড়ল।

অবশেষে পেল তার পরিচয়। এ যে আর কেউ নয়, তার বাল্যবন্ধু হাসনাইন। যার সাথে কেটেছে তার জীবনের একটি মধুময় সময়। নিমিষেই তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল, ছোট্ট বেলায় একত্রে হিফজ বিভাগে পড়ত তারা দুজন। ছবক শোনানো নিয়ে দুজনে চলত তীব্র প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার কারণেই তারা দ্রুত হেফজ শেষ করতে পেরেছিল। আর সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা তাদের বন্ধুত্বের স্মৃতিকে চির জাগ্রত করে রেখেছে, তা হল, জাতীয় পর্যায়ে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় তাদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। যে লড়াইয়ে কেউ হারেনি, কেউ জিতেনি। অবশেষে বিচারক দুজনকেই ফাস্ট প্রাইজ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু সালমান ভেবে পাচ্ছে না, তার বন্ধু হাসনাইন এখানে কেন! সে বিশ্বাস করতেই পারছে না, তার সেই বাল্যবন্ধু এখন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বন্ধু তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। প্রাথমিক কুশলাদি বিনিময়ের পর বন্ধু তাকে নিয়ে গেল হোটেলের অষ্টম তলায় তার নিজের রুমে।

'হাসনাইন! তুই সিরিয়ায় এলি কবে?' – সালমান বন্ধুর কাছে জানতে চাইল – 'আর এখানেইবা কী করিস্? আমি আসব সেটাও বা জানলি কেমন করে?'

'আমি সিরিয়ায় এসেছি আজ প্রায় তিন বছর হল' – হাসনাইন বলল – 'এখানে এই হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। তুই আসবি সেটা জেনেছি জনাব নঈমুল হাসান আল হেজাযী সাহেবের কাছ থেকে। তিনি বিকেলে আমাকে ফোন করেছিলেন।

'নঈমুল হাসান সাহেব ফোন করেছিলেন! – সালমান আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল – 'তার সাথে তোর জানাশোনা আছে বুঝি?'

'গত বছর তিনি সিরিয়া সফরে এখানে চার দিন ছিলেন।' হাসনাইন বলল।

'আচ্ছা, তাই বল্' – সালমান বলল – 'এজন্যই তিনি বারবার আমাকে ফিন্দাক আল-বুরদায় ওঠার তাগিদ করেছিলেন। আসলে বেচারা অধীনদের ব্যাপারে খুবই সচেতন।'

'এরাই প্রকৃত মানুষ' – হাসনাইন বলল – 'তা তুই হঠাৎ সিরিয়ায় কেন সালমান?'

সালমান বন্ধুর কাছে তার সিরিয়া আগমনের উদ্দেশ্য সবিস্তারে ব্যক্ত করল। সব শুনে বন্ধু হাসনাইন প্রস্তাব দিল, সীমান্ত পার করে সে-ই তাকে বাগদাদ পর্যন্ত পৌছার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তবে শর্ত হল তাকে বন্ধুর সাথে দুদিন এখানে অবস্থান করতে হবে।

সালমান বন্ধুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, তার দ্রুত ইরাক পৌছা প্রয়োজন। কিন্তু কিছুতেই সে তাকে ছাড়তে রাজী নয়। উপরন্তু সে আবদার জুড়ে দিয়ে বলল, 'সালমান! সেই ছোটবেলা থেকে দুই বন্ধু একত্রে থেকেছি পড়াশোনা, খেলাধুলাসহ সকল ক্ষেত্রে। কিন্তু কর্মজীবনে পা দিয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এমনকি বিদেশে আসার প্রাক্কালে তোর সাথে একটু দেখা করা, এখানে আসার পর তোর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা কোনটাই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তারপর আজ কতটা দিন বাদে তোর সাথে সাক্ষাত, সেজন্য আমাকে সামান্য মেহমানদারি করার সুযোগ তোর দেওয়া উচিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি এই দেশটাকে একটু কাছ থেকে দেখা তোর একান্ত কর্তব্য। তুই যেহেতু লেখক-সাংবাদিক, তাই তোর জন্য এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ের দর্শন মিলবে, আমি তা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি।'

সালমান এবার বন্ধুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারল না। সময় কিছু নষ্ট হলেও দু-এক দিন সিরিয়ায় থাকতে সে রাজি হল। আর তাতে বন্ধু হাসনাইন যারপরনাই খুশি হয়ে আনন্দিত চিত্তে বলল, 'দোস্ত! ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা এমন একটি দেশ ভ্রমণ করে দেখব, যার ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ।'

'হাসনাইন! তুই তো বেশ ক-বছর ধরে সিরিয়ায় অবস্থান করছিস্। সে কারণে তুই ঐতিহাসিক সিরিয়ার সেইসব চমকপ্রদ ইতিহাস সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কম-বেশি অবগত আছিস্। তার থেকে কিছু শোনালে খুশি হতাম।'

'তুই শুনতে চাইলে আমি অবশ্যই শোনাব' – বলল হাসনাইন – 'অনেক দিন হয় মন খুলে গল্প করার লোক পাই না। আজ দুই বন্ধু গল্প-আলোচনা করতে-করতে রাত কাটিয়ে দেব। কী, পারবি সারা রাত জেগে থাকতে?'

'সারা রাত না পারলেও আরো দু-এক ঘণ্টা তো অবশ্যই পারব' – উত্তর দিল সালমান – 'আজকে সফর করে না এলে সারা রাতই জাগতে পারতাম। আচ্ছা, এবার তুই বল্!'

'বলছি তবে শোন্' – বলা শুরু করল হাসনাইন – 'সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক, যা বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি। কারো-কারো ধারণামতে, হযরত নূহ (আ.) প্লাবনের পর কিশতি থেকে অবতরণ করে সর্বপ্রথম দুটি বসতি আবাদ করেন। প্রথমে হাররান, পরে দামেস্ক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু-হাজার দুশ'

ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই নগরীর ঋতু ও জলবায়ু অত্যন্ত মনোরম। পাশেই ভূমধ্যসাগরের উপস্থিতির কারণে মরুভূমির খরতাপ ও উত্তরের ঠাণ্ডা থেকে এর আবহাওয়া মুক্ত। শতীকালে তুষারপাত হয় এবং প্রচণ্ড গরমের রাতও ঠাণ্ডা-আরামদায়ক। এজন্যই দামেস্ক ছিল সিরিয়ার বেহেস্ত হিসেবে পরিচিত। যেকোনো ভ্রমণবিলাসীর জন্য এটি বড় চমৎকার একটি স্থান।'

হাসনাইন একটু থেমে একজন হোটেলবয়কে ডেকে তাদের জন্য খানা আনতে বলে পুনরায় শুরু করল–

'সালমান! শুধু দামেস্কই নয়, বরং গোটা সিরিয়াই একসময় প্রাচুর্যের একটি দেশ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অসংখ্য শক্তি এই নগর, এই রাষ্ট্র শাসন করেছিল। ইসলামের উদয়ের সময় এটি রোমের বাইজেন্টাইন রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা ছিল। যে সকল উপলক্ষ্য ও কারণ বিদ্যমান থাকার দরুন মুসলমানরা অন্য রাজ্যে অগ্রাভিযান পরিচালনা করে থাকে; সিরিয়ায়ও তখন সেই কারণগুলো বিদ্যমান ছিল। সেসময় হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা.) মাত্র পনেরো মাস সময়ের মধ্যে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রায় সবটুকু পদানত করে ফেলেছেন। তৎকালীন দক্ষিণ ইরাকের হীরা রাজ্য, শাতিল আরবের উবুল্লা প্রদেশ, প্রাচীন ব্যাবিলিয়নের অর্ধেক, কলদা রাজ্য ও ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরের গোটা অঞ্চল তার পদানত। এখন শুধু ফোরাত নদী অতিক্রম করে কাদেসিয়ায় আক্রমণ করে রাসূল (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করা 'ক্ষুদ্র একদল মুসলমান কিসরার শ্বেতপ্রাসাদ জয় করবে'। তিনি হতে চাচ্ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপদানকারী। তাই তিনি যে সময় সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তৎপর, এমন সময় এল মদীনার চিঠি। মদীনা থেকে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এল। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)কে এখনই যেতে হবে সিরিয়ায়। সেখানে অত্যাচারিত-নিপীড়িত গণমানুষকে মুক্ত করতে লড়তে হবে দাম্ভিক জালিম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে। সর্বোপরি সেনাপতি আবু উবায়দা (রা.)-এর স্থলে তাকেই পালন করতে হবে সর্বাধিকনায়কের গুরুদায়িত্ব।

চিঠিতে খলিফার নির্দেশ পেয়ে কিছুটা চিন্তিত হলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। কিন্তু খলিফার নির্দেশ তো আর অমান্য করা যায় না। তাই অম্লান বদনে মেনে নিলেন সেই নির্দেশ। মুসান্না ইবনে হারেসাকে ইরাকের রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তিনি চলে এলেন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে।

জানামতে খালিদ (রা.)-এর সামনে সিরিয়া যাত্রার দুটো পথ খোলা ছিল। প্রথমটা দাওমাতুল জান্দাল হয়ে দক্ষিণ দিকের পথ। এই পথটা ছিল সুপরিচিত, সুগম ও নিরাপদ। তদুপরি এই পথে ছিল পর্যাপ্ত পানির উৎস। তবে ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ, যা অতিক্রম করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। অথচ খলিফা তাঁর

পত্রে সিরিয়ায় দ্রুত পৌঁছার ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা, সেখানে অবস্থিত মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ছিল নাজুক। সব দিক বিবেচনা করে খালিদ (রা.) এই পথ বাতিল করে দেন।

অপর পথটা ছিল উত্তর দিক দিয়ে ইউফ্রেটিসের তীর ধরে অগ্রসর হয়ে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৌঁছার। এটিও একটি বহুল ব্যবহৃত পথ। তবে এই পথে অগ্রসর হলে খালিদ (রা.) সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর অবস্থান হতে অনেক দূরে সরে যাবেন এবং ইউফ্রেটিসের তীরে অবস্থিত রোমান দুর্গের দ্বারা বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। এই বাধা অতিক্রম করা হয়ত তার জন্য কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু তাতে অহেতুক বিলম্ব ঘটবে। তাই তাকে সিরিয়া প্রবেশের বিকল্প ও সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজতে হয়।

খালিদ (রা.) তাঁর অফিসারদের ডেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন, 'আমাদেরকে এমন একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে, যে পথে অগ্রসর হলে রোমানরা আমাদের পথ রোধ করতে সক্ষম হবে না। তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে, যাতে আমরা মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে সিরিয়া পৌঁছতে না পারি।' তিনি ইউফ্রেটিসের উত্তর তীরে অবস্থিত রোমান দুর্গের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন। অফিসার জানান, 'আমাদের জানামতে এমন কোনো পথ নেই, যা অনুসরণ করে একটা গোটা বাহিনী শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে, যদিওবা এক ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব হয়। গোটা বাহিনীকে বিপথে পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।'

কিন্তু খালিদ (রা.) একটা নতুন পথ খুঁজে বের করার ব্যাপারে ছিলেন সংকল্পবদ্ধ। অবশেষে বিকল্প ও সংক্ষিপ্ত পথ একটা পাওয়া গেল বটে, তবে এপথে সবচেয়ে আশঙ্কার ব্যাপার হল, প্রায় ১২০ মাইল পথ পানিবিহীন তপ্ত মরুর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। এই পথ নির্বাচন করলে এক ফোঁটা পানি ছাড়াই শুষ্ক মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর টানা পাঁচ দিনের কষ্টকর যাত্রা ও মরুভূমির বুকে ক্ষণে-ক্ষণে পথ হারানোর ঝুঁকি নিয়েই তা করতে হবে।

'আল্লাহর তরবারী' নামে খ্যাত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণকৌশলী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এই ঝুঁকিই মাথা পেতে নিলেন। সে ছিল এক বিস্ময়কর অভিযাত্রা, যা বিশ্বের ইতিহাস দ্বিতীয়বার অবলোকন করেনি।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে খালিদ (রা.) ৯ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন। সময়টা ছিল বছরের এমন একটা মুহূর্ত যখন সূর্য আকাশ থেকে মরুভূমির বালুকারাশির উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করছিল। প্রথম তিন দিন কোনো ঘটনা ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়। তবে রোদের খরতাপ ও বালুর উপর আলো বিকিরণের ফলে প্রত্যেক সৈন্য ভয়ানক রকমের ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই কষ্টকে তারা আদৌ কষ্ট মনে করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে খাবার-পানি ছিল। সমস্যা হল, যে পানিতে

পাঁচ দিন চলার কথা, তা তিন দিনের মাথায় শেষ হয়ে যায়। তাদের সামনে আরও দুই দিনের পথ বাকি; অথচ এক ফোঁটা পানিও নেই।

চতুর্থ দিনে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। দিনের শেষে রাত আসে। সবাই তাঁবু ফেলে ঘুমানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কারো চোখেই ঘুম আসে না। জিভ নাড়তে-নাড়তে তা ফুলে যায়। এই অবস্থায় বুকফাটা তৃষ্ণার আগুন নিয়ে সকলে শুধু প্রার্থনা করতে থাকে, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে বড় রক্ষক।'

পঞ্চম দিনের সকালবেলা এই বিপজ্জনক যাত্রার শেষ পর্যায় শুরু হয়। পথপ্রদর্শক রাফের জানামতে, এই পর্যায়ের শেষেই একটি ঝরনার সন্ধান লাভ করার কথা। ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈনিকগণ মাইলের পর মাইল দীর্ঘ পথ নীরবে অতিক্রম করতে থাকে। নির্দয় মরুভূমির খর-রৌদ্রতাপে সিদ্ধ হয়ে তারা একেকটি দীর্ঘ ঘণ্টা অতিবাহিত করতে থাকেন। দিনের শেষে সবাই প্রাণে বেঁচে থাকলেও তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে এবং তাদের ধৈর্য মানবীয় সহ্যসীমার শেষ সীমান্তে পৌঁছে যায়। তাদের অনেকেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যেকোনো সময় পথের ধারে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে; যদিবা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে পানির সন্ধান পাওয়া যায়।

যাত্রীদলের অগ্রভাগ সেই কাঙ্ক্ষিত এলাকার যেখানে ঝরনাটা থাকার কথা, পৌঁছার পর পথপ্রদর্শক রাফে চোখে কিছুই দেখতে পান না। তিনি পূর্ব থেকেই দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতায় ভুগছিলেন এবং মরুভূমির প্রখর তাপ বিকিরণের ফলে তার দৃষ্টিশক্তি শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায়। তিনি তার মাথার পাগড়ির একটা অংশ দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললেন এবং উটকে থামিয়ে দিলেন। তার পিছনের লোকজন এই অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে রাফে! আমরা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। তুমি কি পানির সন্ধান পেয়েছ?' কিন্তু রাফে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'নারীর স্তনের মতো পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পাহাড়চূড়ার সন্ধান করো।' সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন ছুটে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে উক্ত চূড়াদ্বয়ের সন্ধান লাভের সংবাদ দিলেন।

'উপবিষ্ট মানুষের আকৃতির মতো একটা কাঁটা গাছের সন্ধান করো।' রাফে পুনরায় নির্দেশ দিলেন। কয়েকজন আবার ছুটে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানালেন, অনুরূপ কোনো গাছের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

'আল্লাহ আমাদের মালিক এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করব।' রাফে কুরআনের এই বাণীটি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, 'তাহলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। তবে তার পূর্বে আর একবার সবাই কাঁটা গাছটার সন্ধান করো।'

লোকজন আবার গাছটার সন্ধানে লেগে গেল এবং এবার কাঁটা গাছের একটা কাণ্ডের সন্ধান পেল, যার বাকি অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এই খবর শুনে রাফে নির্দেশ দিলেন, কাণ্ডটার গোড়া খনন করো। লোকজন তা-ই করল এবং ভূগর্ভ থেকে নদীর স্রোতের মতো পানি প্রবাহিত হতে শুরু করল।

প্রতিজন মানুষ তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর দরবারে রাফের জন্য রহমত কামনা করতে থাকল। তারা পশুগুলোকে পানি পান করাল এবং তারপরও পানি উদ্বৃত্ত থাকল। শত-শত সৈনিক চামড়ার পাত্রে পানি ভরে পিছিয়ে পড়া সহযোদ্ধাদের সন্ধানে ছুটে গেল এবং তাদেরকে জীবন্ত একত্র করতে সক্ষম হলো।

এই বিপজ্জনক যাত্রার এখানেই সমাপ্তি হলো এবং শেষ পর্যন্ত তা সফলভাবে সমাপ্ত হলো। এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ অগ্রযাত্রা পূর্বে কখনো হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এর মাধ্যমে খালিদ (রা.) সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে গেলেন। তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত এবং তাদের ইরাকমুখী দুর্গ। আর মাত্র এক দিনের পথ অতিক্রম করলেই লোকালয়ে পৌঁছা যাবে।

খালিদ (রা.) গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন, তাঁর বাহিনী জাহান্নামের শাস্তি অতিক্রম করে এসেছে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী কী পরিমাণ ঝুঁকির মধ্য দিয়ে এই মরুভূমি অতিক্রম করেছে, তা খালিদ (রা.) পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যখন রাফে বিন উমাইয়া (রা.) তাঁর কাছে গিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ওহে কমান্ডার! আমি আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে বালক বয়সে আমার বাবার সঙ্গে এই পথে মাত্র একবার ভ্রমণ করেছিলাম এবং এই ঝরনাটা দেখেছিলাম!'

যাহোক, পাঁচ দিনের ক্লান্তিকর যাত্রা শেষ করে খালিদ (রা.) পরদিন সকালেই তাঁর বাহিনীকে অগ্রাভিযানের জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি নিজেও বিশ্রাম করেননি বিধায় সৈনিকগণ কোনো প্রকার অভিযোগ করার সুযোগ পায়নি। যাত্রা শুরু হলে তিনি সমগ্র বাহিনী প্রদক্ষিণ করে প্রত্যেকের খোঁজখবর নেন। কমান্ডারকে তৎপর দেখে সৈনিকদের মনে শক্তির বেড়ে গেল। তারা ইতিপূর্বেকার বিপজ্জনক সফরের ভয়ংকর স্মৃতি হৃদয় থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল। তারপর ঈমানদীপ্ত এই মুসলিম কাফেলা ঝড়ের গতিতে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখল। তাদের হাতে একে পর এক সিরিয়া দুর্গ, শহর-নগর পদানত হতে থাকল। এরই মধ্যে সংঘটিত হয় বিখ্যাত 'আজনাদাইন যুদ্ধ'।

৬৩৪ সালের জুলাই মাসের ২৪ তারিখ মুসলমানগণ আজনাদাইনের প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ ঘটান। তাঁরা সর্বসাকুল্যে ৩২ হাজার আর প্রতিপক্ষ রোমানরা সৈন্য সমাবেশ করে ৯০ হাজার। কিন্তু আশ্চর্য ও চমকপ্রদ ঘটনা হল, এই যুদ্ধে মুসলমান শহীদ হন মাত্র ৪৫০ জন আর রোমান সৈন্য নিহত হয় ৫০ হাজার।

সালমান মন্ত্রমুগ্ধের মতো সিরিয়া ও দামেস্কের ইতিহাস শ্রবণ করতে লাগল। যদিও ঘুমে তার চক্ষু টলমল করছে। হাসনাইন বন্ধুর অবস্থা লক্ষ্য করে বলল, 'থাক দোস্ত! আজ না বাড়িয়ে এখানেই ইতি টানছি। তোর মনে হয় খুব ঘুম পেয়েছে তাই না?'

'না-না দোস্ত! প্লিজ, তুই ঘটনাটি পুরোপুরি বল ভাই' – অনুনয় করে বলল সালমান – 'পুরো না হলেও অন্তত দামেস্ক বিজয়ের কাহিনীটি শেষ করো। নতুবা স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার ঘুমকে আমি নিয়ন্ত্রণ করছি। তুই এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করো।'

হাসনাইন বন্ধুর আবদার না রেখে পারল না। সে চায়ের অর্ডার দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে দামেস্ক বিজয়ের কাহিনী বিবৃত করল– '৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট মোতাবেক ১৩ হিজরীর ২০শে জমাদিউস সানি হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী দামেস্ক নগরী অবরোধ করে।

বড় ধরনের কোন ঘটনা ছাড়াই অবরোধের তিনটি সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। অবশ্য রোমানদের দু-একটি দল দু-একবার আক্রমণ চালালেও সুবিধা করতে পারেনি। মুসলমানগণ সহজেই তা প্রতিহত করে ফেলে। চতুর্থ সপ্তাহের শেষের দিকে সেনাপতি খালিদ (রা.) বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলেন, 'নগরীর বাসিন্দাগণ রাতের বেলা একটি উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দ-উল্লাস ও আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠবে। প্রহরীরাও এ অনুষ্ঠানে শরীক থাকবে। ফলে গেটে প্রহরা থাকবে নামে মাত্র। দেওয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে খুব সহজেই গেট খুলে সসৈন্যে শহরে প্রবেশ করা যাবে।'

এই তথ্যের উপর নির্ভর করে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা.) রশির সাহায্যে মই তৈরির নির্দেশ প্রদান করেন। হাতে সময় কম ছিল বিধায় অবরোধকারী সকল কোরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমন্বিত আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি স্বীয় নেতৃত্বে পূর্ব গেটে মোতায়েন ইরাক হতে তাঁর সঙ্গে আগত বাহিনীকে নিয়েই দুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০জন নির্বাচিত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে খালিদ (রা.) দেওয়ালে রশি বেঁধে দুর্গে ঢোকা ও দরজা খোলার কাজ সেরে ফেললেন। ভিতরে ঢোকার সাথে-সাথে প্রহরীরা বাধা দিতে এগিয়ে আসে এবং সারা শহরে বিপদ-সংকেত বাজিয়ে দেয়। ফলে অন্যান্য গেটে অবস্থানরত রোমান সৈনিকরা পূর্ব গেটে ছুটে আসতে থাকে। খালিদ (রা.) শহরের কেন্দ্রের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তাকে বাধাদানকারী রোমান সৈন্যরা ধরাশয়ী হতে থাকে।

দামেস্কের গভর্নর ছিল তখন সম্রাট হেরাক্লিয়াসের জামাতা থমাস। সে দেখল ও বুঝল, খালিদ (রা.) শহরের ভিতরে একটি ভিত্তি তৈরি করে ফেলেছেন এবং দুর্গটি পদানত করা এখন তাঁর জন্য সময়ের ব্যাপারমাত্র। অন্য গেটসমূহে

নীরবতা দেখে সে অনুমান করল, অন্যান্য মুসলিম কোর কমান্ডারগণ হয়ত খালিদের এই আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত নয়। তার মধ্যে একটি ক্ষীণ আশা সৃষ্টি হয়, অন্যান্য কোর কমান্ডার বিশেষ করে আবু উবায়দা (রা.) হয়ত খালিদ (রা.)-এর সর্বশেষ সাফল্য সম্পর্কে জ্ঞাত। সে খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার মজুদ সেনাদলকে সামনে প্রেরণ করে যত বেশি সময় সম্ভব খালিদ (রা.)-এর অগ্রযাত্রাকে বিলম্বিত করার লক্ষ্যে এবং একই সঙ্গে জাবিয়া গেটে আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে জিযিয়া প্রদানের শর্তে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে পাঠাল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে দ্রুত দামেস্ক জয় করার লক্ষ্যে রোমানদরে সন্ধি প্রস্তাব ও আত্মসমর্পণকে গ্রহণ করে নেন। ভোর হওয়ার পরপরই তিনি তার অফিসার ও কোরসহ জাবিয়া গেট দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দামেস্কে প্রবেশ করেন এবং শহরের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ছিল থমাস, হারবিস, দামেস্কের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ধর্মীয় গুরু বা বিশপ।

আবু উবায়দা (রা.) সামনে অগ্রসর হচ্ছেন শান্তির ফেরেশতার মতো। আর খালিদ (রা.) অগ্রসর হচ্ছেন টর্নেডোর মতো। উভয়ে একই সময় দামেস্ক শহরের কেন্দ্রের মেরিন চার্চে উপস্থিত হন। খালিদ (রা.) সবেমাত্র সর্বশেষ রোমান বাধা অতিক্রম করে এসেছেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য কোর কমান্ডারও শান্তি পূর্ণভাবে শহরে প্রবেশ করে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

আবু উবায়দা ও খালিদ (রা.) একে অপরের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন। আবু উবায়দা (রা.) লক্ষ্য করলেন, খালিদ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের তরবারী থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরছে। তিনি সহজেই অনুমান করলেন, এমন কিছু ঘটেছে, যা তিনি জানেন না। খালিদ (রা.) লক্ষ্য করলেন, আবু উবায়দা (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের তরবারী কোষবদ্ধ এবং তাদের আশপাশে শান্তির আবহ বিরাজ করছে। তাদের মধ্যে আছেন দামেস্কের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বিশপগণ।

যদিও খালিদ (রা.) আবু উবায়দা (রা.)-এর কৃত চুক্তির কথা শুনে প্রথমে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ঘোষিত 'আমীনুল উম্মত' অর্থাৎ 'জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি'র সম্মান রক্ষার্থে এবং ইসলামের বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে চুক্তিটি মেনে নেন।

দামেস্ক নগরী এভাবেই অর্ধাংশ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং অর্ধাংশ চুক্তির মাধ্যমে জয় হয়। বিজয়ের পর অসংখ্য সাহাবী (রা.) এই নগরীতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, যার ফলে ইসলামী ইতিহাসের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে এই শহরের আনাচে-কানাচে। তাছাড়া বিজয়ের পর এটাই শাম প্রদেশের রাজধানী সাব্যস্ত হয়। হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)

এর গভর্নর নিযুক্ত হন। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনি একে পুরো আলমে ইসলামের দারুল খিলাফত বানালেন। সুতরাং বনু উমাইয়ার শাসনকালে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত এটি সেই ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, যার সীমানা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালের সাক্ষী হয়ে, রাজধানীর মর্যাদা নিয়ে আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে দামেস্ক নগরী। তবে সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য এখন আর নেই।'

'তা থাকবে কেমন করে দোস্ত! গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোকে উসমানী খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যোগসাজসে প্রাচীন শামকে সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ইসরাঈল ও ফিলিস্তিন এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত করে।' সিরিয়া-দামেস্ক বিজয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রবণ করে বন্ধু হাসনাইনের শেষের কথাটির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলল সালমান।

'সিরিয়ার ইদানিংকালের অবস্থা শুনলে তুই ব্যথিত হবি' – বলল হাসনাইন – 'রাত অনেক হয়েছে। এখন আর সেই আলোচনায় না গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়া যাক। নাহয় কালকের সফর কষ্টকর হয়ে যাবে।'

◆◆◆

পরদিন সকাল ১০টা। হোটেল ম্যানেজার হাসনাইন তার সাংবাদিক বন্ধু সালমানকে নিয়ে বেরুল দামেস্ক নগরী পরিদর্শনের নিমিত্তে। ভ্রমণের সুবিধার্থে সাথে নিল হোটেলের নিজস্ব গাড়ি এবং গাইড হিসেবে এমন একজন লোককে, যে ছিল জন্মগতভাবে দামেস্কের অধিবাসী। আল-ইমরান নামক এই লোকটি একজন শিক্ষিত সিরিয়ান। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। সুঠামদেহী, বলিষ্ঠ পুরুষ। পেশা বিদেশি পর্যটকদের গাইড হিসেবে কাজ করা। তবে এর জন্য তিনি বিনিময় নেন না বলা চলে। এটা তার সখ। দামেস্কের ভিক্টোরিয়া এলাকার বিখ্যাত কাসিয়ান পাহাড়ের সন্নিকটে তার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বিশাল বাড়ি। দিনের বেশির ভাগ সময় তিনি হোটেল বুরদায় হাসনাইনের সাথে গল্প করে কাটান। মনের মতো কোনো পর্যটক পেলে তার গাইড হিসেবে কাজ করেন। ম্যানেজার হাসনাইনকে তিনি বহুবার ভ্রমণে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কাজের ব্যস্ততার দরুন সে তাকে সময় দিতে পারেননি। আজ যখন হাসনাইন তার বন্ধুকে নিয়ে ভ্রমণে বের হওয়ার কথা তাকে জানাল, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন।

আল-ইমরান নিজে গাড়ির ড্রাইভিং করে সালমানদের দামেস্কের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনায় নিয়ে গেলেন। এই ভ্রমণ সালমানের নিকট এজন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল যে, তাদের গাইড ইমরান শুধু রাহবরিই করছেন না, বরং একজন দক্ষ ঐতিহাসিকের মতো প্রতিটি স্থানের গুরুত্ব, মহত্ব, প্রতিষ্ঠাকাল, প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, বর্তমান হালত ইত্যাদি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে

বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বোঝাতে গিয়ে কখনো-কখনো তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যান। এমন একজন রাহবরের সাথে সারা দুনিয়া ভ্রমণ করলেও এতটুকু ক্লান্তি কিংবা বিরক্তির উদ্রেক হয় না এ রকম অনুভূতি এ মুহূর্তে সালমানের। যার জন্য মনে-মনে সে খুব উৎফুল্ল বোধ করতে লাগল।

বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে যোহর নামাযের জন্য হাল্কা যাত্রা বিরতি দিল সালমানরা। গাড়ি পার্ক করে তারা মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। মসজিদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে আশ্চর্য হল সালমান। প্রাচীনকালের মসজিদ, অথচ এত সুন্দর শিল্পকর্মের বাহার! নিশ্চয়ই এটি কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলিম শাসকের মননশীল ভাবনার সৃজনশীল ফসল। কে সেই শাসক? কৌতূহল নিবৃত্তের জন্য তাই সে প্রশ্ন করল গাইড আল-ইমরানের কাছে।

সালমানের প্রশ্নের উত্তরে আল-ইমরান বললেন, 'এটা জামে উমুভী মসজিদ। এ সেই জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক মসজিদ, যা এককালে স্থাপত্য শিল্পের আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে গণ্য করা হত। প্রসিদ্ধ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক এটি নির্মাণ করেন। এটি সেই যুগের সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে সুন্দরতম মসজিদ ছিল। কথিত আছে, এর নির্মাণ কাজে ১ কোটি ১২ লাখ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। মসজিদের ভিতরের হলকক্ষ যেখানে মেহরাব নির্মিত হয়েছে, পূর্ব-পশ্চিমে ২০০ ফুট লম্বা এবং ১০০ ফুট চওড়া নির্মাণ করা হয়। কেবলার দিকের প্রাচীরে মর্মর পাথরের সঙ্গে স্বর্ণও লাগানো হয়। এই হলের উপর জমকালো এক গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। একে 'কুব্বাতুন নাছ্র' বলে। এটি এককালে দামেস্কের সর্বোচ্চ ভবন ছিল। তার জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয় ছিল।

রোমানদের রাজত্বকালে এখানে খৃষ্টানদের একটি গির্জা ছিল। তাকে 'কানিছায়ে ইউহান্না' বা 'মেরির চার্চ' বলা হত। মুসলমানদের হাতে দামেস্ক নগরীর অর্ধেক যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এবং অর্ধেক সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে জয় হয়। আর ইসলামের নীতি এই যে, শত্রুদের যে এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হয়, তার ব্যাপারে ইসলামী সরকারের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে, সে এতে যা ইচ্ছা করতে পারে। কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে যে অঞ্চল বিজয় হয়, তাতে সন্ধির শর্ত মেনে চলতে হয়। ঘটনাক্রমে তৎকালীন এই গির্জার অর্ধাংশ যুদ্ধ দ্বারা এবং অপর অর্ধাংশ সন্ধির মাধ্যমে জয় করা অংশে পড়েছিল। যে অংশ যুদ্ধ দ্বারা জয় হয়েছিল, মুসলমানরা শরীয়তপ্রদত্ত অধিকারের ভিত্তিতে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু অবশিষ্ট অর্ধাংশ, যা সন্ধির মাধ্যমে জয় হয়, তা চুক্তির শর্তানুপাতে গির্জারূপেই রেখে দেওয়া হয়।

সুতরাং দামেস্ক বিজয়ের পর বহু বছর পর্যন্ত এখানে মসজিদ ও গির্জা পাশাপাশি অবস্থান করে। ওলীদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে নামায আদায়কারীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাছাড়া মসজিদের একেবারে সামনা-সামনি গির্জা থাকায় জনগণের মধ্যে এক ধরনের

অসন্তোষ শুরু থেকেই চলে আসছিল। সেজন্য ওলীদ বিন আব্দুল মালিক চাচ্ছিলেন, গির্জার অংশটিও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাক। কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী গির্জা ঠিক রাখতে বাধ্য ছিলেন। তিনি গির্জার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের ডেকে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন এবং এই জায়গার পরিবর্তে তাদেরকে চার গুণ বেশি জায়গা দেওয়ার কথা বললেন। অথবা তারা চাইলে তাদের ইচ্ছামত মূল্য পরিশোধ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু কিছুতেই তারা এখান থেকে গির্জা সরিয়ে নিতে রাজি হল না।

অবশেষে খলীফা প্রস্তাব করলেন, যদি তারা এই গির্জার জায়গা মসজিদের জন্য দিতে রাজি হয়, তাহলে দামেস্ক ও তার উপকণ্ঠের যেসব অঞ্চল মুসলমানরা শক্তি দ্বারা জয়ে করেছিলেন, সেখানকার যে চারটি গির্জা ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেই ফয়সালা প্রত্যাহার করা হবে এবং এই গির্জাগুলো তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। খৃষ্টানরা স্বাচ্ছন্দ্যে এই গির্জা মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিল।

তারপর ওলীদ বিন আব্দুল মালিক নিজহাতে গির্জাটা ধ্বংস করে দিয়ে উভয় অংশকে একত্রিত করে বিশাল এই মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং কৃতিত্বের সাথে নির্মাণ কাজ শেষ করেন। আর এ সকল কারণেই এটি ইসলামের অতীত-ভবিষ্যৎ ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মসজিদ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, শেষ জামানায় মুসলমানদের চরম সংকটকালে যখন হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে আসবেন, তখন তিনি এই মসজিদের ছাদেই অবতরণ করবেন এবং হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মাহদীর নেতৃত্বে এই মসজিদ থেকেই মুমিনদের কাফেলা বের হয়ে সারা দুনিয়াকে শান্তির পতাকাতলে এনে দাঁড় করাবেন।'

সালমান এমন একটি ঐতিহাসিক মসজিদে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হল। এজন্য সে মনে-মনে তার বন্ধুকে ধন্যবাদ দিতে লাগল এবং মর্যাদাপূর্ণ এই মসজিদে খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলে বন্ধুর হাত ধরে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগল।

তারা যখন মসজিদ বারান্দার উত্তর-পূর্ব কোণে পৌঁছল, তখন সেখানে বিরল বিস্ময়কর একটা গাড়ি দেখে আশ্চর্যান্বিত হল। গাড়িটা বাঁশ ও কাঠের তক্তার তৈরি। তার নিচে লোহার দৈত্যাকৃতির চাকা লাগানো আছে। গাড়িটা এত বড় যে, তা বারান্দার বিরাট বড় অংশ দখল করে আছে।

অপূর্ব এই গাড়িটা দেখে সালমান আর চুপ থাকতে পারল না। নামাযের জামাত আরম্ভ হতে দেখেও গাইডকে প্রশ্ন করল গাড়িটার ব্যাপারে। তিনি নামাযের পর বলবেন বলে তাকে আপাতত নিবৃত্ত করলেন।

নামায শেষে পুনরায় গাড়ির কাছে এসে গাইড বললেন, 'এটা নামসর্বস্ব কোনো গাড়ি নয়; এটি একটি ইতিহাস। এর চাকার নিচে নিঃশেষ হয়েছিল খৃষ্ট

দুনিয়ার সম্মিলিত শক্তির সকল স্তম্ভ ও অহংকার। এটি ইতিহাস বিজয়ী বীর সুলতান গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রা.)-এর উদ্ভাবিত মিনজানিক (স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ), যা তিনি বহু রণক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এবং... ।'

এরপর গাইড কী বলেছেন তা কিছুই সালমানের কানে ঢুকল না। সে একপ্রকার উন্মাদের মতো গাড়িটার চারপাশে ঘুরতে লাগল। কখনো তার বৃহদাকৃতির চাকা ধরে দেখে। আবার কখনো তার অতিশয় মজবুত অবয়বে আবেগের আতিশয্যে এঁকে দিচ্ছে ভক্তির নিদর্শনচিহ্ন। একপর্যায়ে সে লাফ দিয়ে মিনজানিকটার উপর উঠে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে বন্ধু হাসনাইন ও গাইড আল-ইমরান তাকে জোরপূর্বক সেখান থেকে নামিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন। কিন্তু সে পুনরায় মসজিদে ছুটে যেতে চাইল এই বলে, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মিনজানিকটা নিতে দাও। আজ মুসলিম বিশ্বের জন্য তাঁর এই অস্ত্রটার বড়ই প্রয়োজন। এটা এখানে পড়ে থাকলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। মসজিদে আকসার মুক্তির জন্য এই অস্ত্রটাকে সচল করতে হবে। বুশের ঘোষিত বর্তমান ক্রুসেড মোকাবেলা করতে ক্রুসেড বিজয়ী এই ক্ষেপণাস্ত্রটাকে আমি ইরাক নিয়ে যাব। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও... ।'

ইতিমধ্যে সেখানে বেশকিছু লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। তারা সালমানের উত্তেজিত হওয়ার কারণ জানতে চাইল। আল-ইমরান কিছু হয়নি বলে তাদের বড় রকমের কৌতূহলের পূর্বেই সালমানকে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটা দিলেন।

মসজিদ থেকে বের হয়ে তারা একটি কবরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাইড আল-ইমরান বললেন, 'সালমান! আপনি তো ওখানে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অকেজো মিনজানিকটা নিয়ে টানাটানি শুরু করলেন তা দিয়ে মুসলমানদের মুক্তির সোনালি সূর্য ফিরিয়ে আনবেন বলে। কিন্তু ঐ অস্ত্র দিয়ে এ যুগে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। যদি পারেন, তাহলে এই কবরে শায়িত সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্তমান ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। হয়ত তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিলেও দিতে পারেন।'

সালমান কখনো ভাবেনি, আজকের এ সফরে এমন একজন অপরাজেয়, অমিততেজী বিজয়ী বীর যোদ্ধার পবিত্র কবর যিয়ারতের মতো সৌভাগ্য তার নসিব হবে। ভক্তি-শ্রদ্ধা আর আবেগের অতিশয্যে তার দু-চোখের পাতা বুজে এল। হৃদয়ের জানালায় উঁকি দিল হাজারো দুঃখ-ব্যথা ও কষ্টের কথামালা, যা ব্যক্তি করতে না পারলে তার হৃদয়তন্ত্রীটা হয়ত বুঝি এখনই ছিঁড়ে যাবে। সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এই অমর বীর মুজাহিদের চির নিদ্রাস্থলের পাশে। দুহাত তুলে আকুল ফরিয়াদ করতে লাগল কেঁদে-কেঁদে।

আর আবৃত্তি করতে লাগল নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা–

এস হে সালাহুদ্দীন ফিরে একটিবার
তোমার জন্য মুসলিম জগৎ করছে ইনতেযার।
ওগো! আজ আমাদের প্রয়োজন তোমার মতো বীর
বুক পেতে যে ধারণ করবে শত্রুর ছোড়া তীর।
ফিলিস্তিনে জ্বলছে আগুন পুড়ে হচ্ছে সব সারা
প্রথম কেবলা আজ পুনরায় হয়েছে হাতছাড়া।
খনন করে মসজিদটাকে ধ্বংস করতে চায়
সে প্রতিজ্ঞাই নিয়েছে আজ ইহুদী সম্প্রদায়।
তৃতীয় ধারায় ক্রুসেড যুদ্ধ হয়েছে আবার শুরু
বুশ নামক এক খৃষ্টরাজা সেজেছে নাটের গুরু।
প্রকাশ্যে মাঠে ঘোষণা দিয়েই নেমেছে এই রাজা
আফসোস! আজ তুমি নেই বেঁচে কে দিবে তারে সাজা।
সর্বপ্রথম কেড়ে নিল সে ইসলামী ইমারত
বহু বছর পর যেথায় কায়েম হয়েছিল খেলাফত।
দুটি বছর যেতে না যেতেই করল আবার দখল
তোমার জন্মভূমির সম্পদ চুরি করল সকল।
আরব সাগর-দজলা তীরে ঘুরছে ক্রুসেড সৈন্য
সুযোগ পেয়েছে গাদ্দার-মোনাফেক আরবি শেখের জন্য।
হেজায ভূমে খানায়ে কা'বা করবে নাকি ধ্বংস
বুশের মন্ত্রী বলেছে, এটাও তার পরিকল্পনার অংশ।
তিলে-তিলে আজ খেতে লেগেছে পুরো আরব ভূমি
তবুও কি হে বীর সালাহুদ্দীন থাকবে ঘুমে তুমি।
চেয়ে দেখো আজ মুসলিম বিশ্ব অমানিশায় গেছে ছেয়ে
তুমি ছাড়া আর কে জাগাবে, বিজয়ের গান গেয়ে।
জাতি আজকে দিশেহারা পায় না খুঁজে রাহবার
তাই তো তোমায় কাছে পেতে আকুতি জানাই বারংবার।
জাগো এবার! মৃত্যুচাদর খানিক দূরে রাখো খুলে
এগারো শতকের খাপে ভরা অসি পুনরায় হাতে নাও তুলে।
তোমায় আমি আল্লাহর নামে করছি এই আহ্বান
রক্তাক্ত এ তৃতীয় ক্রুসেড করে দিয়ে যাও অবসান।

এভাবে সালমান বহুক্ষণ যাবত সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কবরগাত্রে বসে রোনাজারির সাথে মর্সিয়া গাইতে থাকল। সে এত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল যে, পারলে এখনই সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে কবর থেকে তুলে তাঁকে সাথে নিয়ে ক্রুসেড মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার কান্না ও মর্সিয়া মিলে সেখানে এমন

এক আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হল যে, সেখানকার পুরোটা প্রকৃতি যেন তার সাথে কান্না জুড়ে দিয়েছে। কাঁদছে বন্ধু হাসনাইন, গাইড ইমরান ও আশপাশে দাঁড়ানো আরও দু-একজন লোক। সে কী কান্না! কবরের পাথর ও লোহার গ্রিলগুলোও যেন কাঁদছে তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। আকাশে উড়ন্ত কতগুলো ঈগল ও মরুপাখি চিঁ-চিঁ পিউ-পিউ ধ্বনি করে যেন তারই কান্নার প্রতিধ্বনি করছে।

এবার সালমান মর্সিয়া বাদ দিয়ে সরাসরি সেই সত্তার কাছে ফরিয়াদ করতে লাগল, যে সত্তা মহাবীর, অমিততেজী সালাহুদ্দীনের মাধ্যমে তাঁর অপার ও অসীম ক্ষমতার সামান্য বিচ্ছুরণ জগদ্বাসীদের অবলোকন করিয়ে থাকেন–

'হে আল্লাহ! হে রাহমানুর রাহীম! হে রাজাধিরাজ সৃষ্টিকর্তা! তোমার ক্ষমতা, তোমার শক্তি অপরিমেয়, অনন্ত ও সীমাহীন। এগারো শতকের ক্রুসেড থেকে তুমি মুসলিম জাতিকে তথা তোমার প্রিয় ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের হেফাযতের জন্য যে একজন মহান বীর মুজাহিদ প্রেরণ করেছিলে, তেমনি আজকের অভিভাবকহীন মুসলিম জাতিকে দানবীয় ক্রুসেড থেকে রক্ষাকল্পে আরেকজন সালাহুদ্দীনকে পাঠাও। প্রভু হে! সালাহুদ্দীনবিহীন পৃথিবী নব্য ক্রুসেডের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে অসহায়ভাবে। তোমার প্রত্যক্ষ সাহায্য বিনে এ জাতির মুক্তির আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তুমি দয়া করো। তুমি নুসরত করো। তুমি আমাদের দু'আ কবুল করো।'

সবাই বলল, 'আমীন'।

মসজিদ চত্বর থেকে বের হয়ে তারা পুনরায় সফর আরম্ভ করল। প্রশস্ত রাস্তায় স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে তাদের গাড়ি। গাড়ির চেয়ে সালমানের মনের গতি বেশি সঞ্চালিত। তার মনপাখি উড়ে-উড়ে দেখছে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই নগরীর বিভিন্ন স্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ। তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেই সব মহামানবদের অমর স্মৃতিগুলো। বাতাসের শাঁ-শাঁ শব্দের সাথে যেন তার কানে ভেসে আসছে খালিদ বিন ওয়ালিদ, শুরাহবিল বিন আমের, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, জাররার বিন আসওয়ার, মুয়ায বিন জাবাল, রাফে বিন উমাইর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমদের উদ্যত অশ্বক্ষুরধ্বনি। দিক চক্রবাল যেন প্রকম্পিত করে তুলছে তাঁদের নারায়ে তাকবীরের বজ্রকঠিন স্লোগানের আওয়াজ। দামেস্কের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন আজও তাঁদের বিরহের শোকগাথা রচনা করে চলছে নীরবে।

সালমান কল্পনায় যখন অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছিল এক-এক করে, তাদের গাড়ি তখন এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়তে-পড়তে বেঁচে যায়। রাস্তার আইল্যান্ডের উপর উঠে যায় গাড়ির চাকা। তবে যাত্রীরা সবাই নিরাপদ ও অক্ষত থেকে যায়।

গাড়িটা আইল্যান্ড থেকে নামানো হল। তারপর গ্যারেজে সারাতে দিয়ে তারা একটা বাজারে প্রবেশ করল। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বাজার। বাজারের স্টল ও বিপণীকেন্দ্রগুলোতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। আধুনিকতার পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যের সমাহারও পুরোমাত্রায় ফুটে উঠেছে এখানকার দ্রব্যসামগ্রী আর শিল্পজাত পণ্যের সমাহারে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন বিচারপতি মাওলানা তাকী ওসমানীর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার লোকদের প্রকৃতির মধ্যেই সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতা আকণ্ঠ ভরে দিয়েছেন। তাদের প্রতিটি বস্তুতে সুরুচি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সরল কিন্তু সুন্দর তাদের স্বভাব। সুতরাং সিরিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এই সুরুচি পূর্ণরূপে ভাস্কর।'

সালমান বাজারটা ঘুরে দেখতে গিয়ে কিছু কেনাকাটাও করল। বিশেষ করে যে দামি জিনিসটি কিনল, তাহল একটি গিফট। এটি কিনেছে তার প্রিয়তমা রুকাইয়ার জন্য। বন্ধু হাসনাইনও গাইড আল-ইমরানকে কিনে দিল দুটো উন্নতমানের সোয়েটার।

বাজার থেকে বেরিয়ে তারা সোজা চলে এল গ্যারেজে। ততক্ষণে গাড়ির মেরামত সম্পন্ন হয়ে গেছে। বেলা বেশি বাকি নেই। অল্প সময়ে সফর শেষ করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গাড়ি এক পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করল। পাহাড়ি হলেও এলাকাটা বেশ জনবসতিপূর্ণ। রাস্তা খুব ঘন-ঘন মোড় নিচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ উপরে উঠে গেছে রাস্তাটা। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের গাড়ি একটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল।

গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে চড়া সালমানের জীবনে এটা চতুর্থবার। এ এক অন্য রকম এ্যাডভেঞ্চার। পুরাতন অভিজ্ঞতা; নতুন আনন্দ। সালমান লক্ষ্য করল, পাহাড়টা দামেস্ক শহরের উপর এমনভাবে ছায়াপাত করে রেখেছে, যেমন ইসলামাবাদের উপর 'মারগালা' পাহাড় ছায়া ফেলেছে।

এটি একটি ঐতিহাসিক পাহাড়। নাম 'কাসিউন'। এই পাহাড় সম্বন্ধে বিশিষ্ট ইসলামি আইনবিদ মাওলানা তাকী ওসমানী বলেন, 'ঐতিহাসিক ও ইসরাইলী বর্ণনানুপাতে কাসিউন আম্বিয়া (আ.)-এর কেন্দ্র ছিল। কোনো-কোনো বর্ণনায় আছে, হযরত আদম (আ.)-এর ছেলে কাবিল তার ভাই হাবিলকে এখানেই হত্যা করেছিল। পাহাড়ে একটা গর্ত আছে। লোকে বলে সেখানে রক্তের চিহ্নও রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে, এটা হাবিলের রক্তের চিহ্ন।

এই পাহাড়ের উপর মসজিদে ইবরাহীম নামে একটি মসজিদ রয়েছে। কোনো-কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ জায়গায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইবাদাত করতেন। এই মসজিদেরই বাইরে পাহাড়ের মধ্যে একটা ফাটল আছে। এ ফাটল সম্পর্কে বলা হয়, কুরআনে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি এখানেই ঘটেছিল।

তিনি প্রথমে তারকা, তারপর চন্দ্র এবং পরে সূর্যকে (কাল্পনিকভাবে) খোদা সাব্যস্ত করেন। পরে এসব ধারণা থেকে তাঁর পবিত্রতার কথা প্রকাশ করে তাওহীদের আকীদার এই সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তাবলীগ করেন।

আরেক বর্ণনামতে, হযরত ইলিয়াস (আ.) তৎকালীন বাদশাহর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এই পাহাড়েই আত্মগোপন করেছিলেন।

এসব বর্ণনা সনদের দিক থেকে দুর্বল। আর কতগুলো ঐতিহাসিকভাবে ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, এ পুরো অঞ্চল নবীগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। কাসিউন এ অঞ্চলের উৎকর্ষতম একটা পাহাড়। তাই বিভিন্ন নবীর একে নিজেদের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

সালমান কাসিউন পাহাড় সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে উপরোক্ত আলোচনা শুনেছিল পাকিস্তানের এক সভায় মাওলানা ওসমানী সাহেবের কাছ থেকে। আর আজ সে স্বয়ং সেই পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান। এই মুহূর্তের অনুভূতিটাই ভিন্ন। তাই সে অত্যন্ত আগ্রহভরে পাহাড়টা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। পাহাড়ের প্রাকৃতিক অপরূপ দৃশ্য আর আধুনিক প্রযুক্তির সাজসজ্জা সত্যিই তাকে বিমোহিত করে তুলেছে। পাহাড়ে আছে বেশ কটি বিনোদনকেন্দ্র। উন্নতমানের খাওয়া-দাওয়ার রেস্তোরাঁও আছে এখানে। এছাড়া আছে ফাস্টফুড, কফি ও বিভিন্ন শৌখিন জিনিসপত্রের স্টল। আরও আছে শিশুদের জন্য কয়েকটা খেলার মাঠ।

তারা একটা রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল। খাওয়া-দাওয়া সেরে মাগরিবের নামায পড়তে গেল মসজিদে ইবরাহীমে। নামায পড়ে বাইরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়ে সম্মুখের দৃশ্য দেখে সালমান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। আহ! কী অপরূপ সৌন্দর্য, কী চমৎকার শোভা। সম্মুখে তিন দিক জুড়ে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দামেস্ক নগরীর আলোকমালা ছড়িয়ে আছে। বিচিত্র রঙের বাতিসমূহের ভিন্ন একটা জগত সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে, যেন পৃথিবী নক্ষত্রখচিত আকাশের রূপ ধারণ করেছে।

বেশকিছু সময় পাহাড়ে পরিভ্রমণ শেষে তারা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ঈশার নামাযের জন্য তারা জামে উমুভীতে প্রবেশ করল। পুনরায় এই মহিমান্বিত মসজিদে প্রবেশ করে সালমানের হৃদয় জুড়িয়ে গেল। মনটা তার প্রশান্তিতে ভরে গেল।

দুই.

অচেতন ঈগলকে কোনো প্রকার চিকিৎসাপত্র ছাড়াই কয়েদখানার নোংরা একটা টয়লেটে আটকে রাখা হল। তার হুঁশ ফিরল দীর্ঘ প্রায় ৭/৮ ঘণ্টা পর। প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় সে কুঁকিয়ে উঠল। বহু কষ্টে উঠে বসল। সারাটা শরীরই তার ব্যথায় জর্জরিত। ক্ষুধায় পেটটা চোঁ-চোঁ করছে। পিপাসায় জানটা বের হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার পাশাপাশি টয়লেটের অস্বাভাবিক দুর্গন্ধময় পরিবেশে তার

মস্তিষ্ক বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। এ অবস্থায় তাকে এক রাত এক দিন আটক রাখা হল।

পরদিন রাত। ঈগলকে টয়লেট থেকে বের করে একটা কক্ষে নেয়া হল। কক্ষটা অন্ধকার। সীমাহীন দুর্গন্ধে ঠাসা। এক সৈনিক বাতি জ্বালাল। দেখা গেল, সেখানে আরো বেশ কজন কয়েদী রয়েছে। একের পর এক আতঙ্ক ও ভয়াবহতা কয়েদীদের মন-মগজে ও শিরায়-শিরায় ঢুকে পড়েছে। ক্ষত-বিক্ষত দেহ ও মন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অপমান ও লাঞ্ছনাকে সহ্য করতে-করতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এখন যেন তারা সব ধরনের অনুভূতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তদুপরি ঈগলসহ সৈন্যদের আগমনে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। বন্দিদের মধ্যে ১৫-১৬ বছর বয়সী এক কিশোর হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হল, কক্ষের ছাদে সিলিংয়ের সাথে ঝুলানো আছে দুজন কয়েদীর লাশ। এ লাশ থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কয়েদখানার বন্দীদের এ দুরবস্থা দেখে ঈগল নিজের কষ্টের কথা প্রায় ভুলেই গেল। সাথের সৈন্যরা তাকে অন্য একটা কক্ষে নিয়ে গেল। এটি একটি মনোরম কামরা। আকর্ষণীয় সাজসজ্জা বিরাজমান কক্ষটিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিন-চারজন বেয়ারা তার খেদমতে লেগে গেল। তাকে বাথরুমে নিয়ে সুন্দরভাবে হাত-মুখ পরিষ্কার করাল। তার পরনের পোশাক পাল্টিয়ে ভালো পোশাক পড়ানো হল। তারপর উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করল। কিন্তু ঈগল ইতিপূর্বেকার কক্ষে বন্দিদের যে চিত্র দেখে এসেছে, তাতে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটে গেছে। তবু সৈন্যদের পীড়িপীড়িতে সে খাবারের প্লেটে হাত দিল। আর তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠল পাশের রুমের কান্নারত কিশোরের শুষ্ক ও বেদানাহত করুণ মুখখানি।

খাওয়া আর হল না ঈগলের। শুধু এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি পান করেই সে হাত গুটিয়ে নিল। ইতিমধ্যে মাথায় জখমে ব্যথা শুরু হয়ে যাওয়ায় সে সোফার পাশের খাটটাতে শুয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তার এসে তার মাথার ক্ষতে ঔষধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। সবশেষে ডাক্তার তাকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়ে গেল।

ঈগল বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল, তার সাথে মার্কিনিরা এমন বন্ধুসুলভ আচরণ করছে কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। নতুবা যারা আহতাবস্থায় টয়লেটের নোংরা-অসহনীয় পরিবেশে আটকে রাখল ঘণ্টার পর ঘণ্টা; সেই তাদের কাছে এমন সুন্দর আচরণ অবশ্যই...।

ঈগল তার ভাবনাটা শেষ করতে পারল না। এরই মধ্যে কক্ষে প্রবেশ করল লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইকেল ফেব্রিকেন্ট। এ সেই লেফটেন্যান্ট, যে ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে ঈগলকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। কক্ষে প্রবেশ করে সে ঈগলের শিয়রে বসে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে

লাগল। তাকে যে টয়লেটে রাখা হয়েছিল, তার জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করল। খানিক পর সে ঈগলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

আগুনের কাজ পোড়ানো। কিন্তু আগুন লাগার পরও যদি কোনো জিনিস না পোড়ে, তাহলে বুঝতে হবে, অবশ্যই সেখানে কোনো রহস্য আছে। তেমনি শত্রুর কাজও প্রতিপক্ষকে ঘায়ের করা। কিন্তু তাকে বাগে পেয়েও শাস্তি না দিয়ে যদি আদর আপ্যায়ন করা হয়, তবে বুঝতে হবে অবশ্যই প্রতিপক্ষ বড় কোনো স্বার্থ হাসিলের মতলব আঁটছে।

এ মুহূর্তে মার্কিন বাহিনীও ঈগলকে দিয়ে বড় একটি স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে। সে কারণেই ঈগল তাদের ভয়ংকর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করছে। অবশ্য তাদের বাস্তব চেহারার এক ঝলক প্রথমেই তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মানে তারা এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, আমরা শাস্তি দিয়ে তোমাকে তিলে-তিলে শেষ করতে পারতাম। কিন্তু তার পরিবর্তে তোমার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছ। সুতরাং আমাদের কথামতো কাজ করলে আরো সমাদর পাবে। নচেৎ প্রথমে যে আচরণ করা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে প্রতিনিয়ত। দেখা যাক ঈগল এখন কি করে!

◆ ◆ ◆

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। তার জীবনের আশার প্রদীপগুলো একে-একে সব নিভে গেছে। প্রথমত শিশুপুত্রের শাহাদাতবরণের শোক। দ্বিতীয়ত, কন্যা রুকাইয়া নিখোঁজ, আহত জামাতা চলে গেছে স্বদেশে, বাড়িটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তার ওপর ঈগল বন্দি মার্কিনিদের হাতে। শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেছেন লোকটি। যদি মুজাহিদদের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে না থাকত আর তাঁকে একা-একা থাকতে হত, তাহলে হয়ত বেচারা একদম পাগল হয়ে যেতেন।

মেজর সাহেব সমঝদার মানুষ। তাই তিনি শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করলেন। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন কয়েক গুণ। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত 'সালাফিস্ট ব্রিগেড অব সালাহুদ্দীন আইয়ুবী'র টগবগে জওয়ানরা বাগদাদে মার্কিনিদের সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে খ্যাত গ্রিন জোনের অভ্যন্তরে একের পর এক সফল রকেট হামলা চালিয়ে তাদের কলিজায় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। এজন্য বাগদাদে তাদের গতিবিধি সীমিত হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপছে মার্কিন সৈনিকরা। তারা চারদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছে। প্রতিটি মর্টার হামলার সময় যেন যমদূত তাদের দিকে দাঁত বের করে ধেয়ে আসে। এতে অনেক সৈনিক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মোটকথা, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নব উদ্যমে ঝলসে উঠেছেন এই মুজাহিদ নেতা এবং তাঁর সহকর্মী মুজাহিদগণ।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বাড়িটা মার্কিনিদের বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর তিনি দজলার তীরের বাগান বাড়িতে একটি নতুন বসতঘর তোলেন। বর্তমানে অধিকাংশ সময় তিনি এখানেই বসবাস করেন। মুজাহিদরা পূর্বের ন্যায় বাংকারগুলোতেই অবস্থান করছেন। বাড়িটা বিধ্বস্ত হলেও বাংকারের কোনো ক্ষতি হয়নি।

মেজর সাহেব প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর বাগানের গাছপালাগুলোর পরিচর্যায় নেমে পড়েন। বাগানে নতুন অনেকগুলো ফল-ফুলের চারা লাগিয়েছেন বিরহ-যাতনায় ভরা তার দিনগুলোর বেশিরভাগ সময় কাটে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ ও তদারকির কাজে। অবশিষ্ট সময় তিনি কাটান বাগানের যত্ন-আত্তি করে। এর মাধ্যমে তিনি ভুলে থাকতে চান দুঃখ ও বেদনার স্মৃতিগুলো।

প্রাত্যহিক রুটিন অনুযায়ী আজও মেজর সাহেব ফজর নামাযের পরই বাগানে এলেন। এসেই ফুল গাছগুলোর পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এ মুহূর্তে তার বারবার মনে পড়ছে কন্যা রুকাইয়ার কথা। কেননা, সে-ই তো ফুল বেশি পছন্দ করত। আহা! অমন চাঁদের মতো মেয়েটা কোথায় আছে! সে কি বেঁচে আছে, নাকি মরে গেছে, তাও জানা হল না আজ পর্যন্ত। মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কাজে আর মন দিতে পারলেন না। বারবার রুকাইয়ার মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে তার মানসপটে। হৃদয়ের চাপা কান্নাগুলো বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি হাতদুখানি আকাশপানে তুলে ধরে চোখের জলে বক্ষ সিক্ত করতে লাগলেন আর মহান আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করতে লাগলেন মনের বেদনা ও কষ্টের কথা। সহসা গেটের ওপাশ থেকে কার যেন পরিচিত কণ্ঠ ভেসে এল, 'এখানে কি কেউ আছেন?'

ডাক শুনে মেজর সাহেব চমকে উঠলেন। এ যেন তার মা-মণি রুকাইয়ার কণ্ঠ। সাথে-সাথে আবার ভাবলেন, তিনি যেহেতু এ মুহূর্তে রুকাইয়ার কথাই চিন্তা করছিলেন, তাই এটা তার ভাবনার অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু খানিক বাদে পুনরায় একই কণ্ঠ ভেসে এল, 'কেউ কি আছেন এখানে? দয়া করে গেটটা খুলুন।'

এবার মেজর সাহেব দৌড়ে গেটের কাছে গেলেন। গেট খুলে আগন্তুকদের দেখে তিনি দারুণ অবাক হলেন। সামরিক উর্দি পরিহিতা চার তরুণী সেখানে দণ্ডায়মান। তিনজনের হাতে ভারী অস্ত্র। অপরজন নিরস্ত্র। তার বাম হাত ও মাথায় ব্যান্ডেজ করা। চতুর্থ এই তরুণীই যে তার নয়ন-পুত্তলিকা রুকাইয়া।

রুকাইয়া পিতাকে সম্মুখে দেখে আর স্থির থাকতে পারল না। সহসাই সে আব্বাজান! বলে পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। মেজর সাহেব কন্যাকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনিও নয়নাশ্রু ঝরাতে লাগলেন। তবে এটা বেদনার অশ্রু নয়, এটা হল আনন্দাশ্রু। তারা যখন গেটের সম্মুখে দীর্ঘ বিরহের কষ্ট নয়নাশ্রু ঝরিয়ে ধুয়ে দিচ্ছিলেন, ঠিক

তখন পশ্চিম দিক থেকে একটা মার্কিন সেনাবহর ধেয়ে আসছিল। বিষয়টি আগত তরুণীদের একজন মাহমুদা লক্ষ্য করল। সাথে-সাথে সে মেজর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি সবাইকে নিয়ে দ্রুত গেটের ভিতর চলে এলেন। ভিতরে ঢুকে গেট বন্ধ করতে গেলে তরুণীরা বেঁকে বসল। তারা বলল, 'এই মার্কিন বহরটা আমাদের শিকার। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। আমরা একে ধ্বংস করতে চাই।'

মেজর সাহেব বললেন, 'দেখো বেটি! তোমরা তিনটা মেয়ে একটা সেনা কনভয়ের সাথে লড়ে সুবিধা করতে পারবে না। আমাদের মুজাহিদগণ এ মুহূর্তে বিশ্রামে আছেন, তাই তোমাদের সহযোগী হিসেবেও কাউকে দেওয়া যাচ্ছে না।'

কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। কোনোমতেই শিকার হাতছাড়া করতে চাইছে না। তাদের পীড়িপীড়িতে অবশেষে মেজর সাহেব তাদের কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব নিলেন। রুকাইয়াকে বাড়িতে রেখে দ্রুত তারা অপারেশনে বেরিয়ে পড়লেন।

যে রাস্তা দিয়ে সেনাবহর এগিয়ে আসছে, সেটা মেজর সাহেবের বাগান বাড়ির পিছন দিকে মোড় নিয়ে সোজা উত্তর দিকে বাগদাদ মহাসড়কে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই মেজর সাহেব অপারেশন গ্রুপটি নিয়ে আগেভাগে মোড় ঘুরে উপযুক্ত স্থানে ওঁৎ পেতে রইলেন। মাহমুদাকে দায়িত্ব দিলেন অগ্রগামী হামলার।

সাঁজোয়া বহরটা মোড় ঘোরার পূর্বে গতি কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনল। এখন মধ্যম গতিতে সামনে এগুচ্ছে সেটা। বহরের সম্মুখে একটা চ্যালেঞ্জার ব্যাটল ট্যাংঙ্ক। মাঝে দুটো হামভী সাঁজোয়াযান এবং সবার পিছনে সেনা বহনকারী পিকআপ ভ্যান। ট্যাংকের উপর চার সৈনিক অস্ত্র তাক করে বসে আছে। সাঁজোয়াযানের ভিতরের অবস্থা বোঝা গেল না। পিকআপে ১৫জনের মতো সৈনিক বসে-বসে ঝিমুচ্ছে। হয়ত রাতে এরা ভদকা গিলেছিল আর সকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডিউটিতে এসেছে।

বহরের সম্মুখে যেহেতু ট্যাংক, তাই এর গতিবিধিই অনুসরণ করতে হয় গোটা বহরকে। মোড় ঘোরার পর যখন ট্যাংকের গতি পূর্বের মতো বাড়িয়ে দেওয়া হল, ঠিক সে সময়ই মাহমুদা তার অবস্থান থেকে একটা শক্তিশালী গ্রেনেড ছুড়ে মারল ট্যাংকের সম্মুখে। সাথে-সাথে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হল সেটা। উল্টে গেল ট্যাংক। থমকে গেল পিছনের বহর। আর থামার সাথে-সাথে ওঁৎ পেতে থাকা মেজর আসাদুল্লাহ ও তরুণীরা একযোগে ফায়ার করতে-করতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

মার্কিন সৈনিকরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আট-দশজনের ইহলীলা সাঙ্গ হল। বাকিরা পাল্টা ফায়ারের চেষ্টা করলেও তেমন সুবিধা করতে পারল না। কেননা, ইতিমধ্যে গাড়ির ইঞ্জিনে ফায়ার চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফায়ার চালানো হল হামভীর যানদুটিতেও। এবার পাল্টা ফায়ার চালাল উক্ত গাড়িতে

অবস্থানরতরা। গর্জে উঠল বিস্ফোরিত ট্যাংকের বেঁচে যাওয়া দুই সৈনিকের অস্ত্র। বেঁধে গেল তুমুল লড়াই।

প্রায় দশ মিনিট স্থায়ী হল এ যুদ্ধ। ফলাফল বিস্ময়কর। শত্রুসৈন্য মারা পড়ল সব কজন। আর এ পক্ষে সাধারণ আহত হল মাহমুদা। বাকি সবাই প্রায় অক্ষত ফিরে আসতে সক্ষম হল। হস্তগত হল অক্ষত একটা সাজোয়াযান এবং মৃত সৈনিকদের ধ্বংস না-হওয়া অস্ত্রগুলো।

সবাই ফিরে এল মেজর সাহেবের বাগান বাড়িতে। মাহমুদা আহত হওয়া সত্ত্বেও লড়াইয়ের সফলতায় দারুণ খুশী। তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নেওয়া হল। সাথে গেল সালমা।

বাড়িতে এসে মেজর সাহেব কন্যা রুকাইয়ার সাথে কুশলবিনিময়ে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি জানতে চাইলেন, সে কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল সেই রাতের ভয়াবহ হামলা থেকে এবং এত দিন কার আশ্রয়ে কোথায় ছিল ইত্যাদি।

'আব্বাজান! মাথার জখমটাতে এখন খুব ব্যথা করছে' – বলল রুকাইয়া – 'আমি এখন একটু বিশ্রাম নেই, পরে সব বলব আপনাকে।'

◆ ◆ ◆

ঈগল মার্কিনিদের নিয়ন্ত্রিত কয়েদখানার মনোরম অতিথিশালার নরম বিছানায় শুয়েও চরম অস্থিরতায় ছটফট করতে লাগল। মোলায়েম গালিচার সুকোমল সুখ এক তিল পরিমাণও তার হৃদয়ে পৌঁছেনি। ঘুমানোর জন্য সে অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুম এল না। বরং এই নরম বিছানা যেন তার গায়ে কাঁটার মতো বিঁধছে। অবশেষে সে বিছানা ছেড়ে উঠে খাটের পাশে একটা কাঠের চেয়ারে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর জানালার কাছে গেল। জানালা খুলে দিল। জোৎস্নায় রুমটা ভরে উঠল।

ঈগল জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখতে লাগল। প্রকৃতিটা আজ যেন বড় বেশি ভালো লাগছে। মেঘমুক্ত আকাশে স্বদেশীয় চাঁদটা সমগ্র প্রকৃতিকে এক মায়াবী স্নিগ্ধ আলোয় ভরে তুলেছে। মাঝে-মাঝে কালো ফালি-ফালি মেঘখণ্ড দ্বিজরাজের দিকে তেড়ে আসছে। যেন এখনই নিশাপতির মসৃণ-কোমল কিরণমালা থেকে দুনিয়াবাসীকে বঞ্চিত করে দিবে। কিন্তু বারংবার কোশেশ করেও তারা ব্যর্থ হচ্ছে। সুধাকরের অনুপম অবয়বের সম্মুখে ওগুলো ঘেষতেই পারছে না। চন্দ্রিমার পাশাপাশি পুরো নীলিমা জুড়ে মিটিমিটি তারার মেলা বসেছে। মহাশূন্যে যেন কোনো উৎসব শুরু হয়েছে। তাই তো খেজুরকুঞ্জের ফাঁকে আর বৃক্ষরাজির শাখে মধুর কণ্ঠে সুর তুলেছে নিশাচর বিহঙ্গকুল। পুষ্পরাজি মনে হয় এই উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতেই একে-একে খুলে দিচ্ছে পাঁপড়িগুলো। আর সৌরভে পরিবেশটাকে মাতিয়ে তুলেছে।

প্রকৃতির এ অপরূপ লীলা-বৈচিত্র্য অবলোকন করে ঈগলের মন অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। যতক্ষণ জানালার কাছে ছিল, হৃদয়ে প্রফুল্লতা বিরাজিত ছিল।

ওখান থেকে চলে আসতেই মনটা খারাপ হতে লাগল। কারণ, ঈগলদের স্বভাবই হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো শূন্যলোকে ঘুরে বেড়ানো। খাঁচায় যত আনন্দ-আয়োজন থাকুক-না কেন, তার কাছে তা সবই অর্থহীন।

হঠাৎ কারো পদশব্দে ঈগল কক্ষের দরজার দিকে তাকাল। দেখল, এক সৈনিক প্রবেশ করছে। ঈগলকে পায়চারি করতে দেখে সৈনিক বলে উঠল, 'কি হে ইয়াংম্যান! নিশ্চয়ই তুমি কোনো দুশ্চিন্তা বা অস্থিরতায় ভুগছ। চিন্তা করো না; আমি এখনই তোমার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করছি।' বলেই সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

সৈনিক চলে গেল। ঈগল হতভম্বের মতো বসে পড়ল। খানিক বাদে সে দেখল, এক সুন্দরী যুবতী কক্ষে প্রবেশ করছে। মেয়েটা যে খাস আমেরিকান তা তার চলাচল ও পোশাকই বলে দিচ্ছে। হাফপ্যান্ট আর টাইটফিট একটা হাতাকাটা গেঞ্জি, এই তার সাকুল্যে পোশাক। কক্ষে প্রবেশের সময় সে এমন ভঙ্গিমা করল যেন সে কোনো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে এসেছে। এই রাতের বেলায়ও সে চোখে একটা খায়েরী সানগ্লাস পরেছে। এটা তার বাড়তি স্টাইল। কক্ষে ঢুকে সে খুব ভাবের সাথে ঈগলের মুখোমুখি বসল।

ঘটনার আকস্মিকতায় ঈগল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এবার সে সৈনিকের কথার মর্ম বুঝতে পারল। এত রাতে মেয়েটাকে তার কক্ষে পাঠানোর মতলব বুঝতেও বাকি রইল না। মার্কিনির এই ঘৃণ্য আচরণে সে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হল। তাই মেয়েটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে খোলা জানালা দিয়ে পুনরায় প্রকৃতির দৃশ্যাবলি দেখতে মনোযোগী হল।

আগন্তুক মেয়েটার ধারণা ছিল অন্য রকম। সে ভাবছিল, তার মতো সুন্দরীকে পেলে ঈগল খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবে। আদর করে নিজের কাছে বসতে দিবে। রঙ্গ-রসের আলাপ করবে; সুন্দরীদের পেলে যা সাধারণত সব পুরুষই করে। তবে তাকে সে অত সহজে ধরা দিবে না। প্রথমে রূপের জাদুতে দেওয়ানা করে তুলবে। তারপর নিজেই সে তার প্রেমে হাবডুবু খাবে। তখন তাঁর কাছ থেকে সহজে কাজ উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

নিজের রূপ সম্বন্ধে এতটুকু আত্মবিশ্বাস মেয়েটার আছে। কেননা, এ পর্যন্ত বহু নামজাদা যুবক তার রূপের সরোবরে হাবুডুবু খেয়েছে। আর ঈগল তো এক আরবীয় বুদ্ধু। তার ধারণামতে প্রথম দর্শনেই সে তাকে বুকে জড়িয়ে সোহাগ করতে চাইবে। কিন্তু ঈগল যখন একবারের বেশি তার দিকে ফিরেও তাকাল না, তখন সে আশাহত হল। ভাবের দেবী এবার হাটের দেবীতে পরিণত হল।

'আমাকে কী আপনার ভালো লাগছে না?' মেয়েটা ক্ষীণ কণ্ঠে জানতে চাইল।

'তোমার মতো এমন কুরূপা মেয়ে আমি জীবনে দ্বিতীয়টা দেখিনি।' কোনো ভূমিকা ছাড়াই ঈগল বলল।

ঈগলের উত্তর শুনে রাগে-ঘৃণায় মেয়েটার চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার পরিবর্তিত অবস্থা লক্ষ্য করে ঈগল বলল, 'শোনো হে উদাসিনী মেয়ে! জ্ঞানীরা বলেন, রূপ থাকে লাজে। নারী যদি উলঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে তার আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। শুধু নারী-ই নয়, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিটি আবরিত বস্তুই সুন্দর লাগে। আবরণ তুলে ফেললে প্রথম-প্রথম ভালো লাগলেও পরে সেটা কুৎসিত ও কদাকার হয়ে যায়। উলঙ্গপনা তোমার রূপের জাদুময়দা নষ্ট করে দিয়েছে।'

'আপনি যেটাকে উলঙ্গপনা বলছেন, এটা তো আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অংশ' – মেয়েটা বলল – 'আমাদের সমাজে একে দূষণীয় ভাবা হয় না, বরং এর বিপরীতে আপনি যেটা বলছেন সেটাকেই দূষণীয় ভাবা হয়, অসামাজিক বলে নিন্দা করা হয়।'

'হ্যাঁ, মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন তার রুচি ও মেজাজ উভয়েই পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়' – ঈগল বলল – 'রসগোল্লার স্বাদও তখন তিক্ত অনুভূত হয় এবং ভালো কোনো কথাও তার সহ্য হয় না। তেমনি তোমাদের গোটা জাতি ও সমাজ বস্তুবাদের ভয়ংকর জীবাণুতে আক্রান্ত। সে কারণে প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে উল্টো চলাটা তোমাদের কাছে সিদ্ধ বলে মনে হয়। আর কেউ যদি তোমাদের এই ভুল শুধরে নিতে বলে, তাহলে তাকে তোমরা শত্রু ভাব; তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। সুতরাং তোমাদের সমাজে উলঙ্গপনা-বেহায়াপনাকে যে খারাপ ভাবা হয় না, এ তোমাদের বিকৃত রুচি-মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। রুচির এই বিকৃতি যদি রোধ করা না যায়, তবে অচিরেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও নব-নব আবিষ্কার তোমাদের এই ধ্বংস ঠেকাতে পারবে না।'

'আপনার ধারণা ভুল মি. ঈগল' – মেয়েটা বলল – 'আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় উন্নত ও প্রগতিশীল। সেখানে পুরোপুরি ব্যক্তিস্বাধীনতা বিদ্যমান। সেজন্য নারীরাও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে পূর্ণ মাত্রায়। আপনি প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলছেন। তাহলে এটাও প্রকৃতির নিয়ম যে, প্রতিটি সুন্দর বস্তু স্বাধীনভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে। এতে বাঁধা দেওয়া অন্যায়। যেমন– ফুল একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্তু। মুক্ত আবহাওয়ায় সৌন্দর্য প্রকাশ করতে না দিয়ে আপনি যদি একে ঢেকে রাখতে চান, তবে কি ফুলটি তরতাজা থাকবে? তেমনি নারীও প্রকৃতির এক সৌন্দর্যময় ফুল। মুক্ত আবহাওয়ায় খোলামেলাভাবে না চললে নারীর সৌন্দর্যের সার্থকতা কোথায়? উপরন্তু এতে নারীর মানসিক উৎকর্ষ অর্জনেও বাধার সৃষ্টি করে। আর এজন্যই আমাদের সমাজ নারীদের খোলামেলা চলতে উৎসাহিত করে। এতে আপনি দোষের কী দেখলেন?'

মেয়েটার কথায় ঈগল না হেসে পারল না। আত্মপক্ষ সমর্থনে তার যুক্তি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু ঈগল বলল, 'শোনো মেয়ে! আসল কথা হচ্ছে,

যখন কোন জাতির পতনের ধারা শুরু হয়, তখন তাদের অবস্থা হয় মরুভূমির পথহারা দুর্ভাগা অভিযাত্রীর মতো। মধ্য মরুতে যার সহায়-সম্বল বলতে কিছুই সাথে নেই; নেই এক ফোঁটা পানিও। এই মরু তার সাথে বড় নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকে। লক্ষ্যহীন চলতে-চলতে এই পথিকের অবস্থা এমন হয় যে, সে নিজদেহের ভার বহনেও অক্ষম হয়ে পড়ে।

পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে মুখ এমনভাবে হা হয়ে যায় যে, তা বন্ধ করা সম্ভবপর হয় না। নিজ পরিধেয় বস্ত্রগুলোও অতিশয় ভারী মনে করে ছুড়ে ফেলতে থাকে। তখন তার সম্মুখে চকমক করে ওঠে এক রঙিন আলোকময় জগত। সে তখন দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করে। দৃষ্টিসীমা জুড়ে কেবল সবুজ-শ্যামল প্রান্তর। ফুল-ফলের মনোরম বাগ-বাগিচাসমূহ, চোখ জুড়ানো পাহাড়ী ঝরনাধারা। পানিতে পরিপূর্ণ অসংখ্য নদ-নদী। আরো দেখে সম্মুখে এক শহর। দলে-দলে মানুষ চলাচল করছে তাতে। গায়িকা-নর্তকীরা গাইছে-নাচছে। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর অসহায় পথিকটি পিপাসা মিটানোর উগ্র বাসনায় দৌড়ে যায় পানিসদৃশ্য মরিচিকার দিকে। ছলনাময়ী মরিচিকা চলে যায় দূরে। একসময় পথিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর। নির্দয় মরু তখন তার রক্ত শোষণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এরই নাম হচ্ছে মরুভূমির স্বপ্নিল ধোঁকা। তবে কেউ-কেউ বলেন, মরু সাহারার দয়াও হতে পারে, যে একজন পথিকের জীবন হরণ করার পূর্বে তাকে সুদর্শন ও চিত্তহারী কল্পনায় ব্যস্ত করে দেয়, যাতে তার মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভূত না হয়।

একটু থেমে ঈগল আবার বলতে শুরু করল, 'স্রষ্টা এই ধরণিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট কয়েকটি দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে। এই দায়িত্ব প্রতিপালনের মাধ্যমে মানবজীবন পৌঁছে যায় সাফল্যের স্বর্ণশিখরে, চলে যায় অনন্ত জীবনের চির শান্তির আবাসের পানে।

মরু পথিকের মতো, তোমার জাতি মানবজীবনের সাফল্যের এই সরণি হারিয়ে ফেলেছে। লক্ষ্যহীন জীবন-যাপন করতে করতে তারা একটা শূন্য প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে তারা কোনো গন্তব্য খুঁজে পাচ্ছে না। যেদিকেই দৃষ্টি দিচ্ছে নজরে আসছে কেবল ধূ-ধূ মহাশূন্য। যার ফলে তারা দিশেহারা হয়ে বলছে, পরকাল বলে কিছু নেই। আবার বলছে, মানুষ হল বানরের বংশধর। কখনো বলছে, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই, প্রত্যেকটি প্রাণী প্রাকৃতিক বিবর্তনে সৃষ্টি। কখনোবা বলে, স্রষ্টা আছেন, তবে তিনি একক নন। স্ত্রী, পুত্র ও নিজে এই তিনে মিলে যৌথ স্রষ্টা।

এভাবে চলতে-চলতে তারা নিজদেহের ভার বহনেও অক্ষম হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ– নিজেদের ঔরসজাত সন্তানের দায়ভার বহন করতে ভয় পাচ্ছে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল এঁটেছে। পিপাসায় তাদের কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। তাই

পানীয়র নামে কোকের বোতলসমূহে শূকরের রক্ত ও এলকোহল মিশিয়ে পান করছে। তোমার জাতি শ্রান্ত পথিকের মতো নিজ পরিধেয় কাপড়গুলোকেও অতিশয় ভারী ও ফালতু মনে করছে। যে কারণে জাতির একাংশের (নারীর) বস্ত্র খুলে উলঙ্গ করে নিয়েছে।

দিকভ্রান্ত মরুচারী এর পরবর্তী ধাপে যে রকম দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করে, তোমার জাতিও এ পর্যায়ে এসে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বুকে বাহারী মাকাল ফল দেখে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। নিত্যনতুন বিলাস-ব্যসন আবিষ্কারের মাধ্যমে মর্ত্যলোকেই স্বর্গসুখ লাভের ব্যর্থ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলাফল জিরো। সুখ নামক সোনার হরিণ ধরা না দিয়ে বরং মরু মরিচিকার মতোই দিনকে দিন সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে – বহুদূরে। তাই তোমার গোটা জাতি আজ অশান্তির দাবদাহে দগ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এবার আসা যাক তোমার যুক্তির বিষয়ে। তোমার দাবি অনুযায়ী নারী হল প্রকৃতির এক সৌন্দর্যময় ফুল। তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষার স্বার্থেই তাকে উলঙ্গ হয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করছ তুমি। কিন্তু তুমি কি অবগত আছ, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারীর দেহ অম্লীয় ও চুম্বকধর্মী আর পুরুষের দেহ ক্ষারীয় ও বিদ্যুৎধর্মী? আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, অম্লের সাথে ক্ষারের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে এফিনিটি বলা হয়। এই আকর্ষণ এত তীব্র ও সূক্ষ্ম যে, ক্ষারধর্মী দেহ ও অম্লধর্মী দেহের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক আকর্ষণ আছে। ক্ষারের আকেরটি গুণ হলো, এটা অম্লের সংস্পর্শে এলে অম্লের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়, যাকে রসায়ন শাস্ত্রের ভাষায় নিরপেক্ষীকরণ বা Neutralization বলা হয়। তার জন্য অনাবৃত অম্লধর্মী ও চুম্বকধর্মী নারীদেহের ওপর বিভিন্ন পুরুষের ক্ষারধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মী দেহের ঘন-ঘন প্রতিফলন হতে থাকলে নারীদেহের অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমে নারীদেহ পুরুষালী আকারবিশিষ্ট হয়ে 'পুরুষ রূপ' ধারণ করে। নানা জাতীয় পুরুষের দেহের ঘন-ঘন প্রতিফলন নারীদেহের সূক্ষ্ম ও কোমল কোষগুলোর ওপর যে সংঘাত সৃষ্টি করে, তা শরীরের প্রত্যেকটি কোষ এমনকি নারীর ডিম্বকোষকে পর্যন্ত সূক্ষ্ম 'এটমিক' ক্রিয়া দ্বারা বিধ্বস্ত করে ফেলে। এতে নারীদেহের অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হলে নারীদেহ ক্ষারদর্শী ও বিদ্যুৎধর্মী হয়ে পুরুষ রূপ ধারণ করে। এ কারণেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে বেপর্দা মেয়েদের কাছে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব হারিয়ে নারীদেহ পুরুষরূপ ধারণ করলে তাদের সৌন্দর্য ও নারিত্বের হানি ঘটে। নারীর সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার অর্থ শরীরের প্রত্যেকটি কোষসহ ডিম্বকোষের গঠন ও গুণ বিকৃত হয়ে যাওয়া। অতএব, নারীর সৌন্দর্য ও যৌন আকর্ষণ রক্ষার জন্য আবরণ দিয়ে আবৃত করা তথা পর্দার আবশ্যকতা রয়েছে। কাপড় পরিধানের ফলে এই কাপড়ের আবরণ অম্লত্বের ওপর ক্ষারত্বের

প্রতিফলন রোধ করে। চুম্বকধর্মী দেহের ওপর যে বিদ্যুৎধর্মী দেহের প্রতিফলন হয় এবং দু-জাতীয় দেহের মধ্যে যে আকর্ষণ স্বভাবজাত, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং বাস্তব বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় প্রমাণিত হল, শুধু ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে নয়; বরং গোটা নারীজাতির দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা এবং পরিপূর্ণতারও জন্য নারীর একান্ত নিজস্বার্থেই শালীন ও মার্জিত পোশাক পরা অত্যন্ত জরুরি।'

এ পর্যন্ত বলে ঈগল থেমে গেল। মেয়েটা খামোশ বনে গেছে। মুখ ফুটে কোনো কথা বলছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে, কথাগুলো সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। তাকে চুপ থাকতে দেখে ঈগল বলল, 'আমার কথাগুলো যদি তোমার খারাপ লেগে থাকে কিংবা অবাস্তব-বালখিল্য বলে মনে হয়, তাহলে নিজ সমাজের দিকে তুমি একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাও। কী দেখতে পাচ্ছ সেখানে? সেখানকার অবস্থা তো এই– অঢেল টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সিঁদকাটা, পকেটমারা ইত্যাদি ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তুমি বলছ, তোমার সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিদ্যমান। কিন্তু এটা কোন ধরনের স্বাধীনতা যে, বয়সের ভারে ন্যূব্জ বৃদ্ধ মাতাপিতাকে জোরপূর্বক বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো হয়! তাদের সন্তানরা মাসের পর মাস, এমনকি অনেক সময় কয়েক বছরেও তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যায় না!

তোমার দাবি অনুযায়ী আমেরিকান সমাজে নারীরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হল, তোমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি করুণার পাত্র এই নারী সম্প্রদায়। সমাজের নিম্নমানের যত কাজ রয়েছে, তার সবগুলো না হলেও বেশির ভাগই নারীদের হাতে অর্পিত। হোটেলগুলোতে পুরুষ বেয়ারা কালে-ভদ্রে দেখা যায়। সচরাচর নারীদের উপরই এই কাজ ন্যস্ত রয়েছে। দোকানে পণ্য বিক্রির কাজও বেশির ভাগ নারীরাই করে থাকে। পণ্যের বিজ্ঞাপন তো নারীদের ছাড়া প্রায় অসম্ভব। আর যেসব কাজের সম্পর্ক জনসাধারণের সাথে সেগুলোও নারীদের দায়িত্বে অর্পিত। বাড়ির বাইরের এসব দায়িত্ব পালনের পর নারীরা বাড়ির দেখাশোনা অর্থাৎ– খাবার তৈরি করা, ঘর পরিষ্কার করা এবং শিশুদের যত্ন-আত্তির দায়িত্বও সম্পাদন করে থাকে। উপরন্তু তাদের সামাজিক মর্যাদা এই যে, যেকোনো পুরুষ তার মনকে উদ্বুদ্ধ করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে এবং নিজের ইচ্ছামতো সর্বসমক্ষে তার নৈকট্য দ্বারা তৃপ্তি লাভ করতে পারে। আবার যখন মন ভরে যাবে, তখন তাকে ছেড়ে অন্য কারো সাথে সম্পর্ক গড়তে পারে।

সারকথা, তোমার জাতির পুরুষরা নারীদেরকে পদে-পদে উপভোগও করতে চায় আবার তাদের দ্বারা নিজেদের ব্যবসাকেও চমকাতে চায়। কিন্তু তারা

কোনোরূপ দায়িত্ব বহন করতে তৈরি নয়। এই স্বার্থসিদ্ধির প্রতারণাকে বৈধতার সনদ প্রদানের জন্য এর নাম রেখেছে 'নারী স্বাধীনতার আন্দোলন'। দাবি করা হয়, আমরা নারীদেরকে পুরুষদের সামনে দাঁড় করাতে চাই এবং তাদেরকে উচ্চতর পদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণত সমাজের তৃতীয় শ্রেণীর কাজ নারীদের হাতে অর্পিত এবং উচ্চতর পদগুলোতে যথাপূর্ব পুরুষদেরই আধিপত্য বিরাজমান।

সুতরাং তোমার বক্তব্য দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, মরু সাহারা যেমন একজন পথিকের জীবন হরণ করার পূর্বে তাকে অতিশয় সুদর্শন ও চিত্তহারী কল্পনায় ব্যস্ত করে দেয়, যাতে তার মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভূত না হয়, তেমনি দুনিয়ার মোহ তোমার জাতিকেও তার চাকচিক্যময় অবয়ব প্রদর্শন করে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে যে, ধ্বংসের পূর্বে তোমরা উলঙ্গপনা-বেহায়াপনা আর নৈতিকতাবিবর্জিত কাজগুলোকে বৈধ ভেবে বসে আছ। তোমাদের এই সুখ-আনন্দকে ধ্বংসসুখের আনন্দ হিসেবে অভিহিত করা যায়।'

ঈগল কথা শেষ করল। মেয়েটা পূর্বের মতোই মৌনতা অবলম্বন করে বসে রইল। কক্ষজুড়ে বিরাজ করছে এক অখণ্ড নীরবতা। অনেকক্ষণ পর মেয়েটা মুখ খুলল। তার কণ্ঠে এখন আর অহংকারের সেই রেশ নেই। সে বিনীতভাবে বলল, 'মি. ঈগল! আপনার কথাগুলো খুবই মূল্যবান ও যুক্তিযুক্ত। আমার এখন মনে হচ্ছে, আমরা আসলেই ভুলের মধ্যে আছি। যাহোক, রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। আমাকে দয়া করে আমার ডিউটি পালনের সুযোগ দিন।'

'তোমার ডিউটি পালনে আমি বাধা দিলাম কখন?'

'আমার ডিউটিই হল আপনার সেবা করা' – নিচের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা বলল – 'বলুন, কী করলে আপনার অস্বস্তি দূর হবে? আপনি যা বলবেন, তা-ই করার জন্য আমি প্রস্তুত।'

এই মেয়েটাকে পাঠানো হয়েছে ঈগলকে মার্কিনিদের চক্রান্তের জালে আটকানোর ফাঁদ হিসেবে। তাকে বলা হয়েছে, যে করেই হোক ঈগলের মন জয় করতে হবে। এজন্য যখন যা প্রয়োজন, তা-ই করতে হবে। প্রয়োজনে তার শয্যাসঙ্গী হতেও কোনোরূপ আপত্তি করা চলবে না। তাকে প্রতিনিয়ত চোখধাঁধানো রঙিন স্বপ্ন দেখাতে হবে। হৃদয়-মন উজার করে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। বিনিময়ে তার থেকে ইরাকি মুক্তিযোদ্ধা তথা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাজ করার প্রতিশ্রুতি নিতে হবে।

জেসিকা মেন্ডেজ নাম্নী এই তরুণীটা অতিশয় রূপসী ও দারুণ বুদ্ধিমতী। তার এ দুটা গুণের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েই লেফটেন্যান্ট কর্নের মাইকেল ফেব্রিকেন্ট সুদূর আমেরিকা থেকে তাকে সাথে নিয়ে এসেছিল। মার্কিন সৈনিকদের যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া এবং ইরাকি গেরিলাদের তৎপরতার বিরুদ্ধে গোয়ান্দাগিরি করার কথা বলে মেয়েটাকে আনলেও মূলত তার লক্ষ্য ছিল নিজের মনোরঞ্জন করা।

জেসিকা মেন্ডেজ তাদের সৈনিকদের উৎসাহ দেওয়া ও গেরিলা নেতৃত্বে ফাটল ধরানোর কাজে সর্বদা প্রস্তুত ছিল এ কারণে যে, তাকে বলা হয়েছিল 'ইরাক যুদ্ধ হল নতুন ক্রুসেড'। তাই সৈনিকদের পাশাপাশি প্রতিটি খৃষ্টানের জন্য এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা কর্তব্য। এ কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই মেয়েটা এই যুদ্ধ ফ্রন্টে এসেছিল। কিন্তু কর্নেল ফেব্রিকেন্ট যখন ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ করার পরিবর্তে তার সুন্দর দেহটার সাথে ক্রুসেড শুরু করল, তখন তার চিন্তা-চেতনা সব এলোমেলো হয়ে গেল। আর সে কারণে সে কয়েকবার দেশে ফিরেও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ফেব্রিকেন্ট সেই সুযোগ তাকে দেয়নি। এজন্য সকল কাজে সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

♦ ♦ ♦

ঈগলকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়ার পর মনোরম কক্ষে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁকে প্রভাবিত করা। তাঁর যুদ্ধবিধ্বস্ত মনটাকে রাজকীয় বিলাস-ব্যসনে আকৃষ্ট করে তাকে নিজেদের অনুগত করে নেওয়া। আর এ কাজে নারী হল এক মোক্ষম হাতিয়ার। কেননা, নারীর প্রতি যদি কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে তার নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিতে বেশি সময় লাগে না। নারীর প্রেমে দেওয়ানা পুরুষটা মহাবীর যোদ্ধা হলেও প্রেমিকার ইশারায় মুহূর্তে সে অস্ত্রসমর্পণ করতে তৈরি হয়ে যায়।

এই মন্ত্র জানা আছে মার্কিন সৈনিকদের। কেননা, এগারো শতকের সেই ভয়াবহ ক্রুসেড যুদ্ধে সুলতান গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তারা একটু-আধটু যে বিজয় অর্জন করেছিল, তা ছিল এই নারী অস্ত্র ব্যবহারের সুফল। এজন্য এটা তাদের পরীক্ষিত অস্ত্র বলা চলে। বর্তমানে এই অস্ত্র তারা স্যাটেলাইটের মাধমে ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বময়। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষিত নতুন ক্রুসেড যুদ্ধেও যথারীতি নারী-অস্ত্রের প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে। পার্থক্য এই, সে সময়কার যুদ্ধে নারীর ব্যবহার হত স্বশরীরে আর এখনকার যুদ্ধে তা হচ্ছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। তবে এর পাশাপাশি পুরনো ধারাও কিছু চালু রয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে। যেমনটা ঈগলের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাতের সৈনিক যখন ঈগলের দেখাশোনা করতে এসে তাকে নির্ঘুম রাত কাটাতে দেখল এবং তার অস্বস্তির কথা জানতে পারল, তৎক্ষণাৎ সে তা কর্নেল ফেব্রিকেন্টকে জানাল। সৈনিকের কথা শুনে কর্নেল ফেব্রিকেন্ট জেসিকা মেন্ডেজকে ডাকল। তাকে ঈগলের বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর তার উৎসাহ বাড়াতে বলল, 'বাগদাদের ঈগল একজন বড় মাপের গেরিলা নেতা। একে যদি আমাদের জালে আটকাতে পার, তাহলে এ মাসের মধ্যেই তুমি দেশে ফিরে যেতে পারবে।'

একথা শুনে জেসিকা মেন্ডেজ খুব খুশি হল। সে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! আজ রাতেই ঈগলকে খাঁচায় পুরে আপনার কাছে নিয়ে আসব। আপনি শুধু আপনার ওয়াদায় অটল থাকার প্রতিজ্ঞা করুন যে, পরে আবার আমাকে ধোঁকা দেবেন না।'

'আমি প্রভু যিশুর নামে প্রতিজ্ঞা করছি।' ফেব্রিকেন্ট বলল।

'আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাকে শুভসংবাদ জানাব।' জেসিকা মেন্ডেজ উল্লসিত হয়ে বলল।

ঈগলকে খাঁচায় আটকানোর পাকাপোক্ত মনোভাব নিয়ে জেসিকা মেন্ডেজ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। অস্ত্র-হাতিয়ার বলতে তার অর্ধনগ্ন শ্বেতাঙ্গ দেহখানি আর সোনার তারের মতো চিকচিক করা রেশম-কোমল চুলগুচ্ছ। তাই সে পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি দর্পণটার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজেকে যাচাই করে নিল।

এ সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইকেল ফেব্রিকেন্ট এগিয়ে এল আয়নাটার সামনে। সে জেসিকার চুলগুচ্ছ নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল, 'মিস জেসিকা! তোমার এই রেশমী চুল এমন একটা শক্ত শিকল যে, যদি একবার তা ঈগলের পায়ে পড়াতে পার, তবে সে স্বেচ্ছায় তোমার খাঁচায় প্রবেশ করবে।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন যেন তাই হয়' – জেসিকা মেন্ডেজ বলল।

মেয়েটি আনন্দচিত্তে ঈগলের কক্ষপানে এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রথম দর্শনেই ঈগলের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তার রূপ সম্বন্ধে ঈগলের রূঢ় মন্তব্যে মেয়েটা যারপরনাই বিস্মিত হল। উপরন্তু তার সমাজ-সংস্কৃতি ও জাতির চারিত্রিক পদস্খলন বিষয়ে ঈগলের বাস্তবসম্মত কথাগুলো তার মনে দারুণভাবে দাগ কাটল। তদুপরি কর্তব্যের খাতিরে সে ঈগলকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনার যা কিছু প্রয়োজন আমাকে বলুন, আপনি যা বলবেন তা-ই করতে আমি প্রস্তুত।'

প্রতিউত্তরে ঈগল তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল, কোনো প্রকার খেদমতের তাঁর প্রয়োজন নেই। সে চলে যেতে পারে।

ঈগলের উত্তর শুনে মেয়েটার চিন্তার জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হল। সে ভেবে পায় না, তার মতো একটা রূপসী যুবতীতে রাতের বেলা একাকি হাতের মুঠোয় পেয়েও কি লোকটার মনে কোনো ভাবান্তর ঘটল না? জ্বলে উঠল না তার কামনার আগুন? সেকি মানুষ না অন্য কিছু? এ সকল চিন্তার পরও সে আরেকটু অগ্রগামী হয়ে বলল, 'আচ্ছা মি. ঈগল! আমাকে দেখেও কি আপনি আমার প্রয়োজন অনুভব করছেন না?

'আমি পূর্বেই বলেছি, তোমাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু তুমি আমাকে বিরক্ত করছ কেন?' – কিছুটা চড়া গলায় ঈগল বলল– 'আমি মুসলমান। আমার ধর্ম আমাকে বেগানা নারীর সাথে সহযাপনে অনুমতি দেয়

না। এমনকি একাকি নির্জনে বেগানা নারীর সাথে কথা বলা পর্যন্ত নিষেধ। সুতরাং বুঝতেই পারছ। এ ব্যাপারে আমি কোনোরূপ আপস করতে পারব না।'

'আপনি আপনার ধর্মের বাধা মানলেন কই' – মেয়েটা বলল – 'আপনি এই নির্জনে আমার সাথে কত কথাই তো বললেন।'

'আমি মনে করি না, এই জায়গাটা নির্জন' – ঈগল বলল – 'এখানে দায়িত্বরত একাধিক সৈনিককে সতর্ক পদবিক্ষেপে পাহারা দিতে দেখা যাচ্ছে। তারা ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় কক্ষে প্রবেশ করতে পারে। অতএব, এটাকে নির্জন স্থান বলা যায় না। আর এজন্যই তোমার সাথে আমি এতক্ষণ কথা বলেছি। নতুবা আমার মুখ থেকে একটা কথাও বের হত না।'

'তাহলে এক্ষুনি দরজাটা বন্ধ করে দেই?' বলেই মেয়েটা উঠে দরজার দিকে গেল।

'না; কিছুতেই তুমি দরজা বন্ধ করবে না।' ঈগল রাগত স্বরে বলল।

'আহা! আপনি রাগ করছেন কেন?' – মেয়েটা হেসে বলল – 'দেখুন, এই রাতের আঁধারে কারাগারের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে আপনার ধর্মের কারো পক্ষে এখানে এসে দেখার সুযোগ নেই যে, আপনি কোনো মেয়ের সাথে রাত কাটাচ্ছেন।'

মেয়েটার একথা শুনে ঈগল হেসে দিল। তারপর তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আসলে তুমি এখনও বোকার স্বর্গে বাস করছ। একজন মুসলিম ও তার ধর্ম সম্বন্ধে তুমি একেবারেই অজ্ঞ। জেনে রাখো, মুসলমান ধর্ম পালন করে নিজের গরজে, কাউকে দেখানোর জন্য নয়। ইসলামে লোকদেখানো ইবাদাত কোনো ইবাদাতরূপেই গণ্য হয় না। হ্যাঁ, একজনকে দেখানোর জন্য আমরা ধর্ম পালন করে থাকি। তিনি হলেন আমাদের প্রভু, আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ। আর আল্লাহ হলেন এমন সত্তা, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতন। মানুষের সকল কল্পনা, চিন্তা ও ধারণারও খবর তিনি রাখেন। দুনিয়া ও দুনিয়ার বাইরে – মহাবিশ্বে এমন কোনো বিষয়, এমন কোনো বস্তু নেই, যা তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, সর্বত্র বিরাজমান। রাতের আঁধার, নিশ্চিদ্র নিরাপত্তাবলয় কোনো কিছুই তাঁকে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে না। এমনকি মহাসমুদ্রের অথৈ জলরাশির তলদেশে যদি কোনো পাথরের ভিতর কোনো রহস্য লুকায়িত থাকে, তবে তা-ও তাঁর অসীম জ্ঞানের বাইরে নয়। আর এ কারণেই একজন সত্যিকার মুসলমান শত নির্জন ও গোপনীয় স্থানেও কোনো পাপ করতে পারে না। সে জানে, দুনিয়ার আর কেউ না দেখলেও, দুনিয়ার কোন আদালতে তার পাপের, তার অপরাধের বিচার না হলেও মহান আল্লাহ তার সবকিছুই দেখছেন এবং তাঁর আদালতে তাকে অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। সুতরাং কিছুতেই আমি তোমার সাথে রাত কাটাতে পারব না। আর তোমার কোনো সেবারও আমার প্রয়োজন নেই।'

'আমাকে আপনার প্রয়োজন হোক বা না হোক, আপনি আমার সেবা গ্রহণ করুন আর না করুন, আমার প্রতি নির্দেশ আছে, আমাকে আপনার কাছে থাকতে হবে। অন্যথায় আমার দেশে ফেরা হবে না।' মেয়েটা অত্যন্ত বিষণ্ন কণ্ঠে বলল। তার চোখে পানি টলমল করছে।

'তোমাকে কী উদ্দেশ্য এখানে পাঠানো হয়েছে যদি তা খুলে বল, তাহলে হয়ত থাকতে পারবে' – ঈগল বলল – 'নতুবা তুমি এখানে থাকলে আমি পাশের রুমের বন্দিদের সাথে রাত কাটাব।'

'আপনি কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না' – মেয়েটা বলল – 'তাহলে এটা আমার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং কর্তব্যে অবহেলার দরুন কঠিন শাস্তি পেতে হবে। আপনি এখানেই থাকুন। আমি আপনাকে সবকিছু খুলে বলছি।'

জেসিকা মেন্ডেজ নাম্নী এই খৃষ্টান তরুণী এত দিন জানত, মুসলমান হল এক অসভ্য, বর্বর ও সন্ত্রাসী জাতি। তার উপর এই গোষ্ঠীটা অতিশয় নারীলোভী। নারী পেলে তারা হায়েনার মতো আচরণ করে থাকে। এদের মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা বলতে কোনো জিনিস নেই, যার বাস্তব প্রমাণ নাইন ইলেভেনের টু-ইন-টাওয়ার ও পেন্টাগনে বর্বরতম বিমান হামলা। সুতরাং মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, দস্যু-তস্কর, লোভী-লম্পট এবং নিষ্ঠুরতম একটা জাতির প্রতিকৃতিই মেয়েটা এত দিন লালন করছিল মনের মধ্যে। কিন্তু আজ বাগদাদের ঈগলের আচরণ, কথাবার্তা সর্বোপরি চারিত্রিক উৎকর্ষ তার এত দিনকার ধারণাকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। মুসলমান মানেই অসভ্য-দুরাচার আপাতত এটা তার কাছে মিথ্যে মনে হতে লাগল। অন্তত ঈগলের মতো উন্নত চরিত্রের মানুষরা যে ধর্ম অনুসরণ করে, তা অত খারাপ হতে পারে না, যতটা সে ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছে।

এসব ভাবনা-চিন্তার দরুন মেয়েটার হৃদয় ঈগলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। ঈগলকে সে অতিমানব হিসেবে ভাবতে লাগল। সেজন্য তাঁর কাছে সে তাদের সমস্ত কিছু খুলে বলল। নিজের নাম কী, বাড়ি কোথায়, কী উদ্দেশে ও কী বলে তাকে ইরাক আনা হয়েছিল, এখানে আসার পর তার সাথে লেফটেন্যান্টের প্রতারণা ও সর্বশেষ তাকে দিয়ে ঈগলের মন-মস্তিষ্কে যৌনতার আগুন জ্বালিয়ে তার মাথা থেকে বিদ্রোহের পোকা বের করানোর কূটকৌশল ইত্যাদি একে-একে বলে চলল মেয়েটা।

মেয়েটার সব কথা শুনে ঈগল বলল, 'আমি ইতিপূর্বেও তোমাদের মিত্র হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলাম; কিন্তু কাজ করেছি মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। তাই তোমাদের দৃষ্টিতে আমি বিশ্বাসঘাতক। এখন আবার নতুন করে আমাকে কিভাবে তোমরা বিশ্বাস করবে?'

'আপনাকে তারা কিভাবে বিশ্বাস করবেন, তা তারা-ই ভালো জানেন' – মেয়েটা বলল – 'আমাকে শুধু বলা হয়েছে আপনার সাথে থেকে আপনার মাথা থেকে বিদ্রোহের পোকা বের করে দিতে।'

'আচ্ছা, তাহলে তাদেরকে গিয়ে বলো, ঈগল আমাদের কব্জায় আসছে না' – ঈগল বলল – 'এবং তার মাথা থেকে বিদ্রোহের পোকাও বের করা যাচ্ছে না। বরং সে আমাদেরকে ইরাকছাড়া করতে বদ্ধপরিকর।'

'না, আমি তা পারব না!' – মেয়েটা আতঙ্কিত হয়ে বলল – 'আপনি ভেবে দেখেছেন কি, একথা বললে ওরা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করবে? আপনাকে ওরা বাঁচতেও দিবে না, মরতেও দিবে না।'

'তুমি চিন্তা করো না' – ঈগল বলল – আমি মুসলমান। আর মুসলমান শাস্তিকে ভয় করে না। তবে অবশ্যই আমি এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করব। তবে মনে করো না, আমি শাস্তির ভয়ে পালাচ্ছি।'

'শাস্তিকে যদি না-ই ভয় করেন, তাহলে পালাবেন কেন?' মুচকি হেসে প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'আমার দেশকে শত্রুমুক্ত করতে আমাকে পালাতেই হবে।' ঈগল অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল।

'আপনি কি মনে করেন, কারাগারের তিন স্তরের নিরাপত্তাবেষ্টনি অতিক্রম করে আপনি পালাতে পারবেন?' মেয়েটার প্রশ্ন ঈগলের কাছে।

'মিস জেসিকা!' – ঈগল বলল – 'আমরা এমন এক মহাপ্রতাপশালী অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস করি, যে শক্তির কাছে দুনিয়ার তামাম শক্তি, বাধা-বিপত্তি এক নিমিষে ধূলিসাৎ করা কোনো ব্যাপারই নয়। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সুবিশাল পর্বতমালাকে ধূলিকণার মতো উড়িয়ে নিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে অথৈ জলরাশিকে বালুকাময় প্রান্তরে রূপান্তরিত করতে পারেন। সুতরাং সেই মহামহিম আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তিনি অবশ্যই তাঁর এই মজলুম বান্দার প্রতি কোনো না কোনো সাহায্য পাঠাবেনই।'

'শত্রুদের কাছে এভাবে বলে-কয়ে পালানোর চিন্তা করা মানে যে হাতা-পা বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া তা ঈগলের অজানা নয়। তবু সে জেসিকা মেন্ডেজের কাছে নিজের পালানোর অভিব্যক্তি এজন্য প্রকাশ করল যে, মেয়েটির আচরণ থেকে ঈগল অনুমান করে নিয়েছে, সে তার জন্য কোনো বিপদের কারণ হবে না।'

বাস্তবে হলও তাই। মেয়েটা এ বিষয়টি কারো কাছে বলা দূরে থাক, বরং উপযাচক হয়ে নিজেই বলল, 'আপনি যদি এখান থেকে পালানোর সংকল্প করেই থাকেন, তাহলে আমি আমার জান দিয়ে হলেও আপনার সহযোগিতা করব।'

'তা হয় না' – ঈগল বলল – 'আমার জন্য তুমি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে যাও তা আমি কখনই চাইব না। তোমার এই সৎ নিয়তের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আপনি কি আমাকে এতই ঘৃণা করেন যে, আমার সহযোগিতাটুকু গ্রহণ করাও পাপ মনে করছেন?' – মেয়েটা ঈগলের হাতদুটা চেপে ধরে কান্নাজড়িত

কণ্ঠে বলল – 'আপনার কি বোন নেই? আপনার সেই বোন যদি আপনাকে বিপদাপন্ন দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত, তখন কি আপনি তার সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন? চুপ করে আছেন কেন? কথা বলুন।'

মেয়েটা ঈগলের স্পর্শকাতর এমন একটা জায়গায় খোঁচা দিল যে, সে সহসা অন্য এক জগতে হারিয়ে গেল। নিমিষে চোখের সামনে ভেসে উঠল তার বোন রাফিয়া সুলতানার নিষ্পাপ মুখখানি, যে কিনা শহীদ হয়েছিল মার্কিনিদের নৃশংস বিমান হামলায়। আর সেদিন শহীদ হয়েছিল তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও। মুহূর্তে তার বুকের ভেতর স্বজন হারানোর একটা অব্যক্ত বেদনা মোচড় দিয়ে উঠল। সে অনেক কষ্টে কান্না সংবরণ করল। চেপে ধরা হাতদুটি মেয়েটার মাথায় বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি আমার বোন। দুনিয়ার সকল কিশোরীই আমার বোন। আহা! আমার বোনটি থাকলে সেও আজ তোমারই বয়সী হত। হায়! সে যদি আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারত কিংবা আমি তাকে বাঁচানোর জন্য কোনো সহযোগিতা করতে পারতাম! তোমার সাহায্য আমি গ্রহণ করব বোন, সানন্দে গ্রহণ করব। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।'

ঈগলের কণ্ঠ কান্নার চেয়েও করুণ শোনা গেল। কথার আড়ালে সে যে কষ্ট লুকাতে চাচ্ছে, তা কান্নার চেয়ে শত গুণ বেশি কাতরতা প্রকাশ করছে। জেসিকা মেন্ডেজ তার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়রান হয়ে গেল। সে বলল, 'মি. ঈগল! আপনার বোনের কী হয়েছে? আপনি কি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন?'

'তোমার কথায় আমি কোনো কষ্ট পাইনি বোনটি আমার। তবে তুমি বোনের প্রসঙ্গ তুলে আমার শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতটা তাজা করে দিয়েছ।'

'প্লিজ ঈগল ভাই! বলুন; আপনার বোনের কী হয়েছে।'

মেয়েটার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ঈগল তার বোনের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা খুলে বলল, যা তাকে একজন শান্তশিষ্ট মানুষ থেকে একজন দুর্দান্ত যোদ্ধায় পরিণত করেছে।

সব শুনে জেসিকা মেন্ডেজ মনে খুব ব্যথা পেল। সে ঈগলকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঈগল ভাইয়া! আপনি শান্ত হোন। কে বলেছে আপনার বোন নেই? এই যে আমি আপনার একজন বোন আছি না! আমি আমাদের সেনাবাহিনীর অমানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এবং তাদের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। আমি জানি, আপনি কোনোদিনই তাদের ক্ষমা করতে পারবেন না। তবে এর জন্য আমি সেনাবাহিনীর চেয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি বেশি নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। কারণ, তার অপরিণামদর্শী যুদ্ধ ও বিদেশ নীতির কারণে আজ এ রকম হাজার-হাজার, লাখ-লাখ মানুষের হাসি-আনন্দ ধুলোয় বিলীন হচ্ছে। সেই সাথে বহির্বিশ্বের কাছে আমাদের দেশের মর্যাদাও হেয় হচ্ছে, যা একজন আমেরিকান হিসেবে আমার কাছে খুবই পীড়াদায়ক। সুতরাং আমি দেশে গিয়ে শান্তিকামী জনগণকে নিয়ে এক দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে

তুলব, যাতে বুশ ইরাকসহ অন্যান্য যে সকল স্থানে অনৈতিক যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে ফেলেছে, তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তবে যতক্ষণ-না আপনাকে এই বন্দিশিবির থেকে মুক্ত করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ইরাক ছাড়ছি না।'

'মহান আল্লাহ তোমার নেক নিয়তে বরকত দান করুন' – ঈগল বলল – 'রাত প্রায় শেষ; তুমি বিশ্রাম করো। আমি নামায পড়ে শোব।'

'রাত যেহেতু শেষ; সুতরাং আমার আর এখানে না থাকলেও চলবে' – মেয়েটা বলল – 'এখন আমি রুমে চলে যাচ্ছি। তবে আপনার-আমার মাঝে যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেটা এখানকার কাউকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। ওদের কাছে গিয়ে বলব, ঈগলকে বাগে আনতে হলে আরো কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'তা তুমি যা ভালো মনে কর বল।' ঈগল বলল।

'আচ্ছা ঈগল ভাইয়া! তাহলে এখন আমি চলি।'

পরে মেয়েটা একটা অদ্ভূত কাণ্ড করে বসল। সে ঈগলের মাথাটা ধরে কাছে নিয়ে কপালে একটা চুমু দিয়ে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটার এমন আচরণে ঈগল মোটেই অবাক হল না। কারণ, সে জানে, যাদের ঈমান নেই, তাদের লজ্জাও নেই। আর এই নির্লজ্জতা-ই হল বেঈমান সম্প্রদায়ের অহংকার; তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি।

যাহোক, মেয়েটা চলে যাওয়ায় সে আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর অযু করে ফজরের নামায পড়ল। নামাযান্তে কুরআন তিলাওয়াতে বসে গেল। কিন্তু ঘুমে কেবলই তাঁর চোখ বুজে আসছে। তবু সে তার দৈনন্দিন রুটিনের অংশটুকু না পড়ে ছাড়ল না। তিলাওয়াত শেষ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই সে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল।

তিন.

দুপুরের আহারের পর রুকাইয়া পিতাকে নিজের বেঁচে যাওয়ার কাহিনী বলতে শুরু করল। বলল, আব্বাজান! সেই ভয়াল রাতের পৈচাশিক হামলা থেকে আমার বেঁচে যাওয়া ছিল কুদরতের এক বিশেষ কারিশমা। আমার শুধু এতটুকু মনে আছে যখন বিল্ডিংয়ের উপর মুহুর্মুহু ভয়ংকর আওয়াজ হচ্ছিল এবং বিল্ডিংয়ের ছাদ ভেঙে পড়া শুরু হয়েছিল, তখন আমি ও আপনার জামাতা সালমান হাত ধরে একত্রে রাস্তার দিকে লাফ দিয়েছিলাম। লাফ দেওয়ার সময় সালমান রেলিংয়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। আর আমি রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়ানো মাল বোঝাই একটি ট্রাকের উপর গিয়ে পড়ি। জানি না, সালমানের পরিণতি কী হয়েছে। বলুন না আব্বাজান! তিনি কোথায় কী অবস্থায় আছেন?' বলেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'সে বেঁচে আছে এবং তার চিকিৎসা চলছে।' মেজর সাহেব কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে একথা বললেও তার দেশে চলে যাওয়ার বিষয়টি চেপে গেলেন।

সালমান বেঁচে আছে আপাতত এতটুকুতেই রুকাইয়া তৃপ্ত হল। তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করলেও লজ্জার কারণে সে পিতার কাছে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। তবে ছোট ভাই মুয়াজের কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলল না। কিন্তু মুয়াজের প্রসঙ্গ উঠলে তার বাবা চুপসে গেলেন। রুকাইয়া শোওয়া থেকে ধড়মড় করে ওঠে বসল। বলল, মুয়াজের কী হয়েছে আব্বাজান? আপনি কথা বলছেন না কেন?' তার কণ্ঠ করুণ আর্তনাদের রূপ নিল।

মেজর সাহেব মেয়েকে কী বলবেন সহসা তা স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে একটা চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন। বললেন, 'তুমি শান্ত হও মা! আমি তোমার কথাটা খেয়াল করিনি। মুয়াজকে একটি ভালো রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ভর্তি করেছি। তুমি সুস্থ হলে গিয়ে তার সাথে দেখা করে আসবে।' সেই সাথে তিনি কথার প্রসঙ্গও পরিবর্তন করে বললেন, 'মা-মণি! তুমি কিন্তু তোমার কাহিনী সম্পূর্ণ করনি। তুমি দোতলা থেকে লাফ দিয়ে মালবোঝাই ট্রাকের উপর পড়েছ। তারপর কিভাবে কী হল, তা কিন্তু বলনি?'

'আমি ট্রাকের উপর পড়েছি শুধু এতটুকুই আমার মনে আছে' – পিতার কথায় মুয়াজ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে রুকাইয়া তাঁকে নিজের কাহিনী পুনরায় বলতে শুরু করল– 'এরপর কি হয়েছিল তা জেনেছি আমার উদ্ধারকর্তা জনাব আব্দুল হাকিম সাহেবের নিকট থেকে, যিনি উক্ত ট্রাকের চালক ছিলেন। সে রাতে তিনি জাতিসংঘের ত্রাণ তহবিলের বিস্কুটের কার্টুনভর্তি ট্রাক নিয়ে বাগদাদ থেকে নাসিরিয়া যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর গাড়ির ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিল। তিনি রাস্তার পার্শ্বে গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন মেরামতের কাজে লেগে গেলেন। তাকে তার দুজন হেলপার সহায়তা করছিল। জায়গাটা ছিল আমাদের বাড়ির সম্মুখের রাস্তার পার্শ্ব। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িতে মার্কিনিদের হামলা শুরু হলে তারা গাড়ি ফেলে রেখেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে পালালেন।'

'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা গাড়ির কাছে ফিরে আসেন। গাড়িটা অক্ষত দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং গাড়ি নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মার্কিন সেনাদের চেকপোস্টে তাদের ট্রাকের মালামাল সম্বন্ধে তথ্য যাচাই শুরু হলো। আর সে সময়ই সৈনিকরা আমাকে দেখে পেল। ড্রাইভারকে ডেকে তারা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। মুহূর্তে তার কলিজা শুকিয়ে গেল। তিনি বুঝে ফেললেন, যে বাড়ির পাশে তিনি গাড়ি রেখেছিলেন, সে বাড়িতে যেহেতু বিমান হামলা হয়েছে, তাই ঐ বাড়িরই কেউ হয়ত বিপদ মুহূর্তে তার ট্রাকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি সাথে-সাথে বললেন, 'এ আমার মেয়ে। আহত হলে হাসপাতালে নিয়েছিলাম। হাসপাতালে সিট খালি নেই, ফ্লোরেও জায়গা নেই। রাত বেশি হওয়ায় ডাক্তারের চেম্বারগুলোও বন্ধ হয়ে

গেছে; তাই বাধ্য হয়ে গ্রামেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ভাবছি ওখানকার কোনো ডাক্তারকে ডেকে নেব।'

'আমাকে অচেতন দেখে সৈন্যরা বেশি সময় গাড়ি আটকে রাখল না। অন্য গাড়ির আগেই আমাদের ট্রাক ছেড়ে দিল। অল্প সময়ের মধ্যে ড্রাইভার তাদের গ্রামে পৌঁছে গেলেন। তার বাড়ির কাছাকাছি এলে ট্রাক থামিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন।

ঘটনাক্রমে সেই গ্রামেই তখন আত্মগোপন করে ছিলেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. আহমদ সালিক। ড্রাইভার তা জানতেন। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে আসেন তার বাড়িতে। আমাকে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে তিনি ট্রাক নিয়ে চলে গেলেন নাসিরিয়ার উদ্দেশ্যে। তবে যাওয়ার আগে ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ-পথ্যের তালিকা নিয়ে গেলেন। পরদিন বিকালে সবকিছু নিয়ে তিনি নাসিরিয়া থেকে ফিরে এলেন।'

'আমার হুঁশ ফিরে তারও তিন দিন পর। আমার জ্ঞান ফিরে আসায় ডাক্তার ও ড্রাইভার সাহেবের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমি যেহেতু তাদের কাউকেই চিনতাম না, তাই ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কোথায়? আপনারা কারা?'

ডাক্তার সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি এখন নিরাপদ স্থানেই আছ মা-মণি! আমি তোমার চিকিৎসক আর ইনি তোমার উদ্ধারকর্তা।' বলেই তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট ড্রাইভার সাহেবের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

'আমি ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে চেয়ে থাকলাম। আমার অবস্থা তখন এমন, যেন আমি পৃথিবীতে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করেছি। সব অচেনা, সব নতুন। পুরনো কোনো স্মৃতি আমার মস্তিষ্কে জাগরূক ছিল না। সবচেয়ে কষ্টের কথা হচ্ছে, আমি নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কে, কোথায় আমার ঘর, কে আমার বাবা-মা, কে আমার ভাই, কে আমার স্বামী এর কিছুই আমি স্মরণ করতে পারছিলাম না। দু-চোখে যা দেখতাম, সবই নতুন লাগত। অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতাম। এমনকি আমার বাচনভঙ্গিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসে গিয়েছিল।'

নিজের কাহিনী বলতে গিয়ে এ সময় রুকাইয়ার কণ্ঠ ভারী হয়ে এল। মেজর সাহেব হয়রান হয়ে বললেন, 'মা-মণি! তোমার এমন করুণ অবস্থা হয়েছিল। হায় আল্লাহ! তুমি ঐ নরপিচাশদের ধ্বংস করে দাও, যারা মানুষকে এভাবে কষ্ট দেয়, যারা আমার আম্মিজানের জীবনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাদের উপর তুমি কঠিন শাস্তি আরোপ করো খোদা।'

'আব্বাজান! ঐ অমানুষদের শুধু বদদোয়া দিলেই হবে না' – রুকাইয়া বলল – 'ওদের থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। কারণ, ওরা আমার উদ্ধারকারী এবং চিকিৎসকের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেছে। আর এই ব্যক্তিদ্বয় হলেন আমার সবচেয়ে আরাধ্যজন। কেননা, যখন আমি জীবনের একটা কঠিনতর

অঙ্গনে পৌঁছেছিলাম, এরা দুজন তখন শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নিজেদের আরাম-বিশ্রাম সব হারাম করে রাত-দিন আমার চিকিৎসা-সেবা করেছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তাদের সেই শ্রম সার্থক হয়েছে। আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এর পরিণতিতে তাদের গ্রেফতার হতে হয়েছে।'

'কী বললে, তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে!' – ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন মেজর সাহেব – 'কী কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে মা-মণি?'

'তাদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে' – রুকাইয়া বলল – 'ডাক্তার সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি যেহেতু সাদ্দাম হোসেনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, তাই তিনি বাথ পার্টির নেতাও বটে। আর সেই সূত্রে তিনি বিদ্রোহীদের মদদ দিয়ে থাকেন। দখলদার বাহিনী তাই তাকে হণ্যে হয়ে খুঁজছিল। তিনি একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ড্রাইভার সাহেবের গ্রামে এলেন। এই গ্রামে তার এক নিকটাত্মীয় থাকতেন। তার কাছেই এসে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু আমার চিকিৎসার জন্য ড্রাইভারের বাড়িতে আসাটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল।'

'আমার চিকিৎসার সময় যখন জ্ঞান ফিরছিল না, তখন তিনি বেচইন হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন ড্রাইভার সাহেব বাড়িতে ছিলেন না। একটা ঔষধের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বাড়িতে তখন অন্য কেউ ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি নিজেই বাজারে গেলেন। তিনি গিয়েছিলেন লুকিয়ে-লুকিয়েই। তবে বিপত্তি ঘটে ফেরার পথে। পথিমধ্যে তার সাথে দেখা হয় মার্কিন এক দালালের সাথে। ডাক্তার সাহেব তাকে এড়িয়ে প্রায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু সে বদমাশটা আগ বাড়িয়ে তার পথ রোধ করল। সে আনন্দে গদগদ চিত্তে তাঁর কুশলাদি জানতে চাইল। তিনি বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ করলেও তাকে মোটামুটি সন্তোষজনক একটা জবাব দিয়েই পুনরায় গ্রামের পথ ধরেন। দালালটাও তাঁর অনুসরণ করে গ্রাম পর্যন্ত।'

'এ ঘটনার পর ডাক্তার সাহেব সর্বদা একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতেন। ব্যাপারটা আমাকে ছাড়াও তিনি ড্রাইভার সাহেবকে বললেন। তাই আমার কাছেও বেশি সময় অবস্থান করতেন না। তবে আমার প্রয়োজনীয় মুহূর্তগুলোতে তিনি হাজির থকতেন যথাসময়ে।'

'এভাবে প্রায় মাসদুয়েক কেটে গেল। আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠি। একদিন ভোরবেলা ডাক্তার সাহেব শশব্যস্তে আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। শীতের সকালে তার পুরোটা কপাল জুড়ে বড়-বড় ঘামের ফোঁটাগুলোই জানান দিচ্ছিল, তিনি বড় ধরনের কোনো পেরেশানিতে ভুগছেন। রুমে প্রবেশ করে আমার মাথার কাছটিতে বসলেন। আমার হাতের ব্যান্ডেজ খুললেন। পরীক্ষা করলেন। পুনরায় নতুন ব্যান্ডেজ করলেন। মাথার জখম দেখলেন। ঔষধের নতুন একটা তালিকা প্রস্তুত করার পর আমার সামনে

রাখলেন। তারপর তার হাতদুখানা আমার মাথায় বুলিয়ে ডান হাতখানা তার চোখ ও বুকের সাথে লাগিয়ে বললেন, মা-মণি! আর সপ্তাহদুয়েকের মধ্যেই তোমার হাত ভালো হয়ে যাবে এবং মাসদুয়েকের মধ্যে মাথার জখমও সেরে যাবে বলে আমি মনে করছি। তবে তোমার সাথে এটাই হয়ত আমার শেষ দেখা। তুমি আমার জন্য দোআ করবে। তোমাকে আমি আপন কন্যা বলেই মনে করছি। কিন্তু তোমার চিকিৎসার পুরো সময়টা কাছে থাকতে পারলাম বলে আমি খুবই দুঃখিত। আমি চললাম আম্মাজান। বলেই তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

'ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কক্ষে প্রবেশের পর তার কর্মকাণ্ড এত ত্বরিৎ ছিল যে, আমি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার ফুরসতই পেলাম না। তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে আমি শুধু হা করে তাকিয়েই রইলাম। কিন্তু তিনি বের হয়ে বেশি দূর যেতে পারলেন না। ঠিক সে সময়ই ড্রাইভার সাহেব বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করলেন। ডাক্তার সাহেবকে অনেক বলে-কয়ে তিনি ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। তাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, ডাক্তার সাহেবে! আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত ও জ্ঞানী। আপনাকে আমি অনেকবার বলেছি, যেদিন ধরা পড়ার সময় হবে, সেদিন মাটির তলে লুকিয়ে থেকেও বাঁচা যাবে না। তাছাড়া এই গ্রাম্য এলাকা শহরের চেয়ে বেশি নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত।'

'ড্রাইভার সাহেব! আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা আমিও বুঝি' – বললেন ডাক্তার সাহেব – 'কিন্তু সেই বদমাশ লোকটা গত রাতে আমার ফুফির বাড়িতে এসেছিল। তার সাথে আমার অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সুতরাং এখন এই গ্রামে থাকা আমার জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। তাছাড়া... ।'

'ডাক্তার সাহেব তার কথা শেষ করতে পারলেন না। এরই মধ্যে ঘরের বাইরে তুমুল হট্টগোল শোনা গেল। দেখতে না দেখতে আট-দশ জন সৈন্য অস্ত্র তাক করে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে তারা কোনো কথাবার্তা ছাড়াই ডাক্তার সাহেবকে হ্যান্ডকাপ পরাল। ড্রাইভার সাহেব তাদের বাধা দিলেন। সৈন্যরা তাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং উঠে রাগে কাঁপতে-কাঁপতে অন্য কক্ষে চলে গেলেন। সেখান থেকে তার বন্দুকটা নিয়ে এলেন। সৈন্যরা তখন ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। তিনি পিছন থেকে তাদের দিকে গুলি ছুড়লেন। দুজন সৈন্য পড়ে গেল। অন্যরা ঘুরে দাঁড়াল। তারা পাল্টা গুলি ছুড়ল। ড্রাইভার সাহেব আহত হলেন। সৈন্যরা তাকেও গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল।'

'তাদের দুজনের গ্রেফতারিতে সমগ্র গ্রামজুড়ে এক গভীর শোকাবহ পরিবেশ তৈরি হল। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ড্রাইভার সাহেবের বাড়িতে এসে ভিড় জমাল। মহিলারা ঘরে এসে ড্রাইভারের স্ত্রী-কন্যা ও আমাকে সান্ত্বনা দিতে

লাগলেন। তরুণ-যুবকরা দলবদ্ধ হয়ে শহরের দিকে ছুটল। সেখানে গিয়ে তারা এক অবাক কাণ্ড করে বসল। ড্রাইভারের মুক্তির দাবিতে তারা থানা ঘেরাও করল। থানা থেকে বলা হল, আসামীদের সরাসরি জেলখানায় নেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাদের অপরাধ প্রমাণিত, তাই থানা হাজতে আনা হয়নি। যুবকরা সেখানকার অবরোধ তুলে নিল।'

'থানা থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে যুবকরা চলে গেল জেলখানার দিকে। পথে যেতে-যেতে তারা মার্কিনবিরোধী স্লোগান তুলল। দেখতে-দেখতে বাগদাদের বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ এই মিছিলে যুক্ত হয়ে মিছিলকে অনেক বেশি লম্বা করে তুলল। বিশ-পঁচিশজন তরুণ-যুবকের মিছিল পরিণত হলো বিশ-পঁচিশ হাজার মানুষের মিছিলে।'

'আব্বাজান! এ ব্যাপারে আপনিও অবগত আছেন যে, সেদিন আবু গারিব কারাগারে মার্কিনিরা কেমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল এবং এর মোকাবেলায় তারা কেমন নোংরা পদক্ষেপ নিয়েছিল।'

'হ্যাঁ মা-মণি! সেদিনের সেই বিক্ষোভ দখলদার মার্কিনিদের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল' – মেজর সাহেব বললেন – 'তারা বিক্ষোভকারীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে তাদের শান্ত করেছিল। কিন্তু অবরোধ তুলে নিতেই বেঈমানের দল নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করল। আর তাতে পাঁচ-পাঁচটি তরতাজা যুবক শহীদ হল। আহত হল অসংখ্য। এ তথ্য আমার জানা আছে। কিন্তু তারা কার মুক্তির জন্য কারাগার ঘেরাও করেছিল, তা জানতে পারিনি। এখন তোমার কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারলাম।'

'বিক্ষোভ মিছিলে গুলিবর্ষণে নিহত পাঁচ যুবকের মধ্যে দুজন ছিল ড্রাইভারের গ্রামের। বাকি তিনজন শহরের অধিবাসী' – রুকাইয়া বলল – 'ড্রাইভারকে মুক্ত করে আনতে গিয়ে দুই যুবক লাশ হয়ে ফেরায় গ্রামের মানুষ শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেল। মানুষের বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল। গ্রামে যেন একটা প্রাণীও নেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হল।'

'আমি আহত ছিলাম বলে একা চলাচল করা কষ্টকর ছিল। তদুপরি গ্রামবাসীদের এই কঠিন মুহূর্তে চুপ করে ঘরে বসে থাকা আমার জন্য সম্ভব হল না। আমি ড্রাইভারকন্যা তাসনিয়াকে বলে পাঠালাম, যেন গ্রামের সমস্ত মানুষ তাদের বাড়িতে চলে আসে। মেয়েটি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় সারা গ্রামে সংবাদ পৌঁছে দিল। রাত ১১টা নাগাদ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সেখানে এসে সমবেত হলো। আমি অনেক কষ্টে তাসনিয়ার সহায়তায় ঘরের দরজায় এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসলাম। তারপর উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললাম, প্রিয় গ্রামবাসী! আমি এই গ্রামের একজন অতিথি, আশ্রিতা। আমি আহত। আপনাদের দুঃখ-শোক দেখে আমি নিজের কষ্টের কথা প্রায় ভুলেই গেছি।'

'তারপর তাদেরকে আমার বিস্তারিত পরিচয় ও কাহিনী শুনিয়ে বললাম, আজ আমরা নিজদেশে পরবাসী। হানাদাররা আমাদের সকল মৌলিক ও মানবিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং দুশমনকর্তৃক নির্যাতিত হয়ে শুধু শোক পালন করলে চলবে না। শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে শত্রু থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। এই শোককে পুঁজি করে আমাদের দেশ থেকে তাদের বিতাড়নের শপথ নিতে হবে। আমাদের যে দুই ভাই আজ শহীদ হল তাদের বিদেহী আত্মা আমাদেরকে এই আহ্বানই জানাচ্ছে। অতএব, আপনারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিশোধ নিবেন, নাকি ঘরের দরজা বন্ধ করে তাদের জন্য শোক-মাতম করবেন! সেটাই আমি জানতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে।'

'আমার এই প্রশ্নের উত্তরে নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই 'আমরা প্রতিশোধ নেব' বলে চিৎকার করে উঠল। গ্রামের প্রতিটি তরুণ-যুবক এখন ইরাককে দখলদারমুক্ত করার মহান মুক্তিযুদ্ধে শামিল হতে প্রস্তুত।

কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও গাইড করার মতো লোক নেই। সেজন্য আমি পরদিনই ড্রাইভারকন্যা তাসনিয়াকে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। অবশ্য আমার শরীরের যে অবস্থা ছিল, তা সফর করার মতো তেমন উপযোগী হয়নি। এ অবস্থায় সফর করে বাগদাদ পৌঁছার আগেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। ফলে অনেক কষ্টে মাহমুদাদের বাসায় গিয়ে উঠি। সেখানে আমাকে তিন দিন অবস্থান করতে হয়েছে। এই তিন দিনেই তাসনিয়া মাহমুদা ও সালমার কাছ থেকে অস্ত্র চালনার তালিম নিয়ে ফেলেছে। তিন দিন পর আজ সকালে আমি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেই। মাহমুদা ও সালমাও আসার জন্য জিদ ধরে এই ওদেরও সাথে করে নিয়ে আসি।'

'যাহোক আব্বাজান! আগামী দিনের মধ্যে তাসনিয়ার সাথে চারজন প্রশিক্ষক মুজাহিদকে গ্রামে পাঠাতে হবে। গ্রামের মানুষ অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছেন। তারা মার্কিনিদের ইরাক থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর।'

'কাল নয় মা-মণি! আজকেই আমি গ্রামে প্রশিক্ষক পাঠাব' – মেজর সাহেব মেয়ের কাছ থেকে তার সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন – 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি একদিন দূরের কথা একটা ঘণ্টাও নষ্ট করতে রাজী নই। কেননা, আমেরিকা দিনের পর দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তাদের মোকাবেলা করতে আমাদের আরো বেশি প্রশিক্ষিত মুক্তিসেনার প্রয়োজন। মা-মণি তাসনিয়া! তুমি তৈরি হও; আমিও তোমাদের সাথে যাব।' ড্রাইভারকন্যা তাসনিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন মেজর সাহেব।

রুকাইয়া পিতার এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুবই প্রীত হল। তাই সে পিতাকে সাধুবাদ জানিয়ে বাড়ির সামনের ফুলবাগানে পায়চারি করতে চলে গেল। সাথে নিল তাসনিয়াকে। তাসনিয়া তার পিতার একমাত্র সন্তান। পিতার গ্রেফতারিতে স্বভাবতই তার মনটা ভারাক্রান্ত। রুকাইয়া তার মনের এই অবস্থাটা বুঝতে

অক্ষম নয়। তবু তাকে সান্ত্বনা প্রদানের আদলে কিছু হাস্য-রসময় গল্প বলল। তাতে প্রাধান্য ছিল সালমানের সাথে তার প্রেম থেকে পরিণয়ের কাহিনী। সেই সাথে শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন আনন্দঘন মুহূর্তের গল্পও বলল সে তাকে।

তাসনিয়াকে এসব গল্প বলার উদ্দেশ্যই ছিল তার মনের ব্যথা হাল্কা করা। নতুবা ড্রাইভার সাহেবের গ্রেফতারিতে রুকাইয়া নিজেও কম উদ্বিগ্ন নয়। তিনি তাসনিয়ার পিতা হলেও তার কাছেও তিনি পিতার চেয়ে কম নন। কিন্তু দুনিয়ার রীতিই হল ভাঙা-গড়ার মাঝে বেঁচে থাকা। এখানে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুই স্থায়ী নয়। সুতরাং পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ-বঞ্চনা এখানে নিত্যসঙ্গী। সেজন্য কখনো পাওয়ার আনন্দে যেমন মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেলিত হওয়া অনুচিত, তেমনি হারানোর বেদনায় হতাশায় ভেঙে পড়াও অন্যায়। বরং তাকদিরের ফয়সালা মেনে নেওয়ার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে প্রতিটি মানুষের জন্য।

রুকাইয়া এই বাস্তবতায় বিশ্বাসী। এ মুহূর্তে তাসনিয়াকে সে একথার মর্মই বোঝাতে চাচ্ছে। তবে তাকদীরের উপর ভরসা করে নিরুত্তাপ বসে থাকার সে ঘোর বিরোধী।

ফুলবাগানে ঘুরতে-ঘুরতে মাগরিবের আযান পড়ে গেল। ঘরে এসে রুকাইয়া ও তাসনিয়া নামায আদায় করে সেখানে বসেই কথাবার্তা বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মেজর সাহেব এলেন তাদের কাছে। বললেন, মধ্যরাতের পর তারা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন; তাসনিয়া যেন প্রস্তুত থাকে।

◆ ◆ ◆

ঈগলের ঘুম ভাঙল সকাল ১০টার দিকে। ঘুম ভাঙলেও শরীরের জড়তা কাটেনি। আরো কিছু সময় ঘুমাতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু ক্ষুধায় পেটটা চোঁ-চোঁ করছে। ওকে সামলানো যাচ্ছে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। ঘুম থেকে ওঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে কামরায় ফিরে আসতেই দেখল, নাস্তা এসে গেছে। নিয়ে এসেছে জেসিকা মেন্ডেজ। সময়মতো নাস্তা হাজির হওয়ায় ঈগল মনে-মনে খুশিই হল। ভাবল, মেয়েটা আসলেই তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। পরক্ষণেই ভাবল, সারাটা রাত তো সেও ঘুমায়নি, আবার এখন নাস্তাও তৈরি করে আনল; তাহলে কি সে সকালেও ঘুমায়নি? এই চিন্তা আসতেই সে মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু তার চেহারার দিকে তাকিয়ে ঈগল চমকে উঠল। মেয়েটার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক রকম ফুলে গেছে। চোখদুটা রক্তজবার মতো লাল বর্ণ ধারণ করেছে, যা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, অত্যধিক কান্নাকাটির দরুন তার এই বেহাল দশা।

নাস্তার ট্রে টেবিলের উপর রেখে সে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। ঈগল তার কাছে জানতে চাইল, কী হয়েছে তোমার? চেহারাটার এই অবস্থা কেন? কোনো অঘটন ঘটেছে কিনা? কিন্তু কোনো কথাই সে বলছে না, যেন বোবা হয়ে গেছে। বিপরীতে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

এবার ঈগল তার কাছে গেল। বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার জেসিকা মেন্ডেজ? কথা বলছ না কেন? তুমি কি বোবা হয়ে গেছ?'

মেয়েটা ঈগলের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে শিশুর মতো জোরে কান্না জুড়ে দিল। যেন সে এতক্ষণ কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিল আর ঈগলের হাতের ছোঁয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেছে।

ঈগল তাকে একটা চেয়ারে বসাল। মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল। রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বোন; আমাকে খুলে বলো। তুমি তো একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে। এভাবে কাঁদছ কেন?'

'হায়! এই কান্না দিয়ে যদি আমি আমার নির্বুদ্ধিতা ঢাকতে পারতাম।' বলেই সে আবারও কাঁদতে লাগল।

'আহা, কী হয়েছে খুলে বলবে তো!' – ঈগল উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল – 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ঈগল ভাইয়া! আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে' – জেসিকা মেন্ডেজ বলল – 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইকেল ফেব্রিকেন্ট আসলে একটা শয়তান প্রকৃতির মানুষ। রাতের বেলা আপনার-আমার মধ্যে সে সংলাপ হয়েছিল, তা ডকুমেন্টসহ তার কাছে পৌঁছে গেছে।'

'কে বলল এসব তাকে?' – জিজ্ঞাসা ঈগলের – 'নিশ্চয়ই তার কোন স্পাই লুকিয়ে ছিল আশপাশে কোথাও?'

'না ভাইয়া, তা নয়' – জেসিকা মেন্ডেজ বলল – 'তিনি এখানে আধুনিক প্রযুক্তির কৌশল ব্যবহার করেছেন। আমাকে আপনার কাছে তিনি কেন পাঠিয়েছিলেন, তা আপনাকে আমি বলেছি। এর সাথে তার আরও একটি গোপন দুরভিসন্ধি ছিল; যে ব্যাপারে আমি নিজেও অবগত ছিলাম না...।' এ পর্যন্ত বলেই মেয়েটা থেমে গেল।

ঈগল তাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'কী হল মেন্ডেজ? তুমি চুপ হয়ে গেলে যে!'

'ভাইয়া! এ এমন এক বিবেকবর্জিত কাজ, যার বর্ণনা দিতেও এখন আমার দ্বিধা লাগে। অবশ্য ইতিপূর্বে এসব বলতে বা করতে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ আমার ছিল না। আপনিই আমার মধ্যে এই বিবেকবোধ জাগ্রত করে দিয়েছেন। আমার বিবেকের বদ্ধ তালাটা আপনিই খুলে দিয়েছেন।

একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল, 'কর্নেল ফেব্রিকেন্ট আপনাকে হাত করতে চেয়েছিলেন যেকোনো উপায়ে। তার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় ও কৌশল তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন। আমি যখন আপনার কাছে আসার প্রস্তুতি শেষ করে তার থেকে বিদায় নিয়ে আসছিলাম, তখন তিনি আমার ডান হাতে একটা ডায়মন্ডের তৈরী ব্রেসলেট পড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি সফল হলে এটা চিরদিন তোমার থাকবে।' ব্রেসলেটে কতগুলো ডিম্বাকৃতির পাথর বসানো ছিল।

আসলে এগুলো কোনো পাথর ছিল না। এগুলো ছিল এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিডিও যন্ত্র, যা আমি বুঝতে পারিনি।'

'প্রকৃতপক্ষে আপনাকে তিনি ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিলেন। আমার সাথে যদি আপনি সেই আচরণ করতেন, যেজন্য আমাকে পাঠানো হয়েছিল অথবা সাধারণ নারীলোভী পুরুষরা যা করে থাকে; তাহলে এটাকে পুঁজি করেই আপনাকে তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারতেন। যেহেতু তার কাছে ভিডিও ফুটেজ থাকত, সেহেতু আপনি মান-ইজ্জতের ভয়েই তার কথা মেনে চলতে বাধ্য হতেন। কিন্তু সকালে আমি ফিরে যাওয়ার পর কর্নেল যখন দেখলেন, তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি, বরং আমি আপনার পলায়নে সাহায্য করার ঘোষণা দিয়েছি, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আমার দুগালে এলোপাতাড়ি চড়থাপ্পড় মারতে থাকলেন। আমার চিৎকার শুনে অন্যান্য সৈনিকরা এগিয়ে এসে আমাকে তার হিংস্র থাবা থেকে উদ্ধার করে।'

'আমি আমার রুমে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ি। কারণ, আমার জন্মের পর এই প্রথম আমি কারো হাতের মার খেলাম। সেজন্য ব্যথার চেয়ে ঘৃণা ও লজ্জার ব্যাপারটা ছিল বেশি। কিছুক্ষণ পরই কর্নেল আমার রুমে এল এবং আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার অপরাধের জন্য আরো শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে পারলাম না। তবে আর একটা দিনও তোমাকে এখানে থাকতে দেওয়া হবে না। আজ রাতের ফ্লাইটেই তোমাকে ওয়াশিংটন পাঠানো হবে।'

'তাহলে তো ভালোই হল যে, তুমি দেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেলে।' সব শুনে ঈগল বলল।

'ঈগল ভাইয়া! আপনি বিষয়টা এত হাল্কাভাবে নিলেন' – ঈগলের প্রতিক্রিয়া শুনে বিস্মিত হয়ে জেসিকা মেন্ডেজ বলল – 'আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে যদি এই ছাড়পত্র পেতাম, তাহলে অবশ্যই আমি খুশি হতাম। কিন্তু আপনাকে বন্দিশালার এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখে চলে যাওয়ার কথা ভাবলেই মনটা তিক্ততায় ভরে ওঠে। আমি আপনাকে যতটুকু শ্রদ্ধা করি, তার চেয়ে বেশি নমস্য করি আপনার ধর্মকে। যে ধর্মের নির্দেশ পালন করে আপনি আমার মতো একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে আপনার ভক্তে পরিণত করেছেন এবং কর্নেল ফেব্রিকেন্টের নোংরা পরিকল্পনাকে ব্যার্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনাকে ছেড়ে আমি দেশে গিয়েও শান্তি পাব না ভাইয়া! তাই আপনিও আমার সাথে চলুন।'

'কোথায় যাব তোমার সাথে, মিস জেসিকা?' বিস্মিত হয়ে ঈগল মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল।

'কেন, আমাদের দেশে, আমেরিকায়' – জেসিকা মেন্ডেজ বলল – 'আপনার যেহেতু দুনিয়ায় কেউ নেই, তাই আমার সাথে চলুন। আমি আজীবন একজন

বোনের মতো আপনার সেবা-যত্ন করে যাব। ইরাকের যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনি চলে এলে আপনাকে আমি বাধা দেব না।'

'আমার প্রতি তোমার এই হৃদ্যতার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ' – অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে ঈগল বলল – 'তোমার এই বদান্যতার কথা আমি চির দিন স্মরণ রাখব। কিন্তু বোন, আমার দেশকে শত্রুকবলিত রেখে আমি নিজের সুখের জন্য অন্য কোথাও আশ্রয় নেব এমন পরামর্শ তুমি আমাকে দিও না। এমন দেশদ্রোহী কাজ আমার দ্বারা কোনোদিন হবে না। আমি আমার দেশকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি। এ সেই জমিন, যেখানে আমি দৈনিক পাঁচবার মাথা ঠেকিয়ে আমার স্রষ্টার আরাধনা করি। তাই এ দেশের ভূমি আমার জায়নামায। এ জমিনের পবিত্র কোলে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন। তাই এটা তাদের গোরস্তান। সুতরাং পবিত্র জায়নামায আর গোরস্তানসদৃশ আমার দেশের এই ভূমির প্রতিটি কণার সাথে মিশে আছে আমার হৃদয়-প্রেম। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভূমি শত্রুমুক্ত না হবে, আগ্রাসনমুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাব। এ আমাদের অবশ্য কর্তব্য।'

'তাছাড়া আমি তোমার সাথে আমেরিকায় গেলে আমার টার্গেট থাকবে তোমাদের জালিম ও কাপুরুষ প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে হত্যা করা। তখন আমার জন্য তুমি এক মহা-মুছিবতে পড়বে। সুতরাং এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। আর তুমি আজই দেশে চলে যাও। নতুবা পরে আবার ফেব্রিকেন্টের মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আর আমার জন্য প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করো, তিনি যেন আমার আশু মুক্তির কোনো ফয়সালা করে দেন।'

ঈগলের বক্তব্য শুনে মেয়েটা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার প্রতি। তারপর তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি তো মেয়েমানুষ। আমার কথা কি প্রভু শুনবেন? আমার ফরিয়াদ কি তিনি মঞ্জুর করবেন? তাছাড়া আমরা সাধারণ মানুষ। আর সাধারণ মানুষের আরজি কি ঈশ্বর সরাসরি গ্রহণ করেন? গুরু-পাদ্রী ছাড়া তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যায় না। কিন্তু পাদ্রীরা তো কিছুতেই একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জন্য প্রার্থনা করবেন না।'

'জেসিকা! আমার খোঁজে এমন একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি ভাড়া করা গুরু-পাদ্রীদের প্রার্থনা কখনো কবুল করেন না' – ঈগল বলল – 'তিনি সরাসরি তার অনুগতদের ফরিয়াদ শোনেন এবং তা মঞ্জুর করেন। তাঁর কাছে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সাধারণ-অসাধারণ বলে কোনো প্রভেদ নেই। তুমি যদি একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমার ফরিয়াদ কবুল করবেন।'

'আমি কিভাবে তার কাছে ফরিয়াদ জানাব, আমাকে তা শিখিয়ে দিন না ঈগল ভাইয়া!'

'তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হলে আগে তাঁকে চিনতে হবে' – ঈগল বলল – 'তাঁর পরিচয় জানতে পারলে প্রার্থনা করার পদ্ধতিও জানা যাবে। সেজন্য তোমাকে প্রথমেই তাঁর বাণী অধ্যয়ন করতে হবে। তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

'তাঁর সেই বাণী আমি কোথায় পাব ভাইয়া?' মেয়েটা প্রশ্ন করল ।

'এটা কোনো দুষ্প্রাপ্য বস্তু নয় বোন!' – ঈগল বলল – 'তুমি দেশে গিয়ে যেকোনো মুসলিম কমিউনিটিতে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবে।'

'আচ্ছা ভাইয়া! আমি সেই বাণী খুঁজে বের করব' – জেসিকা মেন্ডেজ বলল – 'এবার আপনি নাস্তা করুন।'

'তুমি নাস্তা করেছ কি?' জানতে চাইল ঈগল।

'আমার নাস্তা কিচেনে তৈরী আছে; আপনি খেয়ে নিন।'

'আমি একা খেতে পারব না। তুমিও শুরু করো প্লিজ।'

মেয়েটা বাধ্য হয়ে ট্রেতে হাত দিল। প্লেট থেকে একটা বার্গার তুলে নিয়ে ঈগলের মুখের কাছে ধরে বলল, 'আগে আপনি নিন; তারপর আমি খাব।' এতে ঈগল অপ্রস্তুত হয়ে গেল। দ্রুত তার হাত থেকে বার্গারটা নিজ হাতে নিয়ে নিল।

ঈগলের এমন আচরণে মেয়েটা মনে খুব কষ্ট পেল। সে কাতর কণ্ঠে বলল, 'ঈগল ভাইয়া! আপনি আমাকে এখনও আপন ভাবতে পারলেন না। আপনি আমাকে শুধু অবজ্ঞার নজরেই দেখলেন। কিন্তু একজন ভাইকে তার বোন খাবার খাইয়ে দেওয়ার মধ্যে খারাপ কী থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না।'

'না রে বোন! তোমাকে এখন আর আমি অবজ্ঞার নজরে দেখি না। কারণ, তোমার অন্তরে যে শালীনতার বীজ বপিত হয়েছে, আশা করি এই বীজ থেকে চারা গজাবে এবং সে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে তোমার জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তুলবে। তবে তোমার হাতে খাওয়ার ব্যাপারে আমার আপত্তির কারণ হল আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের সমাজে যে আচরণ প্রচলিত নেই, আমরা যে আচরণে অভ্যস্ত নই, সে রকম একটা কাজে আমার অস্বস্তি বা আপত্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। যাক, আমাকে খাইয়ে দিয়ে তুমি যদি খুশি হও, তাহলে দাও খাইয়ে দাও।' বলে ঈগল হা করে মুখটা তার দিকে এগিয়ে দিল।

জেসিকা মেন্ডেজ খুব খুশি হল। বাগদাদের ঈগলকে নিজহাতে খাওয়াতে পেরে মনে অনেক আনন্দ ও গর্ব অনুভব করতে লাগল। ঈগলও আর কার্পণ্য করল না। সেও একটা বার্গার, আপেল, জুস খাইয়ে দিল তাকে। তৃপ্তি সহকারে খেল দুজন। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য, বিষয়টি কর্নেল ফেব্রিকেন্ট দেখে ফেলেছে। যার ফল হল, ঈগলকে পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় কোনো খানা দেওয়া হল না এবং জেসিকা মেন্ডেজের বিদায়কালে পূর্ণ এক মাসের বেতন কেটে রাখা হল।

◆◆◆

ঈগল আজ কয়েক মাস যাবত মার্কিনিদের কারাগারে বন্দি। জেসিকা মেন্ডেজের মাধ্যমে তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে ব্যর্থ হওয়ার পরই তার সমস্ত ভিআইপি সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাকে এখন সাধারণ কয়েদীদের চেয়েও নিম্নমানের সেলে রাখা হয়েছে। দিন-রাত কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাকে। নির্যাতনের এমন কোনো ধারা নেই, যা মার্কিনিরা তাঁর উপর প্রয়োগ করেনি। কিন্তু ঈগল মজবুত পাহাড়ের মতো অটল, অবিচল।

এদিকে মার্কিন সেনাবাহিনীর ইরাকে নিযুক্ত অংশের তথ্যকেন্দ্র থেকে ঈগলের ব্যাপারে একটা মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তোলপাড় ফেলে দিল। তারা ঈগলের চরিত্রে কালিমা লেপনের মাধ্যমে মূলত ইরাকি মুজাহিদ তথা মুক্তিযোদ্ধাদের চরিত্রকে হেয় করারই কৌশল এঁটেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এই অপকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

ইরাক থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রথমত সংবাদটা প্রকাশ করা হলো। পরে তা বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদটা ছিল– কারাগারে মার্কিন মহিলা সৈনিকের প্রেমে মজেছে বাগদাদের ঈগল কারাগারে বাগদাদের ঈগলকে একজন ভিআইপি বন্দীর মর্যাদা দিয়েছিল মার্কিন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেখানে দায়িত্ব পালনরত জেসিকা ম্যান্ডেজ নাম্নী এক মেরিন সৈনিকের সাথে ঈগলের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মুচলেকা নিয়ে তাদের দুজনকেই আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য জেসিকা ম্যান্ডেজকর্তৃক ঈগলের মাথায় চুমু খাওয়ার দৃশ্যটা বড় করে ছাপিয়ে দেওয়া হলো। সংবাদের চেয়ে মূলত এ ছবিটাই গুজব ছড়ানোয় সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। যেদিন এটা প্রকাশিত হয়, সেদিন এ সংবাদই ছিল ইরাকের টক অব দ্য কান্ট্রি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একে সত্য বলে মেনে নিতে পারেনি। এই অবিশ্বাসীদের কাতারে 'দৈনিক আরব জাহান' পত্রিকার সম্পাদক জনাব জাফর আহমদ সাহেবও একজন ছিলেন। তিনি এ সংবাদের তথ্যানুসন্ধানে লেগে গেলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান পেলেন, যিনি ছিলেন স্বয়ং মার্কিন বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার।

সেই ব্যক্তির নাম ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন। সম্পাদক জাফর আহমদের সাথে তার বেশ জানাশোনা ছিল। তিনি প্রায়ই পত্রিকা অফিসে আসতেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা খোলামেলা আলোচনা করতেন। একদিন কথাচ্ছলে সম্পাদক সাহেব ঈগলের ব্যাপারটা তার কাছে উপস্থাপন করলেন এবং বিষয়টার

সত্যাসত্য জানতে আগহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে অস্বীকৃতি জানালেন। সম্পাদক সাহেবের বারবার অনুরোধে অবশেষে তিনি আসল ঘটনা তুলে ধরেন তার কাছে। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'ঈগল ইরাকেই আছে। তাকে অত্যন্ত গোপনীয় স্থানে রাখা হয়েছে। মুজাহিদরা যাতে তার মুক্তির ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা না চালায়, সেজন্য এই অপপ্রচার চালান হয়েছে।'

পরের দিনই 'দৈনিক আরব জাহানে' লিড নিউজ ছাপানো হলো 'বাগদাদের ঈগল বাগদাদেই আছে' শিরোনামে। হুলুস্থুল পড়ে গেল পুরো ইরাকজুড়ে। ইরাকবাসী জানতে পারল তাদের ঈগল নির্দোষ, মার্কিনিরা মিথ্যাবাদী। কিন্তু গণতন্ত্রের তথাকথিত দাবিদার মার্কিনিরা কি কখনো গণমানুষকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে? না। দিল না জাফর আহমদ সাহেবকেও। সত্য সংবাদ প্রকাশের অপরাধে গ্রেফতার করা হলো তাকে। চালানো হলো অকথ্য নির্যাতন। অবশেষে তাকেও সেই গোপন কুঠুরিতে আবদ্ধ করা হলো, যেখানে ইতিপূর্বে বাগদাদের ঈগলকে রাখা হয়েছিল।

◆ ◆ ◆

কথায় আছে, মানুষ একা বাস করতে পারে না। এটা শুধু কথার কথা নয়। বাস্তবতাও ঠিক এমনই। মানুষ বাঁচে মানুষের মধ্যে। তবে এর ভেতরেও কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। বেঁচে থাকার জন্য কিছু আপন মানুষ চাই। হৃদয়ের কথা-ভাষা বোঝার মানুষ চাই। সেই মানুষগুলো হল মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন। তাই আপনজন ছাড়া পৃথিবীজুড়ে হাজার-কোটি মানুষ থাকলেও, গায়ে-গায়ে মানুষ ধাক্কা খেলেও পৃথিবীটা মানুষশূন্য মনে হয়। আপনার যদি মা মরে যায়, তাহলে পৃথিবী তো আর 'মাশূন্য' হয়ে যাচ্ছে না; কিন্তু আপনার কাছে মনে হবে তা-ই। সুতরাং কোনো অশুভ শক্তির দাপটে যদি মানুষের বেঁচে থাকার এই অবলম্বনগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিংবা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কারণে যদি তা এলোমেলো হয়ে যায়, তাহলে যেমন মানুষের বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ে; তেমনি উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে চায়, তাহলে তাকে আপনি মন্দ বলতে পারেন না। এটা তার যৌক্তিক অধিকার, ন্যায়সঙ্গত দাবি।

ঠিক একই দাবিতে রুকাইয়া আজ দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে। দখলদার মার্কিন বাহিনী ও তাদের সহযোগী দেশী-বিদেশি সকল সৈনিক ও এজেন্টদের কাছে 'ফ্যালকন-টু' তথা দ্বিতীয় ঈগল গ্রুপের যোদ্ধারা যেন এক সাক্ষাৎ যমদূতে পরিণত হয়েছে। এই বাহিনীর সদস্যরা যেদিন যেস্থানে হানা দেয়, সেদিন সেই স্থানে ছোটখাট একটা কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়। এই বাহিনীর সকল সদস্য তরুণী-যুবতী। দলপতি রুকাইয়া বিনতে আসাদ। এটি সালাফিস্ট ব্রিগেড অব সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মহিলা শাখা।

রুকাইয়া যখন জানতে পারল, তার ভাই মুয়াজ শহীদ হয়েছে, তার স্বামী সালমান মারাত্মক আহতাবস্থায় স্বদেশে চলে গেছে এবং বাগদাদের ঈগল মার্কিনিদের হাতে বন্দি, তখন সে উন্মাদের মতো কান্না শুরু করল। অনেক কাঁদল। কাঁদতে-কাঁদতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়ল। তার এই অবস্থা দেখে সালমা বোকা বনে গেল। মাহমুদা তাকে ভর্ৎসনা দিতে লাগল।

'আমি ভেবেছিলাম, রুকাইয়া হয়ত তার বাবার কাছ থেকে সব জেনেছে' – সালমা অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল – 'তাছাড়া সত্যকে তো আর চিরদিন চেপে রাখা যায় না। আজ না হোক কাল সে অবশ্যই এই সংবাদ জানত। তাই এজন্য আমাকে দোষ দিয়ে কী লাভ?'

'আচ্ছা বাবা! তোমাকে আর এত সাফাই পেশ করতে হবে না' – মাহমুদা ব্যস্ততার সাথে বলল – 'আগে তো মেয়েটার হুঁশ ফেরানোর একটা ব্যবস্থা করে নেই। যাও; জলদি বালতি ভরে পানি নিয়ে এসো। আমি হাত-পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছি।'

সালমা তাড়াতাড়ি এক বালতি পানি নিয়ে এল। মাহমুদা রুকাইয়ার মাথাটা কোলে তুলে নিল। হাতে পানি নিয়ে তার চোখে-মুখে ছিটাতে লাগল। সালমা বলল, 'তুমি ওর মাথাটা একটু উঁচিয়ে ধরো; কিছু পানি দিয়ে দেই।' মাহমুদা তা-ই করল।

এভাবে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা যাবত সেবা-শুশ্রূষার পর রুকাইয়ার জ্ঞান ফিরে এল। সালমা ও মাহমুদার বদনজুড়ে হাসির রেখা ফুটে উঠল। যেন অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে এইমাত্র তারা কূলে এসে পৌঁছেছে। রুকাইয়া আঁখি মেলে ইতিউতি তাকিয়ে আবার চক্ষু মুদল। মুখ নেড়ে ক্ষীণ আওয়াজে বলতে লাগল, 'মুয়াজ! তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে ভাই। আমাকে কেন সাথে নিলে না লক্ষ্মী সোনা। তুমি কি আমার কাছে বসে গল্প শুনবে না? কেন ভাইয়া! তুমি আমার সাথে রাগ করছ বুঝি।'

রুকাইয়ার এই সকরুণ আকুতি শুনে মাহমুদা ও সালমার চোখে পানি এসে গেল। মাহমুদা আলতোভাবে তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। রুকাইয়া চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মাহমুদা! সালমা যা বলল, তা কি সব সত্যি? মুয়াজ কি আর কোন দিন আপু বলে ডাকবে না আমায়? সালমান সাহেব সত্যিই কি তাঁর দেশে চলে গেছেন, না তিনিও মুয়াজের মতো আমাকে ফাঁকি দিয়ে চিরবিদায় নিয়েছেন? ঈগল ভাইয়া কিভাবে গ্রেফতার হলেন? এতগুলো দুঃসংবাদ শোনার জন্যই কি আমি বেঁচে রইলাম? আয় আল্লাহ! আমাকে কেন বাঁচিয়ে রাখলে তুমি? আমি... ।'

রুকাইয়া কথা শেষ করতে পারল না। মাহমুদা তার মুখটা চেপে ধরল। তারপর তাকে লক্ষ্য করে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'রুকাইয়া! এই অলুক্ষণে ও মূর্খতাসুলভ কথাগুলা আমি অন্তত তোমার মুখ থেকে শুনতে রাজী নই। তুমিই

এত দিন আমাদেরকে নীতি কথা শোনাতে যে, ভাঙা-গড়া, চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্না এই মিলিয়েই মানুষের জীবন। সেই তুমি যদি আজ এভাবে ভেঙে পড়, তাহলে আমরা সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজব কোথায়? তুমি কি সেটা ভেবে দেখেছ? তুমি যে শোক পেয়েছ, তাকে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। একটি বিষয় আমি তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। তা হল, তোমার বর্তমান জীবনটা এক বাড়তি সুযোগ, আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বোনাস। তুমি মনে করবে, বাসর রাতের সেই ভয়াবহ হামলায় তুমি মরে গেছ। এখন আর তুমি রুকাইয়া নও – রুকাইয়ার লাশ। তাই যারা তোমাকে জীবন্ত লাশে পরিণত করল, তোমার স্বামীকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল, তোমার আদরের ছোট ভাইটিকে চিরদিনের জন্য তোমার কাছ থেকে আলাদা করে দিল এবং তোমার আরেক ভাই বাগদাদের ঈগলকে জিন্দানখানায় বন্দি করে রাখল, সেই হায়েনাদের বিরুদ্ধে তোমাকে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। ঈগলকে মুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আজ থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে তোমাকে।'

মাহমুদার কথা শুনে রুকাইয়া ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ ফুটে কিছুই আর বলছে না। কিন্তু তার নয়নজুড়ে পাহাড়ি ঝরনার মতো অবারিত ধারায় অশ্রুমালা প্রবাহিত হতে লাগল। মাহমুদা এবার ধমকের স্বরে বলল, 'রুকাইয়া! তোমার চোখে দেখছি এখনও অশ্রু ঝরছে। তোমার কি জানা নেই, বিপদে-সংকটে আক্রান্ত হলে কেবল নির্বোধ ও অকর্মা লোকেরাই হতাশায় ভেঙে পড়ে, কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। চোখের জলে তারা নিজেদের কাপুরুষতা-অযোগ্যতা ঢাকা দিতে চায়। কিন্তু সচেতন ও বুদ্ধিমান লোকেরা ঠিক এর বিপরীত। তারা সংকটে পড়লে উত্তরণের পথ খোঁজেন। বিপদে পড়লে মোকাবেলার প্রচেষ্টা চালান। আঘাত পেলে প্রতিঘাত দেওয়ার কৌশল আঁটেন। তারা কান্নাকাটি করেন না। কারণ, আঘাতের ফলে হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়, নয়নের বারি বর্ষণে সেই রক্ত ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়, উত্তপ্ত দিল শীতল হয়ে যায়; সেখানে তখন প্রতিশোধ নেওয়ার বা প্রতিরোধ করার পর্যাপ্ত হিম্মত অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং তোমাকে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিতে হবে। অশ্রুকে সংবরণ করে রাখতে হবে। তোমার নিকট থেকে আমি এর ব্যতিক্রম কখনই আশা করি না।'

মাহমুদা একটু থেমে রুকাইয়ার অবস্থাটা আন্দাজ করে নিল। তারপর তাকে আরো সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে বলল, 'রুকাইয়া! তুমি কি মহিলা কবি হযরত খানসা (রা.)-এর সেই ঐতিহাসিক বীরত্বপূর্ণ ধৈর্যের কাহিনী ভুলে গেছ, যে কাহিনী তুমি নিজে বহুবার আমাকে শুনিয়েছিলে? তখন তো তুমি এও বলতে, যদি তোমার চারটা পুত্রসন্তান হয়, তাহলে তুমিও তাঁর মতো পুত্রদেরকে আল্লাহর রাহে জিহাদে পাঠাবে, যেভাবে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুত্রদেরকে

কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের শাহাদাতের সংবাদে তিনি অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হয়েছিলেন... ।'

সহসা রুকাইয়া শোওয়া থেকে উঠে বসল। তারপর খাট থেকে নেমে কক্ষময় পায়চারি করতে লাগল। মাহমুদা চুপ হয়ে গেল। রুকাইয়া তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মাহমুদা! তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তুমি আমাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে পারলে। হতাশায় আমার অন্তর মরে গিয়েছিল। তোমার প্রচেষ্টায় সেখানে সঞ্জীবনী বারী বর্ষিত হয়ে পুনরায় সতেজ হয়ে উঠেছে। অবশ্যই আমি প্রতিশোধ নেব। আমার ভাই হত্যার প্রতিশোধ। ঈগল ভাইয়াকে মুক্ত করাই হবে আমার প্রথম লক্ষ্য।'

'শাবাশ বোন রুকাইয়া!'– সালমা বলল – 'আমরা তোমার কাছে এমন সাহসী উচ্চারণই প্রতাশা করেছিলাম। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে আগ্রাসী বাহিনীর উপর আক্রমণ করে ওদের ডজন-ডজন সৈন্য হত্যা করে আমাদের ভাই-বোন, জন হত্যার প্রতিশোধ নেব। কিন্তু বোন! শুরু থেকে আমরা একটা সমস্যায় ভুগছি, যার সমাধান আজও হল না।'

'কী সমস্যা সালমা?' রুকাইয়া জানতে চাইল।

'সমস্যাটা তেমন জটিল নয়; আবার জটিলও বটে' – সালমা বলল – 'মার্কিন বাহিনীকর্তৃক তোমার বাসর রাতে হামলার সংবাদ যখন আমাদের কাছে পৌঁছল, তখন আমরা সকল বান্ধবী মিলে তোমাদের বাড়িতে ছুটে যাই এবং মুজাহিদদের সাথে উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করি। তোমার ভাই মুয়াজসহ আরও বেশ কয়েকটি শিশুর মৃত্যু, তোমার স্বামীর মারাত্মক আহত হওয়া এবং তোমার নিখোঁজ হওয়া অবলোকন করে ওখান থেকেই আমরা প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে পড়ি। দখলদার বাহিনী, তাদের সহযোগী ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনায় উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকি। এ পর্যন্ত আমরা প্রায় ২০-২৫টি স্থানে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছি। আমাদের হাতে কম করে হলেও ৮০-৯০ জন মার্কিন সৈন্য নিহত এবং অসংখ্য আহত হয়েছে। আর আমাদের হস্তগত হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও রসদ। কিন্তু আমরা যে সমস্যাটায় ভুগছি, তা হল অভিজ্ঞ নেতৃত্বের সংকট। যেজন্য এ পর্যন্ত আমাদের ৭জন বোন শহীদ হয়েছেন। কখনো আমি, কখনো মাহমুদা আবার কখনো বোন ফরিদা কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে আমরা কেউ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিনি। একজন দক্ষ কমান্ডার চেয়ে কয়েকবার তোমার আব্বুর কাছে গিয়েছিলাম। প্রতিবারই তিনি আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের বাহিনীর সদস্যা প্রায় দুশর কাছাকাছি। আমাদের একজন যোগ্য নেত্রী অর্থাৎ কমান্ডারের প্রয়োজন জরুরি ভিত্তিতে। আমি অবশ্য মনে করি, তুমি যদি এই দায়িত্বটা মাথা পেতে বরণ করে নাও, তাহলে আমরা দখলদার বাহিনীর আরো বেশি ক্ষতিসাধন করতে পারব।'

'তোমরা সবাই মিলে যে দায়িত্ব পালনে হিমশিম খাচ্ছ, আমি কি একা তা পালন করতে পারব বলে তুমি মনে কর?' প্রশ্ন করল রুকাইয়া।

'হ্যাঁ; তুমিই পারবে এ দায়িত্ব পালন করতে।'

'তুমি তা বুঝলে কী করে সালমা?' রুকাইয়া সালমাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন রাখল।

রুকাইয়ার এ প্রশ্নে সালমা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এর কোনো সঠিক উত্তর সে খুঁজে পেল না। অবশ্য অতটা গভীর জ্ঞানও তার নেই। সে এতক্ষণ যা বলেছে, তার বেশির ভাগই মাহমুদার শেখানো কথা। কথাটা মাহমুদাই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু রুকাইয়াকে অন্যমনস্ক দেখে বলতে পারেনি। তাই সালমার মাধ্যমে বলিয়েছে। মূলত এই প্রস্তাবটা দিতে গিয়েই সালমা রুকাইয়াকে সব ঘটনা খুলে বলেছিল। আর তা বলার পর যখন তার অবস্থা বেগতিক হয়ে পড়ল, সে তখন ভড়কে গেল। মাহমুদার উৎসাহবাণীতে যখন তার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল এবং সে নিজে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দিল, তখন আবার সালমা মুখ খুলল। কিন্তু রুকাইয়া যখন তাকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল 'আমিই যে কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারব তুমি তা বুঝলে কী করে', তখন সে লা-জওয়াব হয়ে গেল। তাকে এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি দিল মাহমুদা।

'রুকাইয়া! তোমার এ প্রশ্নের উত্তর সালমা দিতে পারবে না' – মাহমুদা মুচকি হেসে বলল – 'আমি তোমাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, 'তুমি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে এজন্য যে, তোমার আব্বাজান একজন কমান্ডার; সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার। স্বভাবতই তিনি একজন দক্ষ ও কৌশলী যোদ্ধা। আর তাঁর কন্যা হওয়ার সুবাদে রণকৌশলের গুণটি তোমার ভিতরে প্রবেশ ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই। আমরা ইতিপূর্বে যার প্রমাণও পেয়েছি তোমার থেকে। সুতরাং এ ব্যাপারে তুমি আর কোনো আপত্তি করবে না বলেই আমি বিশ্বাস করি।'

'যুদ্ধে আমি কতটা পারঙ্গম সেটা বড় কথা নয়' – রুকাইয়া বলল – 'আসল কথা হল, সকলের পরামর্শে যদি কাউকে বড় কোনো দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়, তাহলে সে উক্ত দায়িত্ব পালনে যোগ্য হোক আর না হোক, তার উচিত হবে তখন জীবনপণ করে হলেও অর্পিত দায়িত্ব পালনে যথাযথ আত্মনিয়োগ করা। তাই তোমরা পরামর্শ করে যদি আমাকে কমান্ডিংয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত কর এবং আমি এ দায়িত্ব পালন করতে পারব বলে মনে কর, তাহলে হাসি মুখে আমি তা মাথা পেতে নিচ্ছি। সেই সাথে আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সালাফিস্ট ব্রিগেড অব সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর প্রধানের কাছ থেকে অর্থাৎ আমার আব্বাজানের নিকট থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতা আমি আদায় করে ছাড়ব। আমাদের পরিচয় হবে 'ফ্যালকন-২' নামে। আমাদের দলটি হবে মূলত সালাফিস্ট ব্রিগেড অব সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর নারী ইউনিট।'

'রুকাইয়া! আমি তোমাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ জানাচ্ছি' – মাহমুদা ও সালমা একসঙ্গে বলে উঠল – 'তুমি একেবারে আমাদের মনের কথাটি বলে ফেলেছ। তোমাকে কমান্ডার নিযুক্ত করার পেছনে আমাদের বাড়তি যে চাহিদাটি ছিল, তাই বের হয়েছে তোমার মুখ থেকে। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন। তোমার শোক-তাপ কাটিয়ে ওঠার তাওফীক দান করুন। অর্পিত দায়িত্ব পালনে তোমায় পরিপূর্ণ যোগ্যতা, দক্ষতা ও নৈপুণ্য দান করুন।

'আল্লাহুম্মা আমীন।' রুকাইয়া বলল।

◆◆◆

মহান আল্লাহ ধরাধামে মানবজাতি সৃষ্টি করে বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। এটা করা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে। কেননা, এই বিস্তৃত বিশ্বভুবনের বিচিত্র প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার তারতম্যের দরুন এই বিভক্তি অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও দুনিয়ার সকল অঞ্চলের মানুষ যাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ জীবন-যাপন করতে পারে, সেজন্য স্রষ্টা নিজেই গাইড লাইন প্রণয়ন করে হাজার-হাজার, লাখ-লাখ প্রতিনিধির (নবী-রাসূল) মাধ্যমে সকল গোত্র-জাতির নিকট তা পৌঁছিয়েছেন। এগুলোর সংখ্যা একটি-দুটি নয়, বরং এর সংখ্যা একশ চারখানা। স্রষ্টাপ্রদত্ত এই গাইড লাইনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ গাইডলাইনটি হল পবিত্র আল-কুরআন। এটি ইতিপূর্বেকার একশ তিনখানা কিতাবের সারনির্যাস। এর মধ্যে মানবজীবনের সকল দিকের, সকল বিষয়ের পথনির্দেশ সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি নির্দিষ্ট কোনো জাতি অথবা নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের জন্য নির্ধারিত করে প্রেরিত হয়নি। বরং এটি সব দেশের, সব কালের, সমগ্র জাতি-গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত। সারা বিশ্বের মানুষের ঐক্যের বাণী এই কিতাবে ঘোষিত হয়েছে এভাবে– 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (আল-কুরআন ৪ ১ আয়াতাংশ)

পবিত্র কুরআনের এই চিরন্তন ঘোষণাটি আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন সকল মানুষের নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে। তিনি সমগ্র জগদ্বাসীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে লোকসকল! স্মরণ রেখো, তোমাদের পালনকর্তা (স্রষ্টা) এক। তোমাদের (আদি) পিতা এক। হুশিয়ার! কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের প্রাধান্য নেই। তেমনি কোনো আরবের উপরও কোনো অনারবের প্রাধান্য নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের প্রাধান্য নেই, আবার কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের প্রাধান্য নেই।'

মুসলমানরা সর্বদা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই গোটা মানবজাতিকে মূল্যায়ন করে এসেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে যখন যে দেশে, যে ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে, সেসব ভূখণ্ড বা দেশের ভিন্ন মতাবলম্বীগণ পুরোপুরি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তারা ইসলামের এই মৌলিক গুণের প্রতি মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ইসলামের অমীয় সুধা পান করে ধন্য হয়েছেন। ইসলাম কখনো কাউকে অস্ত্রের মুখে কালিমা পড়তে বাধ্য করে না। বরং কেউ যদি অস্ত্রের ভয়ে, বিপদে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছে; তাহলে তার সে কালিমা ইসলাম গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে না। যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পূর্বে পূর্ণ অবকাশ দেওয়া হয়েছে। ভালোভাবে জেনে. শুনে ও বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ ইসলাম গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, ধরার বুকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করতে। এখানে কারো উপর জোর-জবরদস্তি করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। কল্যাণ ও অকল্যাণের দুটা পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। এখন যার খুশি কল্যাণের পথ অবলম্বন করুক আর যার খুশি অকল্যাণের পথ বেছে নিক; ইসলাম সকলের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

কিন্তু মানবজাতির মধ্যে এমন কিছু জানোয়ার প্রকৃতির মানুষ রয়েছে, যারা সভ্যতা, ভদ্রতা, শালীনতা, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, শান্তি-শৃঙ্খলা এই জাতীয় গুণাবলীর সাথে চিরকালই যেন অপরিচিত। এরা নিজেরা তো সর্বদা অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হচ্ছেই, সেই সাথে গোটা পৃথিবীতে অশান্তির এই অবিনাশী আগুন ছড়িয়ে দিতে গলধঘর্ম হয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যার ফলে মানব নামের এই দানবদের হাতে মানবতা দলিত হচ্ছে যুগ-যুগ ধরে।

প্রকৃতপক্ষে এই মানুষগুলোই বিশ্ব শান্তির জন্য প্রধান বাধা। সমগ্র মানবজাতির শত্রু এই দুষ্ট মানুষগুলো। এদের উপযুক্ত উপাধি হল ডাকাত, লম্পট, সন্ত্রাসী, হাইজ্যাকার। এরা বিশ্বের হাজার-হাজার নারীদের ইজ্জত হরণকারী, লাখ-লাখ মানুষের হত্যাকারী, কোটি-কোটি মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনকারী। এরা বিশ্ববাসীর জন্য বিষফোঁড়া। কোনো সুতরাং এদের হাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-লুণ্ঠিত এবং হতাহত মানুষদের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোনরা যদি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঐ বদমাশগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে কোনো দুঃখে। তাকে অস্ত্রধারী, বন্দুকদারী কিংবা সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী বলার যুক্তিটা কি? মানব জাতির ঐ বিষফোঁড়াগুলোকে কেটে অশান্তির পুঁজ বের না করলে গোটা মানবজাতির অস্তিত্বই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন না। এই দানবগোষ্ঠী বা ওদের নিজেদের দাবি অনুযায়ী বানরের গোষ্ঠী বিশ্বটাকে ধ্বংস করার জন্য কি পরিমাণ মারণাস্ত্র তৈরি

করেছে। ওদের অযাচিত মাতুব্বরী আর নির্লজ্জ আগ্রাসনের যাঁতাকলে পড়ে পৃথিবটা কি আজ ক্রমান্বয়ে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেনি? ১৯৪৭ সালের দিকে ওদের ষড়যন্ত্রের মুসলিম খেলাফতের ছায়া থেকে বিশ্ব বঞ্চিত হওয়ার পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত একটি দিনও বিশ্ব যুদ্ধ ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে কি? হয়নি। কেন হয়নি? এই 'কেন'র উত্তর অনেক। তবে মূল কথাটা হলো, স্রষ্টার গাইড লাইনকে দূরে ঠেলে দিয়ে জালিমের গোষ্ঠী ওদের মনগড়াভাবে বিশ্বটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানে লুটেপুটে খাচ্ছে। আর তাই তো বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত মোড়লদের আজ মানবকল্যাণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ব্যয় হয় বিধ্বংসী সব অস্ত্র তৈরিতে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বে যে পরিমাণ অস্ত্র মজুদ আছে, তা দিয়ে বিশ্বকে ১৫বার ধ্বংস করা যায়। বর্তমানে প্রতি মিনিটে বিশ্বে যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য ২৫ লাখ ডলার ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের এক-দশমাংশ হ্রাস করলে এর দ্বারা পঁচিশ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হত। কেননা, বিশ্বে প্রায় নব্বই কোটি মানুষ ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভুগছে। পঁচানব্বই কোটি মানুষ নিরক্ষর।

সভ্যতাবিবর্জিত এই নব্য ফেরাউন, নমরূদ আর হিটলার, চেঙ্গিসখানের গোষ্ঠীরা মানুষের 'ক্ষুধা' নিয়ে রাজনীতি করছে। মুসলমানদের তেল নিয়ে জুয়া খেলছে। সম্পদের লোভে একের পর এক মুসলিম দেশগুলো দখল করছে। মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে অবরোধ আরোপ করে মানুষগুলোকে ক্ষুধায় কষ্ট দিচ্ছে, হত্যা করছে। এ সকল কর্মকাণ্ডে তালিকার শীর্ষে যে নামটা, তা হল আমেরিকা।

সুতরাং আমেরিকার অবরোধ, আগ্রাসন, দখলদারিত্বের কারণে সারা বিশ্ব আজ অতিষ্ঠ, ত্যক্ত ও বিরক্ত। বিশেষ করে মুসলিমবিশ্ব। ওদের হাতে সাম্প্রতিক দখল হওয়া আফগান ও ইরাকের মানুষ ওদের প্রতি সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ। ইরাক যেন আজ এক ভয়াল আগ্নেয়গিরির রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেখান থেকে প্রতিনিয়ত ভয়ংকর লাভা উদগীরিত হচ্ছে। এই লাভা নেভাতে আমেরিকা হিমশিম খাচ্ছে। হয়রান-পেরেশান হয়ে গেছে। তার অত্যাধুনিক সকল কলাকৌশল ব্যর্থতার পর্যবসিত হতে চলেছে। মানব সৈন্যের পরিবর্তে লৌহনির্মিত কম্পিউটারাইজড রোবট ব্যবহার করেও এই ভয়াবহ অগ্নুৎপাত বন্ধ করতে পারছে না। স্বঘোষিত এই বিশ্বমোড়ল আজ বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেছে। মজলুমের হাতে জালিমের পরাজয়ের পুরনো সৌধ আবার নতুনভাবে নির্মিত হতে যাচ্ছে ইরাকে।

কিছুসংখ্যক গাদ্দার-মোনাফেক ছাড়া সকল ইরাকি আজ হাতে প্রতিরোধের অস্ত্র তুলে নিয়েছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেউ পিছিয়ে নেই প্রতিরোধের এই লড়াই থেকে। একথা বিশ্ববাসী সবাই জানে। কিন্তু ইদানিং ছেলেহারা মা, ভাইহারা বোন, স্বামীহারা স্ত্রী, ইজ্জতহারা কন্যাগণ একত্র হয়ে সারা ইরাক জুড়ে

গড়ে তুলেছেন প্রতিরোধের এক মজবুত পাহাড়। যে পাহাড়ের সঙ্গে টক্কর খেয়ে চূর্ণ হতে চলেছে সুপার পাওয়ার দাবিদার আমেরিকার দম্ভ ও অহংকার।

ইরাকি এই কন্যা-জায়া-জননীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ভাইহারা রুকাইয়া বিনতে আসাদ। সে সালাফিস্ট ব্রিগেড অব সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর মহিলা শাখার কমান্ডার নিযুক্ত হবার পর এই সংগঠনের কর্মীদের কাজের গতিতে নবজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তার নেতৃত্বে বীর বাহাদুর কর্মীদের দেহে যেন নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। তারা যেমন শত্রুর মোকাবেলায় উজ্জীবিতপ্রাণ, তেমনি ইরাকি নারীদের কাছে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার আহ্বান পৌঁছানোর কাজেও নিবেদিতপ্রাণ।

রুকাইয়া এই বিশাল উদ্যমী-কর্মঠ কর্মী বাহিনী নিয়ে কাজ করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার এ লড়াইয়ের সৈনিক হতে পেরে সে নিজেকেও ধন্য মনে করছে। তবে এই গুরুদায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে তাকে যে অথৈ পাথার পাড়ি দিতে হবে সেই চিন্তা মাঝে-মধ্যে তাকে ভাবায়। অবশ্য এর থেকে উত্তরণের পথগুলোও সে ভেবে রেখেছে। তার মধ্যে একটি হল ঈগলের মুক্তি। কেননা, সে মুক্ত থাকলে সংকট মুহূর্তে বোনের সাহায্যার্থে ছুটে আসবে। সুতরাং তার এবারের মিশন হল বাগদাদের ঈগলকে মুক্ত করার মিশন।

চার.

বাগদাদ মহানগরের কেন্দ্রস্থল। লোকারণ্য ব্যস্ততম এলাকার অন্যতম একটি। তবে বছরদুয়েক পূর্বে এখানটায় যেমন ব্যস্ততা ও প্রাণচাঞ্চল্য ছিল, এখন আর তেমনটা প্রত্যক্ষ করা যায় না। যুদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে তছনছ করে দিয়েছে। বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে জনগণের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডকে। যার প্রভাব পড়েছে মহানগরীর এই প্রাণকেন্দ্রেও। মানুষ এখন একান্ত বাধ্য না হলে ঘর থেকে বের হয় না। সবার মনে সারাক্ষণ এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করে। কখন কী হয় এই দুর্ভাবনায় সবাই পেরেশান থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও জীবন তো আর থেমে থাকে না। হাজারো শংকা, বিপদ-আপদের বস্তা বোঝাই করেই জীবনের গাড়ি ছুটে চলে সম্মুখপানে। টেনে নেয় সকল দুঃখ-দুর্দশা আর বঞ্চনার ঘানি।

বাগদাদের জনগণও জীবনের সেই একান্ত তাগিদে ঘর থেকে বের হয়। সেজন্য রাস্তাঘাটে, দোকানপাটে জনসমাগম একেবারেও কম নয়। আর শহরের কেন্দ্রস্থলে এখনো মোটামুটি ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়, যদিও তা আগের অবস্থার ধারে-কাছেও নয়। নগরীর এই কেন্দ্রস্থলেই গ্রীন জোন। এর ভিতরেই দখলদার মার্কিনিদের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। তাই অন্যান্য স্থানের চেয়ে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী।

গ্রীন জোনের পূর্ব পাশে অত্যাধুনিক ডিজাইনের আট তলাবিশিষ্ট বিশাল একটা বিল্ডিং। বিদেশি একটি সাহায্য সংস্থার অফিস এখানে। কানাডা অথবা সুইজারল্যান্ডভিত্তিক এই সংস্থাটির নাম 'সেভ দ্য হিউম্যান অব ইরাক।' ইরাকে এটি তাদের প্রধান অফিস। সেজন্য এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা অনেক। দেশী-বিদেশি মিলিয়ে কর্মচারীর সংখ্যা দু-শয়ের কম হবে না। বিল্ডিংয়ের প্রথম থেকে তৃতীয় তলা পর্যন্ত সংস্থার অফিস। তিনটি তলাতেই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিরাপত্তা কর্মীরা স্বশস্ত্র পাহারারত। তার উপর প্রধান গেটে সার্বক্ষণিক পাঁচজন রক্ষী শিফ্‌ট বদল করে পাহারা দেয়।

কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত এই সংস্থা অফিসে একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ শোরগোল পড়ে গেল। হায়-হায় রব উঠল সবার মুখে, কাজকর্ম স্থবির হয়ে গেল তাৎক্ষণিকভাবে। কী হতে কী হয়ে গেল কেউই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারল না। মারিয়া ও জুলিয়াকে হারিয়ে সবার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

'ওরা বড় দক্ষ ও কাজের মেয়ে ছিল স্যার।' নির্বাহী কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে এক জুনিয়র কর্মকর্তা বলল।

'আমার সামনে আর একটা কথাও বলবে না' – নির্বাহী কর্মকর্তা রাগের সাথে বলল – 'তোমরা কি সব মরে গিয়েছিলে? এতগুলো লোকের মধ্য থেকে মাত্র পাঁচজন বন্দুকধারী দুটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল; অথচ তোমরা চেয়ারে বসে-বসে তামাশা দেখছ! আর এখন এসেছ দরদ দেখাতে! আহা মেয়েদুটো বড় দক্ষ ছিল।'

'মাফ করবেন স্যার' – জুনিয়র কর্মকর্তা বলল– 'আমরা না হয় অপরহরণকারীদের অস্ত্রের ভয়ে মরে গিয়েছিলাম; কিন্তু আপনি তো জীবিত ছিলেন। আপনি কেন ওদের রক্ষা করতে পারলেন না? আপনার পাশের কক্ষ থেকেই তো ওদের তুলে নেওয়া হয়েছে।'

ভড়কে গেলেন নির্বাহী কর্মকর্তা। জুনিয়র কর্মকর্তার প্রশ্নে তিনি লা-জওয়াব হয়ে গেলেন। তিনি প্রতিউত্তর করার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পেলেন না। আর পাবেনইবা কোথায়? কারণ, ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটেছে যে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অপারেশন শেষ। মেয়েদুটো অপহৃত হল মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে। সুতরাং এখানে কারোরই কিছু করার বা বলার নেই। একথা তিনিও বোঝেন। তাই তো জুনিয়র অফিসারের পাল্টা প্রশ্নের উত্তরে নমনীয় কণ্ঠে বললেন, 'যাক গে, যা হবার হয়েছে, এখন বিতর্কের সময় নয়। মেয়েদুটোকে এখন উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় সন্ত্রাসীরা ওদের মেরে ফেলবে। তখন বৃটিশ সরকারের কাছে আমি কী জবাব দেব। আমাকে পরমার্শ দাও; এখন আমি কী করব?'

'সন্ত্রাসীরা ওদের মারবে না স্যার' – অন্য এক কর্মকর্তা বলল – 'ওদের খুন করার ইচ্ছা থাকলে ওরা আমাদের সবাইকে না পারলেও অধিকাংশকে এখানেই

ব্রাশফায়ারের মাধ্যমে খুন করতে পারত। কিন্তু ওরা তা করেনি। ওরা কৌশলে দুজনকে অপহরণ করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, ওরা মেয়েদের বন্দী করে মুক্তিপণের দাবি করবে। ওদের পক্ষ থেকে দাবিনামা পেশ না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

'তা না হয় অপেক্ষা করলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মারিয়া ও জুলিয়া ব্রিটিশ নাগরিক' – নির্বাহী কর্মকর্তা বলল – 'সংবাদমাধ্যমের সুবাদে আগামী কালই হয়ত ওদের পরিবার এই অপহরণ ঘটনা জেনে যাবে। তখন তারা অবশ্যই সরকারের মাধ্যমে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করাবে। জানই তো বৃটিশ সরকার তার নাগরিকদের ব্যাপারে কত সেনসেটিভ। তাদেরকে আমি কী উত্তর দেব, এ মুহূর্তে সেটাই আমার বড় ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একটা সমাধান আমাকে দাও।'

'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না স্যার' – এক বৃটিশ কর্মকর্তা বলল – 'আমাদের সরকার ইরাক যুদ্ধের অংশীদার। আমাদের সৈনিকদের হাতে বহু নিরীহ ইরাকি মারা গেছে। সুতরাং সেই ইরাকিদের হাতে যদি আমাদের দু-চারজন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়, এটা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মেনে নিতে হবে। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কারণ দর্শানোর কোনো নোটিশ এলে তার উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব আপনি আমার উপর ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে আমি এ মুহূর্তে যে বিষয়টার জবাবদিহিতা করতে বলব, তা হল, আপনার নিরাপত্তা প্রহরীদের রেখেছেন কী জন্য? তারা কী করছিল ঘটনার সময়? মাত্র পাঁচজন সন্ত্রাসী দিনে-দুপুরে পুরো অফিসটি জিম্মি করে ফেলল; অথচ আপনার এত বিশাল রক্ষীবাহিনীর কোনো প্রতিরোধই দেখা গেল না। দুটা মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হল; কিন্তু রক্ষীবাহিনীর একটাও গুলির আওয়াজ শোনা গেল না। এমনকি ঘটনার পর এখনো তাদের কাউকে এখানে দেখছি না। কোথায় কী করছে তারা; আমাকে উত্তর দিন।'

সিনিয়র এই বৃটিশ কর্মকর্তার প্রশ্নে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি ইতিউতি তাকিয়ে দেখলেন, 'আসলেই কোনো প্রহরীর দেখা মিলছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ পিওনদের ডেকে প্রহরীদের খোঁজ নিতে বললেন। নিজেও চলে গেলেন প্রধান গেটের কাছে। কিন্তু-না, প্রহরীদের দেখা না পেলেন তিনি, না পেল পিওনরা। অফিসের ভেতর-বাহির কোথাও প্রহরীদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। এ ঘটনায় অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী হতবিহ্বল হয়ে গেল। সকলের মনে মৃত্যুভয় ঢুকে গেল। অজানা বিপদাশঙ্কায় তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজে গিয়ে অফিসের গেটে তালা লাগিয়ে দিলেন। সকলে ভেতরে বসে যিশুর নাম জপতে শুরু করল। মহিলা কর্মচারীরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

♦ ♦ ♦

'রুকাইয়া! আমার প্রস্তাবটি হয়ত এখন তোমার মনঃপুত হবে না। কিন্তু তোমাকে আমি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে বলব' – মাহমুদা বলল – 'কেননা, শক্তি প্রয়োগ করে জেলখানা থেকে ঈগল ভাইয়াকে উদ্ধার করা অতটা সহজ নয়। এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। আর সেই কৌশলের কথাই আমি ভাবছি। এখন কী করবে সে তোমার এখতিয়ার। তুমি যা বলবে ও সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা অম্লান বদনে তা পালন করব।

ঈগলকে মার্কিনিদের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করার কৌশল নির্ধারণি বৈঠকে পরামর্শ দিতে গিয়ে মাহমুদা প্রস্তাব পেশ করেছিল, কয়েকজন মার্কিন সৈনিককে অপহরণ করে তাদেরকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে তাদের সৈনিকদের মুক্তির বিনিময়ে ঈগলকে তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু বৈঠকে অধিকাংশ সদস্য তার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি হল, এতে কোনো ফলোদয় হবে না। কারণ, আমেরিকা তাদের সৈনিকদের জীবন অত মূল্যবান মনে করে না। একজন বিরোধী নেতা তাদের একশ সৈন্যের চেয়েও বেশি মূল্যবান। কেননা, সে মুক্তি পেলে আবার তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। তাদের বহু সৈন্যের জীবনাবসান ঘটাবে। তার চেয়ে তাকে হত্যা করাই তারা শ্রেয় মনে করবে। এতে যদি জিম্মি সৈনিকদের মৃত্যু ঘটে, তাতে তারাই বরং বেশি লাভবান হবে।

বিরোধীদের এই যুক্তিও ফেলনা নয়। তবুও মাহমুদা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ। তাই কমান্ডার রুকাইয়াকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানাল। আবার এ আহ্বান জানানো সত্ত্বেও কমান্ডারের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কথাও সাথে-সাথে ব্যক্ত করল। সত্যিকারের মুমিনের, মুজাহিদের, সৈনিকের গুণ এটাই যে, সে তার মনের গোলামী করে না, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। তার পরামর্শ বা মতামত আমির-নেতা গ্রহণ করুন বা না করুন অথবা নেতার কোনো কর্মকাণ্ড তার মনঃপুত হোক বা না হোক; যদি সেটা বাস্তবমুখী হয়, তবে সে তা মেনে নেয়। কিন্তু সে যদি এর উল্টো করে, তাহলে উক্ত বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে। এমন সৈনিক নিয়ে কোনো বাহিনী কখনো বিজয় লাভ করতে পারে না।

যাহোক, সকলের মতামত শোনার পর রুকাইয়া তাদের উদ্দেশে বলল– 'আমার প্রিয় মুজাহিদ বোনেরা! সুন্দর-সুন্দর পরামর্শের জন্য আপনাদেরকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। প্রিয় বোনেরা! বাগদাদের ঈগল আমার আত্মীয়, আমার ভাই, সেজন্য তাকে আমি মুক্ত করতে চাই এমনটি ভাববার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, ঈগল একটি আন্দোলনের নাম। ঈগল একটি সংগ্রামের নাম। ঈগল আমাদের দেশমুক্তির প্রেরণা। সুতরাং ঈগলকে মুক্ত করা মানে একটি আন্দোলনকে মুক্ত করা। ঈগলের মুক্তি মানে ইরাকিদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর এ কারণেই ঈগলকে মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

আমি আপনাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আপনারা এ ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। সেই সাথে খুব সুন্দর সুন্দর ও সময়োপযোগী পরামর্শ প্রদান করেছেন। আপনাদের কথার প্রতি সম্মান পদর্শন করে আমি নিজে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। প্রথমে আমি সেটা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করব এবং পরে মতামত চাইব।

আমার পরিকল্পনাটি হল এই– কয়েদখানায় সরাসরি হামলা চালান যাবে না। আবার মার্কিন সৈন্যও অপহরণ করা যাবে না। কারণ, এ দুটো পদক্ষেপেই ব্যর্থতার ঝুঁকি রয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা মানে ঈগলের জীবনকে মৃত্যুমুখে ফেলে দেওয়া। সুতরাং সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে এমনভাবে কার্যোদ্ধার করতে হবে, যাতে সাপও মরবে, আবার লাঠিও ভাঙবে না। তাই অপহরণ করতে হবে বিদেশি সাহায্যকর্মী। আর অবশ্যই তা মহিলা কর্মী। অপহরণের পরই তাদের পরিচিতিসহ ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দিতে হবে যেন অপহৃতদের পরিবার তাদের সহজে শনাক্ত করতে পারে। এর ফলে উক্ত কর্মীদের পরিবার তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে সরকারের শরণাপন্ন হবে। তখন সে দেশের সরকার মার্কিন সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। আর একজন কয়েদীর জন্য আমেরিকা এ মুহূর্তে তার কোনো বন্ধু রাষ্ট্রের বিরাগ বরণ করবে না। স্বভাবতই সে তখন ঈগলকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। আমার এই পরিকল্পনার সাথে যারা একমত আছেন, তারা হাত উঁচিয়ে দেখান। আর যারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের থেকে আমি পরামর্শ নেব।'

রুকাইয়ার পরিকল্পনা শুনে সকলে একযোগে হাত তুলল। ভিন্নমত পোষণ করার কেউ আর রইল না।

এবার শুরু হল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পালা। এ অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য দুর্দান্ত সাহসী ও চৌকস চার তরুণীকে বাছাই করা হল। এরা হলো মাহমুদা, সাফিয়া, মাইমুনা ও তাহেরা। এদের দক্ষতা ও বীরত্বের উপর রুকাইয়ার আস্থা আছে। কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব নিল সে নিজে। সালমাকে নিল ড্রাইভার হিসেবে।

রুকাইয়া তার অপারেশন টিম নিয়ে বের হওয়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে একটি তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহকারী দল পাঠাল ইরাকে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী সংস্থা 'সেভ দ্য হিউম্যান অব ইরাক'-এর সদর দফতরে। মাহমুদাকে এই দলের প্রধান করে পাঠানো হল। প্রায় দুঘণ্টা পর মাহমুদা তার তদন্ত টিম নিয়ে ফিরে এল। এসেই রুকাইয়াকে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করল। রিপোর্ট শুনে সে খুবই খুশি হল। মাহমুদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মাহমুদা! তুমি শত্রুদের পেটের ভিতরে ঢুকে তথ্য নিয়ে এসেছ দেখছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে কী করলে?' মুখে তার সন্তুষ্টির হাসি।

'আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কেউ যদি কোনো কাজ করে তাহলে অবশ্যই তিনি তাকে সাহায্য করেন' – মাহমুদাও হাসিমুখে বলল – 'তবে ভরসা হতে

হবে নিখাঁদ, পরিপূর্ণ। আমার আল্লাহর নাম নিয়ে অফিসে প্রবেশ করি এবং নিজেদের অসহায় হিসেবে পরিচয় দেই। আর্থিক সাহায্যের আবেদন করি। আমাদেরকে প্রথমে তৃতীয় তলায় গিয়ে নাম-ঠিকানা তালিকাভুক্ত করতে বলা হয়। তারপর আমাদেরকে দ্বিতীয় তলায় পাঠানো হয়। সেখানে একটি ফরমে দস্তখত দিতে বলা হয়। ফরমের লেখাগুলো পড়ে আমি শিউরে উঠি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে দস্তখত দেই এবং মনে-মনে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই... ।'

'কেন, কী লেখা ছিল সেই ফরমে?' রুকাইয়ার বিস্ময় ও প্রশ্ন।

'ওখানে যা লেখা ছিল, তা স্বীকার করা দূরের কথা, আমার তো মনে হয় ওগুলো মুখে উচ্চারণ করলেও ঈমান থাকবে না' – মাহমুদা বলল – 'এই নাও, আমি একটি ফরম নিয়ে এসেছি।' বলেই সে তার ছোট ব্যাগ থেকে ফরমটি বের করে রুকাইয়ার হাতে দিল।

রুকাইয়া সেটি নিয়ে পড়তে লাগল– 'সেভ দ্য হিউম্যান অব ইরাকের সহায়তা প্রার্থীর স্বীকৃতি

- প্রভু যিশু ঐশী শক্তিতে পূর্ণ একজন আকর্ষণীয় ও রহস্যময় ব্যক্তিত্ব।
- তিনি মানবিক ও ঐশ্বরিক স্বভাবের সমন্বয়।
- আমাদের বেহেশতী পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক।
- তোমার রাজ্য আসুক।
- তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেশতে, তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক।
- তোমার নাম পাক জাত বলে মান্য হোক।
- যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও।
- তুমি তোমার পিতাকে বলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দাও।
- হে পিতা! আমি তোমাকে খোদার পুত্র বলে নিবিষ্ট মনে স্বীকার করছি।

ফরমটি পড়ে রুকাইয়ার মাথা গরম হয়ে গেল। রাগে-ক্ষোভে সে কেঁদে ফেলল। আর আক্ষেপ করে বলতে লাগল, 'হায়রে দুর্ভাগা জাতি! নিজেরাই কুফরের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, আবার ছলে-বলে-কৌশলে অন্য জাতিকেও সেই সাগরে নামাতে চাচ্ছে। আর নির্বোধ মুসলমানরাও দুনিয়ার সামান্য দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে ঈমানের মতো অমূল্য দৌলতকে পরিত্যাগ করতে শুরু করেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রুকাইয়া মাহমুদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মাহমুদা! তুমি যে রিপোর্ট এনেছ, তাতে ইচ্ছে হয় যে, এই সংস্থার পুরো কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা করি। কিন্তু হাতে সময় কম। তার জন্য আরও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বাগদাদের ঈগলের মুক্তি। তাকে মুক্ত করতে পারলে সে-ই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারবে। এখন বলো তো, প্রহরীদের কিভাবে ম্যানেজ করলে? কিভাবে আমরা প্রবেশ করব?'

'অফিসে প্রবেশের গেট থেকে ভিতর পর্যন্ত, প্রতিটি তলায় প্রহরীদের সরব উপস্থিতি আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল' – মাহমুদা বলল – 'ভাবছিলাম, এতগুলো গার্ডের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে অপহরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কিন্তু সমাধানটা পেলাম বের হওয়ার সময়।'

'সেটা কী রকম?' – জানতে চাইল রুকাইয়া।

'সে এক কাকতালীয় ব্যাপার' – মাহমুদা বলল – 'আমি বের হওয়ার আগেই ভেবে রেখেছিলাম, এখান থেকে কাউকে অপহরণ করতে হলে গার্ডদের সাথে সখ্য গড়তে হবে। তাই গেটের কাছে এসে এক গার্ডের কাছে তার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। ঠিক সে সময় গার্ডপ্রধান বাহির থেকে গেটের ভিতরে প্রবেশ করল। আমাদেরকে উক্ত গার্ডের সাথে কথা বলতে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। তাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। আমার শরীরে কাঁপন শুরু হয়ে গেল। পায়ের তলার মাটি যেন সরে যেতে লাগল।'

'কেন? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না' – রুকাইয়া কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বলল – 'এই তুমি বললে যে, কাকতালীয়ভাবে সব হয়ে গেল। আবার বলছ, গার্ডপ্রধানকে দেখে তোমার মনের মধ্যে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা... ।'

'আরে বাবা, আমাকে বলতে দিবে তো।' রুকাইয়াকে কথা শেষ করতে দিল না মাহমুদা। সে বলল– 'আমার বুকে কম্পন ধরেছে এজন্য যে, গার্ডপ্রধান ছিল মাহমুদুল হাসান। তুমি তো জান, সে আমার জন্য কেমন দেওয়ানা। সে আমাকে ওই অফিসে দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু তা অন্য কাউকে বুঝতে না দিয়ে আমাদেরকে তার আত্মীয় বলে পরিচয় দিল। তারপর তার রুমে নিয়ে এখানে আসার কারণ জানতে চাইল। আমি তাকে শপথ পড়িয়ে নিলাম। আমি তোমাকে সবই বলব। তবে ব্যাপারটি গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে হবে।'

সে তখন আমার মাথায় হাত রেখে শপথ করল, 'যদি আমি ওয়াদা রক্ষা করতে না পারি, তাহলে এই মুখ আমি কোনো দিন আর তোমাকে দেখাব না।'

মাহমুদুল হাসান। তেইশ-চব্বিশ বছরের সুঠাম দেহী এক বলিষ্ঠ নওজোয়ান। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। চারিত্রিক মাধুর্যে পুরো এলাকায় প্রশংসিত। মাহমুদাকে সে ছোটবেলা থেকেই ভালবাসে। সে এক ব্যতিক্রমী ভালবাসা। কোনো দিন মুখ ফুটে কথাটা মাহমুদাকে বলেনি। অথচ প্রতিজ্ঞা করেছে তাকে ছাড়া আর কাউকে সে শাহীদ করবে না। তার বন্ধু মহলের প্রায় সকলে ব্যাপারটা জানে। তাদের মধ্যে কেউ একজন ফোন করে বিষয়টি মাহমুদার গোচরীভূত করল। সে তা শুনে 'হ্যাঁ-না' কিছুই বলেনি। হয়ত সেও তাকে মনে-মনে পছন্দ করত অথবা করত না। অবশ্য তার মার্জিত আচরণ, সহজ সরল জীবন আর চারিত্রিক পবিত্রতা বরাবরই তার ভালো লাগত। তবুও কেন যেন সে

তার প্রেমে সাড়া দেওয়ার তাগাদা অনুভব করত না। হয়ত মাহমুদার পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো প্রস্তাব না আসায় সে উপযাচক হয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ব্যাপারটা ওভাবেই রয়ে গেছে।

সম্প্রতি দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা আরো চাপা পড়ে যায়। মাহমুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধের শুরুর দিকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাই সে বেশ কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘুরে-ফিরে কাটায়। তারপর একদিন 'সেফ দ্য হিউম্যান অফ ইরাক'-এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে দরখাস্ত করলে চাকরি হয়ে যায়। দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে গার্ডপ্রধানের দায়িত্ব পায়।

মাহমুদা মাহমুদুল হাসান থেকে গোপনীয়তার স্বীকৃতি আদায় করার পর তার পরিকল্পনাটি খোলাখুলি ব্যক্ত করল। সব শুনে মাহমুদ বেশকিছু সময় নীরবতা পালন করল। পরিশেষে তাকে এই বলে আশ্বাস দিল যে, জীবনের বিনিময়ে হলেও সে তাদেরকে সহায়তা করবে এবং সেটা শুধু ঈগলের মুক্তির লক্ষ্যে – অন্য কোনো কারণে নয়।

'মাহমুদ ভাই! তুমি আমাদেরকে কোনো ধরনের সহায়তা করতে পারবে?' মাহমুদা জানতে চাইল।

'আমি তোমাদেরকে সেই সহায়তাই করব যেটা তোমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।' উত্তরে মাহমুদা বলল।

'একটু ব্যাখ্যা করলে আমাদের প্রস্তুতিটা সম্পূর্ণ হত।'

'আমি কিছুক্ষণের মধ্যে গার্ডদেরকে দুপুরের খানা খেতে আমার বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। ওদের জন্য আজ আমার বাসায় বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। যদিও এ সময় দু-একজনকে রেখে যেতে হয়; কিন্তু আমি কাউকেই রেখে যাব না। তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে, তোমরা এখানকার কাউকে হত্যা করতে পারবে না। অযথা কাউকে মারধর করবে না। তাহলে আমাদের অনুপস্থিতির সময়টায় তোমরা দুজন কেন দশজনকেও অপহরণ করে নিতে পারবে।' মাহমুদ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল।

'মাহমুদ ভাই! এতে আপনি আপনার সংস্থার কাছে দোষী হয়ে যাবেন না?' ব্যাখ্যা শুনে মাহমুদা আশঙ্কা ব্যক্ত করল।

'দোষী হলে গোটা বাহিনী দোষী হবে' – মাহমুদ বলল – 'কেননা, আজ যে খানার আয়োজন আমি করেছি, সেটা এক প্রকার ওদের চাপে পড়েই করেছি। গতকাল একটি বিষয়ে ওদের সাথে বাজি ধরে আমি হেরে যাই। তার মাশুল আজকের এই খানা। সুতরাং আমাকে আটকাতে পারবে না কিছুতেই।'

'তাহলে আমিও তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বিনা কারণে একটা গুলিও ছোড়া হবে না এবং অযথা কারো গায়ে হাত দেওয়া হবে না। পারতপক্ষে কাউকে খুনও করা হবে না।' এই বলে মাহমুদকে নিশ্চয়তা দিল মাহমুদা।

মাহমুদার কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট শোনার পর রুকাইয়া তার অভিযানের ছকে কিছু রদবদল করল। দুপুর দুটার দিকে তারা স্পটে পৌঁছল। 'সেভ দ্য

হিউম্যান অব ইরাক'-এর গেটে কোনো প্রহরী আছে কিনা তা নিরীক্ষা করার জন্য মাহমুদাকেই প্রথমে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। মাত্র দু-মিনিটের মাথায় ফিরে এসে সে সত্যায়ন করল, প্রহরীপ্রধান মাহমুদ তার কথা রেখেছে। একজন প্রহরীও গেটে নেই। রুকাইয়ার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমান্ডো ইউনিটটি দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের অস্ত্র ছিল বস্ত্রাবৃত। কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা অফিসে ঢুকে হঠাৎই দুজন মহিলা কর্মীকে জিম্মি করে ফেলল। একজন ফাঁকা গুলি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করল। ঘটনার আকস্মিকতায় অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। কমান্ডোদের একজন হ্যান্ডমাইক দিয়ে ঘোষণা শুনিয়ে দিল, 'যে যেস্থানে আছ, সে সেখানেই থাকবে। কোনো প্রকার নড়াচড়া করা যাবে না; কেউ যদি কোনো প্রকার চালাকির আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে, তাহলে পাইকারীহারে গুলি করা হবে।'

ঘোষণার পর রুকাইয়া ও মাহমুদা মহিলা কর্মীকে সাথে নিয়ে বের হতে লাগল আর বাকি তিনজন তিনটি তলায় সকল কর্মচারীকে জিম্মি করে রাখল।

যখন তারা বন্দীদ্বয়কে নিয়ে নির্বিঘ্নে গাড়িতে পৌছল এবং কমান্ডোদের কাছে সংকেত পৌছাল, তখন কমান্ডোরা ফাঁকা গুলি ছুড়তে-ছুড়তে পেছনে হটতে লাগল। প্রথমে তিন তলারজন নেমে দ্বিতীয় তলারজনের কাছে এল। তারপর তারা দুজন একত্রে পিছু হটে নিচ তলায় তৃতীয়জনের কাছে এল। এবার তিনজন একত্রে পিছু হটতে লাগল। তাও খুব সতর্কতার সাথে এগুচ্ছে তারা। দুজন অফিসের দিকে এবং একজন পেছনের দিকে অর্থাৎ যেদিকে তারা যাচ্ছে, সেদিকে অস্ত্র তাক করে এগুচ্ছে। এভাবে দ্রুত তারা গেটের কাছে পৌছে গেল। কোনো প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই মাত্র ৩ মিনিটের মধ্যে শেষ হল এই শ্বাসরুদ্ধকর অপহরণ অভিযান। কমান্ড তিনজন ফিরে এসে গাড়িতে উঠার সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দিল। তবে এরই মধ্যে অপহৃত বন্দীদ্বয়ের চোখ-মুখ বেঁধে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য ভয়ে তারা এমনিতেই আধমরা হয়ে গিয়েছিল; তবুও সতর্কতার খাতিরে এটি করতে হল রুকাইয়াদের।

সালাফিস্ট ব্রিগেড অব সালাহুদ্দীন আঈয়ূবীর শাখা 'ফ্যালকন-২' কর্তৃক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে দুজন বিদেশি সাহায্যকর্মী অপহরণের ভিডিওচিত্র ও অপহরণকারীদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত ভিডিও ফুটেজটি যখন আরবি চ্যানেল আল-জাজিরায় প্রকাশিত হয়, তখন সর্বত্র একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। আমেরিকা ও তার সহযোগীরা ইরাকে কত অসহায় ও নিরাপত্তাহীন তা আলোচিত হতে থাকে জোরেশোরে। অনেককে মন্তব্য করতে শোনা গেল, ইরাকের কন্যা-জায়া-জননীরাও যখন মুক্তির পতাকায় হাত রেখেছে, তখন এই পতাকাকে কেউ অবদমিত করতে পারবে না।

স্যাটেলাইট চ্যানেলে উক্ত অপহরণ সংবাদ প্রকাশের প্রতিক্রিয়া জানা গেল পরের দিন। লন্ডনের রাস্তায় বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করল অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজন ও যুদ্ধবিরোধী সংগঠনগুলো। টনক নড়ল ব্লেয়ারের। বৃটেনের পক্ষ থেকে অপহৃত সাহায্যকর্মীদ্বয়কে মুক্ত করানোর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হল। শুরু হল কূটনৈতিক তৎপরতা। আর্থিক মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতদের উদ্ধারের প্রস্তাব দিল মার্কিনিরা। কিন্তু রুকাইয়াদের একটাই দাবি– 'বাগদাদের ঈগলের' মুক্তি বিনে বন্দিনীদের ছাড়া হবে না।

দেখতে-দেখতে চার দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু বন্দিবিনিময়ের কোনো সুরাহা হল না। চতুর্থ দিন সন্ধ্যাবেলা মাহমুদার বাসায় এল 'সেভ দ্য হিউম্যান অব ইরাকে'র গার্ডপ্রদান মাহমুদুল হাসান। চোখে-মুখে তার উৎকণ্ঠার ছাপ। মাহমুদাকে ডেকে একটি সতর্কবাণী দিল।

'আমরা জানতাম, মার্কিনিরা এমন কিছু করবে' – ভাবলেশহীন মাহমুদা বলল – 'তবু কষ্ট করে সংবাদটি নিয়ে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু মাহমুদ ভাই! তুমি কি জান, ওরা আমাদের অবস্থানের সন্ধান কিভাবে পেল?'

'আমি যতদূর জেনেছি, আল-জাজিরায় পাঠান তোমাদের ই-মেইলের সূত্র ধরে তারা তোমাদের অবস্থানের সন্ধান পেয়েছে' – মাহমুদা বলল – 'এখন বন্দিবিনিময়ের আলোচনা করে তারা সময় ক্ষেপণ করতে চাইছে। সুযোগমতো বন্দিনীদের ছিনিয়ে নিতে তোমাদের উপর তারা জোরদার আক্রমণ চালাবে।'

'আল্লাহ চাহেন তো তাদের এই মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে না' – মাহমুদা বলল – 'আক্রমণ চালালে আমরাও পাল্টা ব্যবস্থা করে রেখেছি। সেজন্য তোমাকে পেরেশান হতে হবে না মাহমুদ ভাই! তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। সেদিন আমাদের জন্য তোমার কোনো সমস্যা হয়েছিল কি?'

'না, কী আর হবে।' মাহমুদের শুষ্ক উত্তর।

'না, মানে আমাদের আক্রমণের সময় তোমরা তো কেউ ডিউটিতে ছিলে না। সেজন্য কর্তৃপক্ষ তোমাকে চার্জ করেছিল কিনা?' মাহমুদা পুনরায় প্রশ্ন করল।

এবার মাহমুদুল হাসান চুপ হয়ে গেল। মাহমুদার প্রশ্নের কোনো উত্তরই সে দিল না। যেন ক্ষণিকের তরে সে বোবা বনে গেছে। তার মুখায়বয়বই বলে দিচ্ছিল তার ভেতরে একটা চাপা ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। মাহমুদার কথা শুনে আতঙ্কের ভাবটা কেটে গেলেও ক্ষোভটা যথারীতি বহাল রয়েছে। কিন্তু কেন এই ক্ষোভ? কার প্রতি এই ক্ষোভ? হ্যাঁ, সেটা জানা গেল তার মুখ খোলার পর।

'কী হল? তুমি কথা বলছ না কেন মাহমুদ ভাই?' মাহমুদকে চুপটি মেরে বসে থাকতে দেখে মাহমুদা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'মাহমুদা! তোমাদের দলে কি আমাকে নেওয়া যায়?' মুখ খুলেই প্রশ্ন করল মাহমুদ।

'কেন? তোমার কী হয়েছে মাহমুদ ভাই?' মাহমুদা কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বলল – 'হঠাৎ তোমার এই মনোভাব হল কী করে?'

'কেন মাহমুদা! দেশমুক্তির লড়াইয়ের দায়িত্ব বুঝি তোমাদের একার? অন্য কেউ এতে শরীক হতে পারবে না নাকি?' একপ্রকার রাগান্বিত হয়েই মাহমুদ বলল।

'আহা! তুমি আমাকে ভুল বুঝছ কেন ভাই!' – মাহমুদা বলল – 'এ দেশ যেমন আমার, তেমনি তোমার, তেমনি পুরো ইরাকিদের। একে শত্রুমুক্ত করার দায়িত্বও তাই সকলের। কেউ যদি তার এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আমাদের প্রাণপ্রিয় এই মাতৃভূমিকে শত্রুর দখল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, সংগ্রাম অব্যাহত রাখব। এখন তুমি যদি তোমার দায়িত্ব বুঝে এ লড়াইয়ে শরীক হতে চাও, তাহলে আমাদের এই রক্তিম ভুবনে তোমাকে স্বাগতগ জানানো হবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে, কেন তুমি এ সিদ্ধান্ত নিলে? আর কেনইবা এতক্ষণ তুমি গম্ভীর হয়ে বসেছিলে? আমার মনে হচ্ছে, তোমার মনে কোনো একটা কঠিন বোঝা চেপে আছে।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ মাহমুদা' – মাহমুদ বলল – 'আসলেই আমার মনে একটা ভয়াবহ ক্ষোভ বিরাজ করছে। দু-চারজন বৃটিশকে হত্যা করতে না পারলে এ ক্ষোভ আমার নিবৃত্ত হবে না।'

'কেন, কী করেছে বৃটিশরা তোমার?' প্রশ্ন মাহমুদার।

'এই যে দেখো, আমাদের অনুপস্থিতির দরুন যে অপহরণ তোমরা করেছ আমাদের অফিসে, তার জন্য আমাকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চার্জ করেছিলেন' – মাহমুদ বলল – 'আমি প্রহরীদের মাথায় দোষ চাপিয়ে দিয়েছি। তারাও দায় স্বীকার করে নিয়েছে। তাই প্রধান নির্বাহী অভিযোগ থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু তিন দিন পর এক বৃটিশ কর্মকর্তা প্রধান নির্বাহকে চাপ প্রয়োগ করেন আমাকে বরখাস্ত করে দিতে। তার ধারণা, অপহরণকারীদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আর সেজন্যই আমি একজন প্রহরীও রেখে যায়নি। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তার এই যুক্তি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু যেহেতু অপহৃতরা বৃটিশ নাগরিক, তাই তাকে তার কথা মেনে নিতে হয়েছে। আমাকে বরখাস্ত করার সময় তিনিই এই অপারগতার কথা স্বীকার করেছেন। ঐ বৃটিশের বাচ্চা বৃটিশের জন্য আজ আমার চাকরিটা গেল। তাই আমি এখন কী করব? তোমাদের মুক্তিবাহিনীতে আমি এজন্যই যোগ দিতে চাচ্ছি যে, কোনো একটা বৃটিশও যেন ইরাকের মাটিতে থাকতে না পারে। ওদের আমি যেখানে পাব সেখানেই হত্যা করব।'

'মাহমুদ ভাই! মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করা তোমার জন্য সম্ভব হবে না' – অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে মাহমুদা বলল – 'যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে একজন মুক্তি

সৈনিক লড়াই করে, তোমার মধ্যে তা অনুপস্থিত। তুমি লড়াই করতে চাচ্ছ ব্যক্তিগত আক্রোশ পূরণের জন্য। কিন্তু একজন মুক্তি সৈনিক লড়াই করে তাঁর দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য। সুতরাং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই পবিত্র বাহিনীতে যোগ দেওয়ার বা দেওয়ানোর অধিকার কারো নেই।'

মাহমুদার কথা শুনে মাহমুদুল হাসান মাথা নিচু করে বসে রইল। একথার বিপরীতে কোনো কথা বলার সৎসাহস তার রইল না। তার অবস্থা অনুধাবন করতে পেরে মাহমুদা বলল, 'তুমি যদি মুক্তির লড়াইয়ে শরীক হতে চাও, মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে চাও, তাহলে তোমাকে সব রকম বাহ্যিক ধ্যান-ধারণা, লোভ-লালসা, ব্যক্তিগত আক্রোশ-ক্ষোভ ইত্যাদি পরিহার করে মনকে কলুষমুক্ত করে নিতে হবে। তোমার শত্রু তারাই হবে, যারা তোমার দেশ-জাতি ও ধর্মের শত্রু। তুমি হযরত আলী (রা.)-এর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে পার। এক যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) এক কাফিরকে হত্যা করার জন্য তার বুকে চড়ে বসেন। উক্ত কাফের খুব কষ্ট পাচ্ছিল। একপর্যায়ে সে আলী (রা.)-এর মুখে এক দলা থুতু নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ আলী (রা.) তাকে ছেড়ে দিলেন।'

'আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন কেন?' লোকটি প্রশ্ন করল – 'আমি তো আপনার মুখে এজন্য থুতু মেরেছি যে, আপনি আমার বুকের উপর কষ্ট না দিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি হত্যা করে ফেলেন। তা না করে আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন!'

'প্রথমে যখন তোমাকে আমি হত্যা করতে ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন তুমি ছিলে আমার প্রভুর শত্রু, আমার ধর্মের, আমার জাতির শত্রু। কিন্তু তুমি থুতু নিক্ষেপ করায় আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় তোমাকে হত্যা করলে হয়ত আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে যে, কেন আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে একজন মানুষকে আমি হত্যা করলাম? তখন আমি কী উত্তর দেব? সেকথা ভেবেই তোমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।' উত্তরে আলী (রা.) বললেন।

আলী (রা.)-এর কথা শুনে কাফের মুসলমান হয়ে গেল। আর এটাই হল একজন মুজাহিদের প্রকৃত গুণ। আর এজন্যই ইসলামকে সন্ত্রাস বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, মহান আল্লাহ মুসলমানদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সীমালঙ্ঘন না করার হুশিয়ারি দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলার হুশিয়ারির কারণেই আলী (রা.) লোকটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি যদি আমাদের দলে যোগদান করতে চাও, তাহলে এই বিষয়গুলো তোমার বিবেচনায় রাখতে হবে। রাজী আছ?'

'জিহাদ সম্বন্ধে আমার এসব জানা ছিল না' – মাহমুদ বলল – 'এত দিন আমার ধারণা ছিল, জিহাদ মানে যেকোনো কৌশলে বিধর্মীদের আর মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মবিরোধী কাজ করে, তাদের হত্যা করা। এই ধারণা

থেকেই আমি ব্রিটিশদের গণহত্যা করতে চেয়েছিলাম। ভাবছিলাম, এই মত ব্যক্ত করলে তোমরা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় আমি হতাশ হয়েছিলাম। এখন তোমার আলোচনা দ্বারা এ সম্বন্ধে আমার যেটুকু সুধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমি আরো সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তোমাদের দলে যোগদান করতে অবশ্যই তৈরী আছি।'

'তোমার ধারণা আরো স্পষ্ট করতে হবে মাহমুদ ভাই' – মাহমুদা বলল – 'আজকাল ইসলামের দুশমনরা তাদের শক্তিশালী মিডিয়াযন্ত্রের সাহায্যে জিহাদের এই অর্থই প্রচার করে থাকে, যা এত দিন তোমার ধারণা ছিল। এর সমর্থনে তারা বাস্তব দৃষ্টান্তও পেশ করে থাকে। সেটা হল, তোমার মতে লোকদের অর্থকড়ি দিয়ে তারা বিভিন্ন দেশে ওভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ইসলামের উপর সন্ত্রাসের সীল এঁটে দিয়েছে। বাস্তবে যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইহুদী-খৃষ্টানদের ভাড়াটিয়া এই মুজাহিদ আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এদের অবৈধ কর্মকাণ্ড ফলাও করে প্রচারিত হলেও মদদদাতা ও পৃষ্ঠপোষকরা থেকে যাচ্ছে পর্দার আড়ালে। যদ্দরুন সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ইসলাম নামক একটি পবিত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মের দুর্নাম হয়। সুতরাং আমাদের দলে যোগ দিতে হলে জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যকার পার্থক্য খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে।'

'আমি সহজ-সরল মানুষ। এত বোঝাবুঝির আমার প্রয়োজন নেই। তোমরা যা বলবে, যেভাবে বলবে আমি তা-ই মেনে নেব এবং সেভাবেই কাজ করব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে' – মাহমুদা বলল – 'তোমাকে তাহলে ঈগল ভাইয়ার মুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে আমাদের সকল কর্মপরিকল্পনা তাঁর মুক্তিকে ঘিরে আবর্তিত।'

◆◆◆

বন্দিনীদ্বয়কে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে রুকাইয়া আগেই ভেবেছিল এবং বলেছিল। কেউ-কেউ দ্বিমত পোষণ করায় সেও আর বেশি গুরুত্ব দিল না। কিন্তু এইমাত্র মাহমুদার কাছে গার্ডপ্রধানের রিপোর্ট শুনে সবাই সতর্ক হয়ে গেল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বন্দিনীদের সরিয়ে নেওয়া হল। নতুন স্থানে এনে আরেকটি ভিডিও ফুটেজ ধারণা করা হল এবং সর্বশেষ আল্টিমেটাম হিসেবে এটি পাঠিয়ে দেওয়া হল স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে এতে সময় বেঁধে দেওয়া হল মাত্র ৭২ ঘণ্টা এবং হুমকি দেওয়া হল বন্দিনীদের হত্যা করার।

আল্টিমেটামে বেশ কাজ হল। টেলিভিশনে ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শনের পরই দখলদারদের ভেতর চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। ইরাকে নিযুক্ত বৃটিশ রাজকীয় বাহিনীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৈনিকগণ তাদের কমান্ডারের কাছে বার্তা পৌঁছাল, যদি আমাদের বোনদের অপহরণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করা না হয়, আর যদি তাদের শবদেহ আমাদের বহন করতে হয়; তাহলে একজন বৃটিশ সৈনিকও

আর ইরাকে দায়িত্ব পালন করবে না। বেঁকে বসল সেফ দ্য হিউম্যান অফ ইরাকের কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বৃটিশ কর্মচারীগণও। তারা সবাই একযোগে কর্মবিরতি শুরু করল এবং তাদেরও একই ঘোষণা, যদি বন্দিনীদের নিরাপদে উদ্ধার করা না হয়, তাহলে তারাও আর এ দেশে থেকে দায়িত্ব পালন করবে না।

এমতাবস্থায় বেকায়দায় পড়ে গেল উপরস্থ বৃটিশ কর্মকর্তাগণ। তারা না পারছেন বন্দিনীদের মুক্ত করতে, না পারছেন অধীনদের শান্ত রাখতে। বাধ্য হয়ে তারা মার্কিন বাহিনীর কাছে দাবি করে বসলেন, যেকোনো উপায়ে হোক অপহরণকারীদের ঘোষিত সময়ের মধ্যে বন্দিনীদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মার্কিনিদের কাছে মুক্তির দুটো পথ খোলা ছিল – হয় তারা ঈগলকে মুক্তি দিয়ে বন্দিবিনিময় করবে, নতুবা শক্তি প্রয়োগ করে বন্দিনীদের ছিনিয়ে নেবে। তাদের জন্য সহজ ও ঝামেলামুক্ত হল প্রথম পন্থা। দ্বিতীয় পন্থায় অন্যান্য ঝুঁকির সাথে বন্দিনীদের জীবন নাশের আশংকাও একশ ভাগ। তাছাড়া দ্বিতীয় পন্থায় সফল হতে তারা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে অগ্রসর হচ্ছিল এবং সাফল্যের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, গতকাল হঠাৎ করেই তা সব গোল্লায় গেল। কারণ, অপহরণকারীরা স্থান পরিবর্তন করে ফেলেছে। সুতরাং এখন তাদের সামনে প্রথম পথটিই কেবল খোলা। অনোন্যপায় হয়ে তারা এ পথেই অগ্রসর হল।

ইন্টারনেটে তারা বন্দিবিনিময়ের ঘোষণা অপহরণকারীদের জানিয়ে দিল। তবে শর্ত জুড়ে দিল, আগে বন্দিনীদের মুক্তি দিতে হবে, তারপর ঈগলকে মুক্তি দেওয়া হবে। রুকাইয়াদের পক্ষ থেকেও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আগে ঈগলকে নিরাপদে তাদের দেওয়া ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে এবং সেই সাথে মুক্তিপণের দু-কোটি দিনারও। এর পরই তারা সসম্মানে বন্দিনীদ্বয়কে মুক্তি দিয়ে দেবে। এর ব্যতিক্রম হলে কিংবা কোনো প্রকার চালাকির চেষ্টা করলে সাথে সাথে বন্দিনীদের শিরচ্ছেদ করা হবে।

মার্কিনিদের পক্ষ থেকে মুক্তিপণের দিনারের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হল। তারা পঞ্চাশ লাখ দিনার দিতে রাজি হল।

দুদফা দরকষাকষির পর মার্কিনিরা এক কোটি দিনার ও ঈগলকে রুকাইয়াদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিল। এবার বন্দিনীদ্বয়ের মুক্তির পালা। কিন্তু এ নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ল রুকাইয়া। কেননা, এই মুক্তি প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো ঝুঁকি আছে। একবার ভাবল, তাদেরকে নিজ-নিজ জিম্মায় পাঠিয়ে দেবে। পরক্ষণেই ভাবল, পথে যদি আবার অন্য কোনো গেরিলা গ্রুপের হাতে পড়ে, তাহলে এ নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে। অথবা এও হতে পারে, পথে মার্কিনিদের হাতে পড়ল আর তারা ওদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে অবশেষে তাদের হত্যা করে ফেলল। দায় চাপিয়ে দিল অপহরণকারীদের উপর। আবার ভাবল, কাউকে সাথে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হয়। কিন্তু

তাতেও ঝুঁকি কম নয়। সাথে যে যাবে, তার গ্রেফতার হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এভাবে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে রুকাইয়া বিষয়টি নিয়ে পরামর্শে বসল। বিভিন্নজন বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করল। কিন্তু বুদ্ধিমতী মাহমুদার প্রস্তাব সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হল। তাঁর প্রস্তাব হল, বন্দিমুক্তি করা হবে সাংবাদিকদের মাধ্যমে। ইরাকের প্রভাবশালী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টমিডিয়ার কম করে হলেও ১০জন সাংবাদিককে একটা নিরাপদ স্থানে আসতে বলা হবে, যেখানে কোনো মার্কিন সৈনিক আসতে পারবে না। তারপর একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে বন্দিনীদ্বয়কে উক্ত স্থানে পাঠান হবে। সাংবাদিকগণ ওদেরকে মার্কিনিদের কাছে হস্তান্তর করবেন।

মাহমুদার প্রস্তাব অনুযায়ী কয়েকটি মিডিয়ার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা হল। আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল। স্থান নির্ধারণ করা হল বাগদাদের প্রেস কাউন্সিল। বেলা ১১টার দিকে ভাড়াকৃত গাড়িতে বিদায় জানানো হল বন্দিনীদের। বিদায় মুহূর্তে সেখানে এক অন্যরকম পরিবেশের অবতারণা হল। স্বচক্ষে না দেখলে হয়ত কেউ এ ঘটনা বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

বন্দিনী মারিয়া ও জুলিয়া এ সময় রুকাইয়া ও মাহমুদাকে আঁকড়ে ধরে এমনভাবে কান্না জুড়ে দিল, যা দেখলে মনে হবে যেন তারা কোনো নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে, নিজ ঘর থেকে বিদায় নিয়ে কোনো দূর অজানায় পাড়ি জমাচ্ছে। অথচ যখন তাদেরকে অপহরণ করে আনা হয়েছিল, তখন তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুশমন ছিল রুকাইয়া ও তার অনুসারীরা। আর আজ মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে শত্রু বনে গেল পরমাত্মীয়।

কিন্তু কেন এমন হল? কোন জাদু-মন্ত্র বলে রুকাইয়া তাদের শত্রু থেকে বন্ধু বানিয়ে ফেলল। এমন কী গুণটি আছে রুকাইয়া ও মাহমুদাদের মধ্যে যে, বন্দিনীরা তাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট অনুভব করছে? আসলেই বিষয়টি রহস্যপূর্ণ বটে। তবে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি বোলালে রহস্যটির বাস্তবতা সুন্দরভাবে নয়নতারায় ভেসে ওঠে।

সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। আজ থেকে প্রায় পনেরোশ শতাব্দী পূর্বে দৃশ্যায়িত হয়েছিল সেই ঘটনা, যা দেখে আপ্লুত, মুগ্ধ ও পুলকিত হয়েছিল তৎকালীন জগদ্বাসী। তাদের কাছে বিষয়টি ছিল অভূতপূর্ব। কেননা, তখন যুদ্ধ-রক্তপাত ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক একটা বিষয়। গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধ। জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ। দেশে-দেশে যুদ্ধ। যুদ্ধ যেন একটা ছেলেখেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল। আর এই যুদ্ধের ভয়াবহ ছোবলে এক-একটা জাতি-গোত্র পরিণত হত ধ্বংসের লীলাভূমিতে। কত শত বনি আদম যে বলি হত ধ্বংসের এই উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্রে, তার হিসাব কে রেখেছে? তাছাড়া যুদ্ধের ময়দান থেকে বন্দী হত যে সকল দুর্ভাগা, তাদের করুণ পরিণতি ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। এ সকল

দুর্ভাগাকে সহসাই বরণ করে নিতে হত জীবনের এমন একটা অধ্যায়, যেখানে মানুষ বলে তাকে গণ্য করা হত না। প্রথমত তাদেরকে পশুর মতো হাটে-বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হত। তারপর শুরু হত পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মানের জীবন-যাপন।

কিন্তু ইসলাম ধরায় এসে যুদ্ধের ঐ ধ্বংসস্তূপে জ্বালল শান্তি ও নিরাপত্তার দীপ্ত মশাল। 'যুদ্ধ মানেই ধ্বংস' এই ধারণা ইসলাম পাল্টে দিল। শুধু তা-ই নয়, অসহায় ও দুর্ভাগা যুদ্ধবন্দীদের জন্যও ইসলাম নিয়ে এল উৎকৃষ্ট জীবনের নিশ্চয়তা। লক্ষ্য করুন, ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ বদরে মুসলমানগণ তাঁদের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি সমরশক্তির সাথে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনার পরও যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন মানবিকতাপূর্ণ আচরণ করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের দু-দুজন, চার-চারজন করে প্রত্যেক সাহাবীকে ভাগ করে দিয়ে তাদের আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ তাদের সঙ্গে এমন উদার ব্যবহার করলেন যে, তাঁরা নিজেরা খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন এবং বন্দীদের জন্য নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হযরত মুস'আব ইবনে উমায়েরের ভাই আবু আযীযও ছিল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, যেসব আনসার আমাকে তাঁদের গৃহে আবদ্ধ রাখেন, তাঁরা যখন সকাল বা সন্ধ্যায় খাবার নিয়ে আসতেন, তখন আমার সামনে রুটি দিয়ে তাঁরা নিজেরা খেজুর খেতেন। তাতে আমি খুবই লজ্জা পেতাম। আমি তুলে নিয়ে তাঁদের হাতে দিয়ে দিতাম, কিন্তু তারা তাতে হাতও লাগাতেন না। আবার আমাকে ফিরিয়েও দিতেন না। এর একমাত্র কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বন্দীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বন্দীদের মধ্যে সুহাইল ইবনে আমের নামে এক কবিও ছিল। প্রকাশ্য সভায় সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করত। হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'হুযুর! এই লোকটার নিচের দুটা দাঁত উপড়ে দেওয়া হোক; তাহলে সে আর ভালোভাবে কথাই বলতে পারবে না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি আমি তার অঙ্গ বিকৃতি করি, তবে যদিও আমি নবী, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর বদলায় আমারও অঙ্গ বিকৃত করে দিতে পারেন।'

বন্দীদের কারো অতিরিক্ত কাপড় ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে নিয়ম ছিল, শত্রুকে বন্দী করতে পারলে তাকে কোনো কিছু দ্বারা বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হত অথবা তরবারীর আঘাতে হত্যা করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন।

বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈর কন্যা যখন বন্দী হয়ে এল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে মসজিদের একপাশে স্থান করে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের শহরের কোনো লোক এলে আমি তাদের সঙ্গে তোমাকে বিদায় দেব।'

অতএব, কয়েক দিন পর সফরের পাথেয় সংগ্রহ করে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাকে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দিলেন।

এভাবে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বন্দীদের সাথে কোমল, মানবীয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন আর মুসলিমরাও এই নির্দেশকে যথাযথভাবে মেনে চলছেন বদর থেকে নিয়ে প্রতিটি রণক্ষেত্রে। রুকাইয়া ও মাহমুদাও বন্দিনীদ্বয়ের সাথে যে আচরণ করেছে, তা ইসলামের এই নির্দেশ পালন করতে গিয়েই করেছে। তারা বন্দিনীদের সাথে মিশেছে আপন বোনের মতো। বরং তার চেয়েও ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিকভাবে, তাদের কাছে যা ছিল ধারণাতীত ব্যাপার। কেননা, তাদের দেশের রীতিনীতি ও বিভিন্ন ড্রামা, নাটক কিংবা উপন্যাসের আখ্যান থেকে অপহরণকারীদের সম্বন্ধে যে ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাস তাদের মনে বাসা বেঁধেছিল, রুকাইয়ারা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শুধু তা-ই নয়, মুসলমানদের সম্বন্ধে তাদের যে ধারণা ছিল (বস্তুত তাদের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল চার্চের পক্ষ থেকে), তা ছিল রীতিমতো ভয়ংকর ও হাস্যকর। তাদের ধারণায় মুসলমান একটা অসভ্য জাতি। সভ্যতা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ বলতে এরা কিছুই বোঝে না। এদের জীবনজুড়ে বর্বরতা, হিংস্রতা আর পশুত্বের ভয়াল প্রতিচ্ছবি বিরাজিত। এরা নিরীহ মানুষদের খুন করতে কোনোরূপ দ্বিধা করে না। এদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দশ বছরে অনেকগুলো যুদ্ধ করে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধবাজ নেতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই তাঁর অনুসারীরাও আজ সারা বিশ্বে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছে। হত্যা করছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ। যদ্দরুন সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের ঘৃণিত রাজটিকা তাদের ললাটেই শোভিত হয়েছে। কিন্তু রুকাইয়া ও তাঁর সঙ্গিনীদের আচার-আচরণে তাদের বিস্ময়ই কেবল বাড়িয়ে তুলছে। এ নিয়ে তারা পরস্পর আলোচনা করেও কোনো কূল-কিনারা করতে পারছে না।

'আমার মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের হত্যা করবে বলেই এই মধুর আচরণ করছে" – মারিয়াকে লক্ষ্য করে জুলিয়া বলল – 'নতুবা এই ভয়ংকর সন্ত্রাসীরা আমাদেরকে এত খাতির-যত্ন করছে কেন?'

'আমারও তা-ই মনে হয়' – ভয়াতুর কণ্ঠে মারিয়া বলল – 'এই অভিনয় আমার একদম অপছন্দ। আমাদের ওরা মারবে তো মেরে ফেলুক। অযথা মৃত্যুকে আমাদের চোখের সামনে লটকিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছে কেন?'

'একটু সবুর করো। ওদের কেউ এদিকে এলেই এ ব্যাপারে...'

জুলিয়া তার কথা শেষ করতে পারল না; এরই মধ্যে স্বহাস্য বদনে রুকাইয়া প্রবেশ করল কক্ষে। তার কথার রেশ ধরে বলল, 'এই যে আমি এসে গেছি বোন। তোমাদের কী সমস্যা বল আমাকে।'

'না, মানে কোনো সমস্যা নয়' – রুকাইয়ার আন্তরিকতায় ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয় যেন জুলিয়া ভুলেই গেল। তাই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কাচুমাচু করে বলল– 'না, কোনো সমস্যা নয়।'

'অবশ্যই কোনো সমস্যা হচ্ছে তোমাদের' – রুকাইয়া তাদের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল – 'তোমাদের যেকোনো সমস্যা নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পার। আমি তোমাদের সমস্যা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। সেই সাথে তোমাদেরকে আরেকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তোমরা নিজেদেরকে বন্দী মনে করবে না। আমরা একান্ত বাধ্য হয়ে তোমাদের অপহরণ করেছি। তোমাদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো দুশমনি নেই।'

'আমরা যে সমস্যায় ভুগছি, তা হল মানসিক অস্থিরতা' – মারিয়া বলল – 'তুমি যেহেতু নির্দ্বিধায় বলতে বলেছ, তাই খোলাখুলিই বলছি, তোমাদের এই খাতির-যত্ন আমরা ভালো চোখে দেখছি না। কারণ, প্রবাদ আছে, অতিভক্তি চোখের লক্ষণ। আর আমাদের মনে হচ্ছে, তোমাদের এই অতি আদর-যত্ন খুনের লক্ষণ!'

'তার মানে!' – রুকাইয়ার বিস্ময়। তবুও হাসি মুখে তাদের কাছে প্রশ্ন রাখল – 'তোমাদের কথাটা বুঝলাম না। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বললে ভালো হত বোন!'

'কেন, এটা না বোঝার কী হল' – চড়া গলা মারিয়ার – 'আমাদের এনেছ হত্যা করতে; কিন্তু হত্যার পূর্বে এ সকল অভিনয় নাটক করে আমাদের মৃত্যুকষ্ট বৃদ্ধি না করে সরাসরি হত্যা করলে তোমাদের এমন কী ক্ষতি হত?'

'এসব তুমি কী বলছ মারিয়া!' – রুকাইয়া ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে বলল – 'তোমার কথার আগাগোড়া কিছুই আমার বুঝে আসছে না। কিসের নাটক? কিসের মৃত্যু?'

'আর ন্যাকামি দেখাতে হবে না দস্যু সর্দারনী' – জুলিয়া বলল – 'অসভ্য, অভদ্র ও অমানবিক একটা জাতির সদস্যদর কাছ থেকে বর্বরতা, হিংস্রতা আর পশুসুলভ আচরণ ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু সেখানে তোমরা আমাদের সাথে যে মধুর আচরণ করছ, তা মহামাতা মরিয়মের উদারতাকেও যেন হার মানায়। সুতরাং তোমাদের এ আচরণ অভিনয় নয় তো কী? মানুষ যেমন পশু বলি দেওয়ার পূর্বে সুন্দরভাবে গোছল করায়, সাজায়, ভালো-ভালো খাবার খাওয়ায়, গলায় ফুলের মালা পরায়, তারপর বলি দেয়; তোমরাও আমাদেরকে অসহায় পেয়ে আমাদের সাথে সেই একই আচরণ শুরু করেছ। ঘটনা এই নয় কি?'

'তোমরা আমাদের ভুল বুঝেছ মিস মারিয়া ও জুলিয়া!' রুকাইয়া ওদের প্রশ্ন ও অভিযোগের উত্তরে শুধু এতটুকুই বলল। তার গোলাপী মুখখানা একেবারে পাণ্ডুর হয়ে গেছে। যে আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে সে কক্ষে প্রবেশ করেছিল, তা কোথায় যেন উবে গেল। আসলে মানুষের মুখের কথায় এমন একটা বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া মিশ্রিত থাকে, যা সর্পরাজ কালনাগিনীর দংশনের চেয়েও ভয়ানক।

'আমরা কিসের ভুল বুঝেছি!' – আরো উত্তেজিত কণ্ঠে মারিয়া বলল – 'এখানে ভুল বোঝাবুঝির কিছু নেই। তোমরা তো এমন একটা জাতি, যেই জাতির সদস্যরা নির্বিচারে মানুষ খুন করে। সমগ্র বিশ্বে আজ যুদ্ধের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে যে জাতি, তাও তোমরা। তোমরাই আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদের হোতা হিসেবে খেতাব অর্জন করেছ। তোমাদের যিনি নেতা, যিনি তোমাদের ধর্মের প্রবর্তক, সেই মুহাম্মাদ পর্যন্ত মাত্র দশ বছরে ৮০টার মতো যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমাদের কাছে সুন্দর-মার্জিত আচরণ ঘুণাক্ষরেও আশা করা যায় না। যেখানে তোমাদের নেতাই সন্ত্রাসী, সেখানে তোমরা... ।'

'Stop Your mouth' বলে রুকাইয়া এমন একটা হাঁক দিল যে, ভয়ে মারিয়া ও জুলিয়ার প্রাণবায়ু বের হওয়ার উপক্রম হল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো রুকাইয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শুনছিল এবং সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য মনে-মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু মারিয়া যখন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিল, তখন আর সে স্থির থাকতে পারল না। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। যদি এরা বন্দী না হত, তাহলে এক্ষুনি ওদের এই উদ্যত আচরণের সমুচিত জবাব দিয়ে দিত। কিন্তু বন্দী বলে তা পারছে না। এ মুহূর্তে সে যে কী করবে, তাও ভেবে স্থির করতে পারছে না। তাই ধমক দিয়েই সে চুপ হয়ে গেল।

ভয়ে কাঁপছে বন্দিনীদ্বয়। দ্বিতীয় কোনো কথা বলা কিংবা রুকাইয়ার কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া কোনো কিছুই করতে পারছে না তারা। তাদের কণ্ঠ যেন বোবা হয়ে গেছে। দেহ যেন বিছানার সাথে জমে পাথর হয়ে গেছে।

এভাবে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। কক্ষময় বিরাজ করতে লাগল পিনপতন নীরবতা। রুকাইয়া হঠাৎ তার স্থান ছেড়ে দাঁড়িয়ে ঝড়ের গতিতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে যেন মারিয়া ও জুলিয়া দেহে প্রাণ ফিরে পেল। যেন যমদূতের লৌহকঠিন পাঞ্জা থেকে দ্বিতীয়বার জীবন ফিরে পেয়েছে। তাদের অপহরণ থেকে শুরু করে আজকের ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত তারা রুকাইয়াকে দেখে এসেছে শান্তশিষ্ট একটা সহজ-সরল বালিকারূপে। মুসলমানদের সম্পর্কে বর্বর ও হিংস্রতার বিশ্বাস লালন করলেও তারা রুকাইয়া ও মাহমুদার আচার-ব্যবহার দেখে তাদের ভাবছিল 'গোবরে পদ্মফুল'। কিন্তু এই মুহূর্তে রুকাইয়ার রুদ্রমূর্তি অবলোকন করে তাদের ধারণা পাল্টে গেল। তাদের পুরনো বিশ্বাসে নতুন হাওয়া লাগল 'সব মুসলমানই হিংস্র ও বর্বর'।

'এ তুমি কী করলে মারিয়া' – জুলিয়া মারিয়ার ডান হাতটা তার হাতের মধ্যে পুরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল – 'শান্ত বাঘিনীর লেজে পাড়া দিয়ে তাকে ক্ষিপ্ত করে তুললে? হায়! তোমার নির্বুদ্ধিতার কারণে হয়ত এখন কঠিনতর নির্যাতন সয়ে তারপর আমাদের মরতে হবে। হায়! আজ মরণেও শান্তি পাব না!'

'আমি ভুল করে ফেলেছি জুলি! আমাকে ক্ষমা করে দে বোন!' – মারিয়াও কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল – 'আমি বুঝতে পারিনি, আমার এতটুকু কথায় দস্যুরানী এত ক্ষেপে যাবে।'

'কথা এতটুকু নয় রে মারিয়া' – কান্না থামিয়ে জুলিয়া বলল – 'তুমি ওদের পুরো জাতিটাকে সরাসরি যেভাবে মন্দ বলেছ, তাতে আমরা এখনো যে জীবিত আছি এটাই ভাগ্যের ব্যাপার। জানি না, আর কতক্ষণ এই পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে পারব!'

'মুসলমানদের আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি' – মারিয়া বলল – 'তাই ওদের বিরুদ্ধে যখন কথা বলার সুযোগ এল, তখন নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না।'

'তুমি মুসলমানদের মন্দ বলেছ বলো, কিন্তু ওদের নবীকে সন্ত্রাসী বলতে গেলে কেন?' – জুলিয়া বলল – 'দেখলে না, ওদের জাতির বিরুদ্ধে যতক্ষণ কথা বলেছ, ততক্ষণ দস্যুরানী কিছুই বলেনি; কিন্তু যখনই ওদের নবীকে সন্ত্রাসী বলেছ আর অমনি সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে!'

'গির্জা তো আমাদের এই শিক্ষা-ই দিয়েছে' – মারিয়া বলল – 'তাছাড়া এ কথা তো ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ একজন সামান্য উটরাখাল থেকে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে নিজরাজ্যের পরিধি বৃদ্ধির জন্য মাত্র তেইশ বছরের নবুয়তী জীবনে ৮০টা যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ কি ভালো কাজ? আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী এ রকম যুদ্ধবাজ হন কী করে? এমন একজন যুদ্ধবাজ লোককে সন্ত্রাসী বলব না, তো কী বলব?'

মারিয়া দ্বিতীয়বার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্ত্রাসী বলায় জুলিয়া ভীত হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সে তার মুখটা চেপে ধরল। সে শঙ্কিত নয়নে ইতিউতি তাকাতে লাগল অন্য কেউ কথাটা শুনে ফেলল কিনা। তারপর তাকে উদ্দেশ করে সে ক্ষীণ আওয়াজে বলল, 'যিশুর দোহাই! তুমি এমন বেপরোয়া হয়ো না বোন। একটু সংযত হও। তুমি জান না, মুসলমানরা তাদের নবীর প্রেমে কেমন পাগল। তারা তাদের ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে তাদের নবীকে। নিজেরা তারা শত কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করবে, কিন্তু নবীর প্রতি সামান্য অসম্মান কিংবা অপমান তারা বরদাশ্‌ত করবে না। আমরা এদের ঘৃণা করতে পারি; কিন্তু তাদের এই সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা কখনই ঠিক নয়।'

'এসব তুমি কী করে জানলে জুলিয়া?' প্রশ্ন মারিয়ার।

'এই মাসখানেক আগে একটি উৎস থেকে আমি এগুলো জেনেছি' – জুলিয়া বলল – 'সেদিন আমাদের অফিসে এক মুসলিম ভদ্রলোক কাজ করতে এসে একটি বই টেবিলের উপর ফেলে রেখে যায়। সম্ভবত ভুলেই এমনটি হয়েছিল। বইটি আমি যত্নসহকারে রেখে দেই। বেশকিছু দিন পূর্বে কৌতূহলবশত আমি বইটি খুলে পড়তে লাগলাম। মাঝে-মাঝে কিছু ঘটনা আমাকে অবাক করত। আর তাহল মুসলমানদের নবীপ্রেম।'

'এক মুসলমানকে তাদের শত্রুরা হত্যা করতে নিয়ে গেল। সম্ভবত সেই লোকটির নাম জায়েদ হবে। হত্যার পূর্বক্ষণে জায়েদকে শত্রুদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'হে জায়েদ! তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি সত্যি করে বলো, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্দান কাটা হোক এবং তুমি পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস কর এটা কি তুমি পছন্দ করবে না?' তখন জায়েদ উত্তর করল, 'আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই থাকুন-না কেন, তাঁর পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি ঘরে বসে আরাম করি; এটা কখনো আমি সহ্য করব না।' শত্রুরা এই উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেল। তখন উক্ত প্রশ্নকারী বলে উঠল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীগণ তাঁকে যত ভালবাসেন, দুনিয়ার কোথাও আমি তার দৃষ্টান্ত দেখিনি।' তারপর সেই মুসলমানকে হত্যা করা হল।

'এমনিভাবে ওহুদের যুদ্ধ যখন মুসলমানদের বিপর্যয় নেমে আসে, তখন মুসলিমগণ তাদের নবীকে রক্ষা করতে জীবনপণ দাঁড়িয়ে যায়। আবুদুজানা নামক এক মুসলিম ঢালের মতো তাদের নবীকে আড়াল করে রাখে। এমতাবস্থায় যত তীর আসতে লাগল, সবই আবুদুজানার পিঠে বিদ্ধ হতে লাগল। জনৈকা আনসার মহিলার পিতা, ভাই ও স্বামী এ যুদ্ধে নিহত হয়। একের পর এক এই তিনটি শোকাবহ দুর্ঘটনার সংবাদ তার কানে এলে তিনি প্রত্যেকবারই জিজ্ঞেস করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলেন, তিনি কুশলেই আছেন। একথা শুনেও মহিলা আশ্বস্ত হলেন না। বরং তিনি কাছে এসে তাদের নবীকে দেখলেন এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, আপনার বর্তমানের সকল বিপদই অতি তুচ্ছ হে আল্লাহর রাসূল।'

'এসব ধর্মীয় কেচ্ছা-কাহিনী বই-পুস্তকের শোভাই কেবল বৃদ্ধি করে' – মারিয়া বলল – 'বাস্তবে এর না আছে কোনো সত্যতা, না আছে বিশ্বাসযোগ্যতা, আর না আমি এগুলো বিশ্বাস করি। সুতরাং তুমি চুপ করো। যা বলেছি তো বলেছি, যা হবার তা হবে; ও নিয়ে টেনশন করে লাভ নেই।'

'এগুলো আমাদের বিশ্বাস করা না করার কোনো বিষয় নয়' – জুলিয়া বলল – 'আমি শুধু বলছিলাম ওদের বিশ্বাস আর গোঁড়ামির কথা। তাছাড়া... ।'

কারো পায়ের শব্দ শুনে মারিয়া জুলিয়াকে চুপ করিয়ে দিল। উভয়ে উৎসুক নয়নে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রায় বিশ সেকেন্ডের ব্যবধানে কক্ষে প্রবেশ করল রুকাইয়া। তাকে দেখামাত্রই তাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। রুকাইয়ার পিছন-পিছন ট্রেহাতে প্রবেশ করল একজন খাদেমা। ট্রেতে কফি ও শরবত। ট্রেটা তাদের সামনে রেখে সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

'নাও! আগে গলাটা ভিজিয়ে নাও।' গম্ভীর কণ্ঠে রুকাইয়া বলল।

যেখানে বন্দিনীদের শাস্তি দেওয়ার কথা, তা না করে বরং তাদের শরবত আর কফি পানে আহ্বান জানানো হচ্ছে; বিষয়টা বড় দুর্বোধ্য ঠেকছে বন্দিনী মারিয়া ও জুলিয়ার কাছে। তাই তারা পান করার পরিবর্তে ভয়ার্ত নয়নে একবার রুকাইয়ার দিকে তাকাচ্ছে, একবার শরবত ও কফির দিকে তাকাচ্ছে। আবার পরস্পর চোখাচুখি করছে। তাদের ভাবগতি এমন যে, মনে হয় তাদের অপরাধের শাস্তি দিতে রুকাইয়া সবচেয়ে সহজ ও ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ– শরবত ও কফির নামে তাদের বিষ পান করতে দিয়েছে।

রুকাইয়া তাদের মানসিক অবস্থা আঁচ করতে পেরে বলে উঠল– 'তোমরা যা সন্দেহ করছ, তা সঠিক নয়। এ স্রেফ সাধারণ শরবত ও আরবীয় কফি। এগুলো পান করলে তোমাদের শরীর ও মন চাঙ্গা হবে। নাও; শুরু করো।'

রুকাইয়ার নির্দেশের পর বন্দিনীদের পান না করে উপায় ছিল না; যদি তা সত্যিকারের বিষয়ও হত। অগত্যা তারা পানীয়গুলো পান করল। কফিটা তাদের কাছে এত সুস্বাদু মনে হল, ইতিপূর্বে এমন সুস্বাদু কফি তারা পান করেছে বলে মনে হয় না।

পানপর্ব শেষ হলে রুকাইয়া বন্দিনীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলল– 'তোমরা আমাদের জাতিকে অসভ্য আখ্যা দিয়ে থাক; অথচ একটু ভেবে দেখো তো; তোমাদের সাথে এই মুহূর্ত পর্যন্ত যেসব আচরণ করেছি, তার মধ্যে সভ্যতাবর্জিত কোন আচরণটা আমরা করেছি? তোমরা আমার প্রাণপ্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অশালীন ভাষায় গালি দিয়েছ। তদুপরি তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে শরবত পান করতে দিয়েছি; মানে নিরাপত্তা দিয়েছি। একেও কি তোমরা অসভ্যতা বলবে?'

রুকাইয়ার প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মারিয়া বা জুলিয়া কেউই দিতে পারল না। উভয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে মাথা নত করে বসে রইল। তাদের চুপ করে থাকতে দেখে রুকাইয়া বলল– 'আমি জানতাম, তোমরা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। আর ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে তোমরা যে ধারণা পোষণ করছ, তাও তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। তোমাদের মধ্যে যারা গোড়া ধার্মিক, তারা নিজেদের বিদ্বেষপ্রসূত এই ধারণা প্রচার করে থাকে, যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুসন্ধান করে দেখো, তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে কত সুন্দর

ধারণা পোষণ করেন। তোমাদের অবগতির জন্য দু-একটি উপমা পেশ করা জরুরি মনে করছি, তোমরা বিরক্ত হবে না তো?'

'আমরা মোটেও বিরক্ত হব না' – জুলিয়া বলল – 'এগুলোই তো আমাদের জানা প্রয়োজন।'

'তাহলে শোনো' – রুকাইয়া বলল – 'তোমরা অবশ্যই বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ-এর নাম শুনে থাকবে। তার উক্ত হল– If a man link muhammad (sm) were to assume the dictatorship of the modern world. he would succeed in solving its ·problems that would bring it the much meeded peace and happiness অর্থাৎ, আজকের বিশ্বে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো যদি কেউ নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হতেন এবং এর ফলে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হত।'

'অন্য একজন দার্শনিক বলেন–

philosopher, orator, apostle, legisilator, warrior, congueror of a cult without imagers the founder of taenty trrestrial empires, that is muhammad (sm). as regards all standards by which homan greatmess may be measured, we may well ask, is there any greater than he? (lamartine, historic de a turquie paris 1858, vol 11. pp. 276-277)

অর্থাৎ, দার্শনিক, বক্তা, পয়গম্বর, আইন প্রণেতা, বোদ্ধা, ভাবের বিজেতা, যুক্তিবাদী ধর্মমতের প্রত্যার্পণদাতা, একটি দেবতাহীন ধর্ম-পদ্ধতি; পার্থিব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যত মাপেই মানব-মাহাত্ম্য বিবেচনা করা হোক-না কেন, আমরা হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারি, কোনো মানুষ কি আছে তাঁর থেকে আরও মহান?'

'উপরোক্ত উক্তি দুটি এমন দুজন চিন্তাশীল মনীষীর, যারা পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্র বড় ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। এ সকল জ্ঞানীদের বক্তব্য দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তোমাদের সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ অসার ও বাতিল হয়ে গেল। শুধু মনীষীদের বাণী দিয়েই তোমাদের অভিযোগ আমি খণ্ডন করতে চাই না। বাস্তব প্রমাণও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' বলেই রুকাইয়া বিশ্বের যুদ্ধসংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান তাদের সম্মুখে তুলে ধরল। যার সারসংক্ষেপ এই–

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাদানী জীবনের মাত্র ১০ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে কমপক্ষে ৮০টি যুদ্ধ করে অশান্ত আরবে একটি প্রকৃত কল্যাণময় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর দশ বছরের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে দৈনিক গড়ে প্রায় ২৭৪ বর্গমাইল এলাকা ইসলামের অধীনে এনেছেন।

অথচ এই ৮০টি যুদ্ধে জীবনহানির হিসাব নিলে দেখা যায়, গড়ে প্রতি মাসে মাত্র ১০জন লোক নিহত হয়েছেন। তবে সময় ১০ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই ১০ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা ইসলামের পদানত হয়েছে। নবীযুগের সকল শহীদ, নিহত, আহত এবং কারাবন্দীর সংখ্যা নিম্নরূপ–

মুসলমানদের বন্দি ১ জন, আহত ১২৭ জন, শহীদ ২৫৯ জন, মোট ৩৮৭ জন। অপর পক্ষে কাফের, ইহুদী, খৃস্টান ও পৌত্তলিক বিরোধী দলের বন্দি ৬৫৬৪ জন, আহত নেই, নিহত ৭৫৯ জন, মোট ৭৩৩২ জন। এতে উভয়পক্ষের মোট সংখ্য দাঁড়ায় বন্দি ৬৫৬৫ জন, আহত ১২৭ জন, নিহত ১০৭৮ জন, সর্বমোট ৭৭১০ জন। এর মধ্যে ৬৫৬৪ জন বন্দি থেকে ৬৩৪৭ জনকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। পূর্ব অপরাধের প্রেক্ষিতে মাত্র ২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বাদ বাকি বন্দিদের শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়।

অপরদিকে তথাকথিত মানবতা ও সভ্যতার ধ্বজাধারী পশ্চিমা গোষ্ঠীর যুদ্ধের ইতিহাস দ্বারা বোঝা যায় ওদের পরিচালিত মাত্র ২টি যুদ্ধের পরিসংখ্যান থেকে। প্রথমটির স্থায়িত্ব ছিল ১৯১৪-১৯১৮ সাল, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামে খ্যাত। আর দ্বিতীয়টির স্থায়িত্ব ছিল ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে ২৭ এপ্রিল ১৯১৯ সালের 'হামদাম' পত্রিকা নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। রাশিয়ার ১৭ লাখ, জার্মানের ১৬ লাখ, ফ্রান্সের ১৩ লাখ ৭০ হাজার, ইতালি ৪ লাখ ৬০ হাজার, অস্ট্রেলিয়ার ৮ লাখ, বৃটেনের ৭ লাখ ৬ হাজার, তুর্কি ২ লাখ ৫০ হাজার, বেলজিয়ামের ১ লাখ ২ দুই, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া ও মোলিনিরগোর ১ লাখ করে মোট ৪ লাখ, আমেরিকার ৫০ হাজার, সর্বমোট ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার। ভারত, ফ্রান্স এবং বৃটেনের উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর হিসাব এর বাইরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের মধ্যে শুধু জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমায় ১ কোটি ৫০ লাখ লোক নিহত হয়। আফ্রিকায় অক্ষশক্তি ৯ লাখ ৫০ হাজার মানুষ হত্যা করে। সৈন্য হারায় ৮ হাজার। যুদ্ধাস্ত্র ক্ষয় ২৫ লাখ টন। সিসিলিতে অক্ষশক্তি হারায় ১ লাখ ৬০ হাজার মিত্র সৈনিক। হিটলার হারায় ২২ হাজার সৈনিক। হিটলার ওয়ারশতে হত্যা করে ৫ লাখ। বন্দিশিবিরে হত্যা করে ৩ লাখ ১০ হাজার। বিদ্রোহী ইহুদী হত্যা করা হয়েছে ৬ হাজার।'

পরিসংখ্যানটি দেখানোর পর বন্দিনীদ্বয়কে উদ্দেশ করে রুকাইয়া বলল– 'মিস জুলিয়া ও মারিয়া! দুই পক্ষের দুই ধারার যুদ্ধের পরিসংখ্যান তোমরা দেখলে। তাতে কী মনে হল? তোমাদের সকল যুদ্ধের কথা বাদ দিয়ে মাত্র দুটা যুদ্ধের কথা একটু চিন্তা করে দেখ, বিরতিহীন দীর্ঘ সময় ধরে চলা অসংখ্য বনি আদমের প্রাণ হরণকারী এ যুদ্ধ মানবতার কোনো উপকারের জন্য করা হয়েছিল কিনা? হয়নি। হয়েছে আত্ম-অহমিকা আর হিংসা-বিদ্বেষ ও আধিপত্যের লড়াইকে কেন্দ্র করে। আর এজন্যই এত অধিকসংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।'

'এবার একটু খোলা মনে ভেবে দেখো তো, তোমরা যাকে আখ্যায়িত কর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবাজ নেতা হিসেবে, যিনি মাত্র ১০ বছরে ৮০টি যুদ্ধ করেছেন, আর ৮০টি যুদ্ধে মানুষ মরেছে মাত্র ১০১৮ জন; তিনি কি সন্ত্রাসী ছিলেন? নাকি সন্ত্রাস নির্মূলের অধিনায়ক ছিলেন? তিনি কী যুদ্ধবাজ ছিলেন, না যুদ্ধ নির্মূলের কারিগর ছিলেন?'

'আসলেই আমরা এত দিন বোকার স্বর্গে বাস করছিলাম' – জুলিয়া সোৎসাহে বলল – 'আমি ভেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছি, ৮০টি যুদ্ধে মাত্র ১ হাজার ১৮ জন লোক নিহত হয়েছে। একে যুদ্ধ না বলে অন্য কোনো সম্মানজনক নামে অভিহিত করা উচিত।'

এ পর্যায়ে মারিয়া তার বসার স্থান থেকে উঠে রুকাইয়ার কাছে গিয়ে তার হাত দুটো ধরে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল– 'রুকাইয়া! আমি না জেনে তোমাদের এমন মহান নবীকে সন্ত্রাসী বলেছি, যুদ্ধবাজ বলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও বোন।'

রুকাইয়া তাকে টেনে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। জুলিয়াও এসে ক্ষমা চাইল রুকাইয়ার কাছে। রুকাইয়া তাকে বুকে টেনে নিল। তারপর তাদেরকে কাছে বসিয়ে নবীজীবনের বিভিন্ন কাহিনী, ইসলামের সৌন্দর্যময় দিকগুলোর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে লাগল। তারা এই মধুর কাহিনী যতই শোনে, ততই শ্রবণপিপাসা যেন বেড়ে যেতে লাগল।

এ ঘটনার পর তারা রুকাইয়ার কাছে প্রায় সব সময়ই ইসলামের কাহিনী শোনার বায়না ধরে বসে। রুকাইয়া যেন তাদের কতকালের পরিচিত আপনজন, তাই তার সঙ্গ তারা ছাড়তে চায় না। রুকাইয়াকে না পেলে কিংবা সে কোনো কাজে বাইরে গেলে তাদের এ আবদার পূরণ করতে হয় মাহমুদা কিংবা সালমাকে অথবা অন্য কাউকে। অর্থাৎ– বন্দিনীদ্বয়ের বন্দিজীবন যেন পরিণত হয়েছে ইসলাম শিক্ষার আসলে। সেই সাথে এখানকার তরুণী মুজাহিদদের সাথে গড়ে উঠেছে এক নিবিড় সম্পর্ক। তাদের দেশমুক্তির লড়াইয়ের যৌক্তিকতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তাদেরও ইচ্ছা করছে এ লড়াইয়ে শরীক হতে।

দেখতে-দেখতে সাতটা দিন পেরিয় গেল। এরই মধ্যে বন্দিবিনিময়ের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। যে ব্যাপারে বন্দিনীদ্বয়ের কিছুই জানা নেই। তারা মুজাহিদ তরুণীদের সাথে মিলেমিশে মহাসুখে দিনাতিপাত করছে; যেন তারা স্বর্গে বিচরণ করছে। বন্দিবিনিময়ের সকল কিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর মুক্তির ঘণ্টাখানেক আগে তাদেরকে জানানো হল বিষয়টি। কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে হবে একথা শুনেই তারা কান্না জুড়ে দিল।

অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল রুকাইয়া। সে তাদের অনেক বোঝাল। অবশেষে তারা এই শর্তে রাজি হল যে, সপ্তাহে অন্তত একবার তাদেরকে এখানে আসার অনুমতি দেওয়া হবে। রুকাইয়া শর্ত মেনে নিল। বেলা ঠিক ১১টায় তাদেরকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হল।

পাঁচ.

'কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজোর পাষাণ বেদী!...
লাথি মার ভাঙ্ রে তালা!
যত সব বন্দিশালা
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি ।'

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চির বিদ্রোহী এ গান বিশ্বের সকল প্রান্তের অধিকারবঞ্চিত-নিরপরাধ সকল কারাবন্দির গান । কেননা, জালিমদের চেহারা যুগে-যুগে পরিবর্তিত হলেও তাদের অত্যাচার-নিপীড়ন আর আগ্রাসনের কৌশল যেমন অভিন্ন, তেমনি অত্যাচারিত মজলুমরাও যে যেখানে হোক, তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কৌশল ও ভাষাও প্রায় অভিন্ন । আমাদের নজরুল কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তৎকালীন আগ্রাসী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কবিতা লিখে । আর বাগদাদের ঈগল কারারুদ্ধ হয়েছিল আগ্রাসী মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে । বৃটিশরা যেমন নজরুলকে বেশি দিন আটকে রাখতে পারেনি; তেমনি বাগদাদের ঈগলকেও মার্কিন বাহিনী বেশি দিন আটকে রাখতে পারল না । তাই দুনিয়ার সকল মজলুমকে আজ নজরুলের কণ্ঠে গাইতে হবে–

'ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা!
দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদ গুলা
জোরসে ধরে হেচকা টানে!
মার হাঁক্ হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক্
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে... ।'

◆ ◆ ◆

অবশেষে মুক্ত হল ঈগল । নিজের মুক্তির মতো স্বদেশকে কবে মার্কিন হানাদারদের বিষাক্ত থাবা থেকে মুক্ত করবে সেই চিন্তাই এখন বাগদাদের ঈগলের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে । এজন্য জেলখানা থেকে বের হয়ে একটা দিনও সে বিশ্রামে কাটাল না । রুকাইয়া অনেক বলেছিল অন্তত দুটা দিন বিশ্রামে থাকতে । কিন্তু তাঁর একটাই কথা, যে দিন মার্কিনিদের সমূলে ইরাকছাড়া করতে পারবে, সে দিন বিশ্রাম নিবে অথবা শহীদ হয়ে কবরে গিয়ে বিশ্রাম নিবে ।

‘রুকাইয়া! তুমি তো আমার মুক্তির ব্যবস্থা করলে, কিন্তু যেজন্য আমি কারাগারে প্রবেশ করেছিলাম, তার তো কিছুই হল না।’ মুক্তির চার দিন পর ঈগল দ্বিতীয়বার রুকাইয়ার সাথে সাক্ষাত করতে এসে বলল।

‘ভাইয়া! তুমি কী উদ্দেশে জেলখানায় ঢুকেছিলে, তা আমার অজানা’ – রুকাইয়া বলল – ‘আমি শুধু জানি, তুমি গ্রেফতার হয়েছ। কিন্তু কেন, কি্ভাবে, তা আমার কিছুই জানা নেই। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ।’

‘আসলে তা তোমার জানার কথাও নয়’ – ঈগল বলল – ‘কেননা, তুমি তখন নিখোঁজ ছিলে।’ তারপর ঈগল মার্কিনিদের হাতে বন্দি শারজা রেজা ও তার মুক্তির লক্ষ্যে তার পিতার আত্মাহুতিসহ বিস্তারিত ঘটনা রুকাইয়াকে খুলে বলল।

শারজার কাহিনী শুনে রুকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং ঈগলকে লক্ষ্য করে বলল– ‘ঈগল ভাইয়া! শারজা আমার কলেজবান্ধবী ছিল। খুব ভালো মেয়ে ছিল। তার স্মৃতি মনে পড়লে আমার বুক ভেঙে কান্না আসে।’ এতটুকু বলে রুকাইয়া থেমে গেল।

ঈগল রুকাইয়ার ভারাক্রান্ত হওয়ার কারণ বুঝতে পারল না। তাই তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হল বোন! শারজার প্রসঙ্গে তুমি নিস্প্রভ হয়ে গেলে কেন?’

‘শারজা যে মুক্ত হয়ে এসেছে ভাইয়া!’

‘তার মানে!’

‘গত মাসের ৬ তারিখ মার্কিনিরা তাকে চিরমুক্তি দিয়ে সারাফিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায়’ – অশ্রুসিক্ত নয়নে রুকাইয়া বলল – ‘আমরা একটা অপারেশন থেকে ফেরার পথে রাস্তার পাশে লাশ দেখে গাড়ি থামাই। লাশের কাছে গিয়ে দেখি, আমার প্রিয় সঙ্গিনী শারজা রেজা। তার সমগ্র শরীরে নির্যাতনের অসংখ্য চিহ্ন ছিল। পরে লাশটি আমরা তাদের এলাকায় নিয়ে যাই এবং তার পড়শীদের সহায়তায় দাফন সম্পন্ন করি।’

শারজার করুণ পরিণতি শুনে ঈগল কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল। তারপর কাউকে কিছু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রুকাইয়া তাকে ডাকতে গিয়েও আবার চুপ হয়ে গেল। কারণ, তার জানা আছে, ঈগল কোথাও রওনা দিলে বা কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে কেউ তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। সে শুধু তার গমনপথের দিকে নির্বাক চেয়ে রইল।

মিনিটদশেক পরই ঈগল ফিরে এল। রুকাইয়া তখনও সেই একই স্থানে উপবিষ্ট। ঈগলকে ফেরত আসতে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। ঈগল ঘরে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করল, ‘রুকাইয়া! রাহাত কোথায়? ওকে দেখলাম না যে?’

‘আমি ছিলাম নিখোঁজ, তুমি ছিলে জেলে আর আব্বাজান সারা দিন অভিযান-অপারেশন নিয়ে থাকেন ব্যস্ত, এমতাবস্থায় বেচারা রাহাত সম্পূর্ণ একা হয়ে...’ – রুকাইয়া বলল – ‘আব্বাজান তাই ওকে অরফ্যানেজ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা সমস্যা ভাইয়া... ।’

রুকাইয়া তার কথা শেষ না করেই থেমে গেল। ঈগল তখন কী সমস্যা তা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রুকাইয়া বলল, 'ঈগল ভাইয়া! সমস্যা যা-ই হোক তোমাকে বলব। কিন্তু তার আগে তোমাকে হাত-পা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে নিতে হবে।'

'খানা পরে খেলেও চলবে বোন!' – ঈগল বলল – 'আগে বলো সমস্যাটা কী? আমার টেনশন মাথায় আবার থাকলে খাবার হজম হয় না।'

'তুমি আগে খেয়ে নাও ভাইয়া! তারপর সমস্যাটা বলছি। তাহলে টেনশন কমে গিয়ে খাবার হজম হতে থাকবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে খাবার নিয়ে আস।' ঈগল বলল।

রুকাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে ঈগলের জন্য খাবার নিয়ে এল। খাবার খেতে-খেতে ঈগল বলল, 'রুকাইয়া! আল্লাহ নারীদের মধ্যে এমন একটি দরদী মন দিয়ে রেখেছেন, যার কোনো তুলনা হয় না।'

'সেটা কেমন ভাইয়া?'

'বুঝলে না' – ঈগল বলল – 'নারী হল মায়ের জাতি। আর সন্তানের প্রতি মায়ের যে দরদ-ভালবাসা, তার কি কোনো তুলনা হয়? সন্তানের কখন কী প্রয়োজন, তা মা যেভাবে অনুধাবন করতে পারে, তা পারে না পৃথিবীর অন্য কেউ। তুমি নারী, মায়ের জাতি। তোমার মধ্যেও তাই এ গুণটি বিদ্যমান।'

'আমি ভাবতাম, ঈগল ভাই বুঝি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বোঝে না' – রুকাইয়া হেসে বলল – 'এখন দেখছি দার্শনিক তত্ত্বও বোঝে। তা আমার মধ্যে এ মুহূর্তে মাতৃজাতির কোন গুণটা দেখলেন দার্শনিক সাহেব?'

'ধুত্তুরি পাগলি! দার্শনিক না ছাই' – ঈগলও হেসে বলল – 'আমি যেটা বলতে চেয়েছি, তা হল, ক্ষুধা লেগেছে আমার, খাবার চাওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু কাজের ব্যস্ততা আর বিভিন্ন টেনশনে তা একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি নারী বিধায় বুঝতে পেরেছ, আমার এখন ক্ষুধা পেয়েছে; খাওয়া প্রয়োজন। এটা ঐ মায়ের দরদেরই অংশ।'

ঈগলের উত্তর শুনে রুকাইয়া আর কোনো কথা বলল না। সে তার কথার চেয়ে তার হাসিটা দেখে চমৎকৃত হল। কেননা, কত দিন পর যে ঈগল আজ হেসেছে, সেই হিসাব হয়ত সে নিজেও রাখেনি। মার্কিন হানাদাররা ইরাকিদের স্বাধীনতা তো কেড়ে নিয়েছেই, সেই সাথে তাদের আনন্দ-হাসিও কেড়ে নিয়েছে। ইরাকে আজ দুর্লভ বিষয়াবলির মধ্যে অন্যতম হল 'হাসি'। এখানের বিখ্যাত মিউজিয়ামে খুঁজেও আপনি হাসির আভা দেখতে পাবেন না। তবে হ্যাঁ, যাদুঘরে না পেলেও মাঝে-মধ্যেই আপনি কিছু নির্দিষ্ট স্থানে হাসির দেখা পাবেন। শুধু হাসিই নয়, ওসব স্থানে আপনি হাসির বন্যা দেখতে পাবেন। এ হল ধ্বংস-সুখের হাসি। এ হাসির খলনায়করা হল ইতিহাসের চিহ্নিত গাদ্দার, মীর জাফরদের প্রেতাত্মা। যারা নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিয়েছে ভিনদেশী হানাদারদের হাতে, তারা আপন বোন-কন্যা-মায়েদের

ইজ্জতের বিনিময়ে এ হাসি খরিদ করেছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা, আরবীয় ঐতিহ্য-আভিজাত্যের মতো মূল্যবান সম্পদ দিয়ে খরিদ করেছে এই সস্তা হাসি। কিন্তু এই হাসির অন্তরালে তাদের জন্য যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক কান্না অপেক্ষা করছে, সে সত্য তাদের কে বোঝাবে? কেউ যদি দরদ নিয়ে বোঝাতে আসে, তাও তারা বুঝবে না। কারণ, এরা কাপুরুষ, এরা জ্ঞানপাপী।

'আচ্ছা ঈগল ভাইয়া! শত্রু আমাদের দেশকে যেভাবে অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরেছে, তাতে মনে হয় না, ওরা অতি অল্প সময়ে এ দেশ থেকে চলে যাবে, এটা তুমিই আমাদের বলে থাক' – প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে রুকাইয়া অন্য একটি বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করল – 'কিন্তু ওদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে আমাদের লড়াই চলতে থাকবে শেষ দিনটি পর্যন্ত। এ যুদ্ধের সৈনিক তুমি-আমি অর্থাৎ প্রতিটি দেশপ্রেমিক ইরাকি। তারপরও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বলে একটা কথা আছে না...।'

'আরে, তুমি কী বলতে চাও; সোজাসুজি বলে ফেল আপামণি!'

'কথাটা বললে তুমি রাগ করবে না তো আবার?' রুকাইয়ার মনে সংশয়।

'এ মুহূর্তে তুমি যা বলতে চাও বল'– ঈগল বলল– 'আমি মোটেই রাগ করব না। ওয়াদা করলাম।'

'এবার তুমি একটা বিবাহ করে ফেলো ভাইয়া' – রুকাইয়া ঈগলের আশ্বাস পেয়ে বলল – 'তোমার সুখে-দুঃখে একান্ত সাথী হতে একজন লোক তোমার কাছে থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া তোমার অনুপস্থিতিতে আরেকটা ঈগল...।'

'থাক; আর বলতে হবে না; আমি বুঝতে পারছি বোন!' – ছোট বোনের কাছে নিজের বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে ঈগল তাকে বাধা দিয়ে বলল। সহসা তার হৃদয়পটে ভেসে উঠল সুমাইয়া আফরোজের স্মৃতিগুলো। অন্যমনস্ক হয়ে সে ভাবতে লাগল তার কথা। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল তার নাঈমার কথা। এ দুজনের কথা ভাবতে গিয়ে তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

'আরে-আরে, ভাইয়া আমার বিবাহের কথা শুনে একেবারে খাবার খেতেও ভুলে গেছে।' ঈগলকে অন্যমনস্ক হতে দেখে টিপ্পনি কেটে বলল রুকাইয়া।

'রুকাইয়া! তুমি খুব দুষ্ট হয়ে গেছ' – লাজুক ভঙ্গিতে মাথাটা নিচু রেখে ঈগল বলল – 'আমি ভাবছিলাম সুমাইয়া আফরোজের কথা। তার ব্যাপরটা তো তুমি জান।' ঈগলের কণ্ঠ ভারী হয়ে এল।

'আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করে দাও ভাইয়া।' রুকাইয়া হাত জোড় করে বলল।

'হায়রে পাগলী! এজন্য মাফ চাওয়ার কী আছে' – ঈগল তাকে আশ্বস্ত করে বলল – 'তোমাকে আজ একটা গল্প বলব। তবে তার আগে রাহাতের ব্যাপারটা বলো তো; ওর কী সমস্যা।'

'ওটা কোনো জটিল সমস্যা নয় ভাইয়া!' – রুকাইয়া বলল – 'তুমি আগে গল্পটা-ই বলো। তারপর রাহাতের সমস্যার কথা বলছি।'

ঈগল রুকাইয়ার কাছে নাঈমার সাথে পরিচয় থেকে নাঈমাকর্তৃক অগ্রগামী হয়ে তাকে ভালবাসার প্রস্তাব দেওয়াসহ সকল ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে রুকাইয়া বলল, 'তাহলে আর ভাবাভাবি নয় ভাইয়া! কনে হিসেবে নাঈমাকেই তোমার চূড়ান্ত করতে হবে। আমি এ ব্যাপারে আব্বাজানের সাথে আজই কথা বলব।'

'রুকাইয়া! এত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই' – ঈগল বলল – 'আগে আমি নাঈমার সাথে দেখা করে নিই; তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

'আচ্ছা, তুমি নিষেধ করলে আর এখনই আমি আব্বাজানকে কিছু বলছি না' – রুকাইয়া বলল – 'তুমি তাহলে আজই নাঈমা আপুর সাথে দেখা করে তার মতামত জেনে নাও। আর তুমি যদি তাকে বলতে লজ্জাবোধ কর, তাহলে আমাকে সাথে নিয়ে চলো।'

'তোমাকে আজ নেব না' – ঈগল বলল – 'আজ আমি দেখা করে আসি। তোমাকে অন্য দিন নেব। তুমি এখন রাহাতের ব্যাপারটা খুলে বলো।'

'রাহাতকে অরফ্যানেজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করার পর সে পড়াশোনা ভালোই করছিল' – রুকাইয়া বলল – 'কিন্তু ইদানিং সে সবকিছু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ শুধু কেঁদে চলছে। কদিন আগে আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু কান্না থামাতে পারিনি। সাথে করে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। তাও আসবে না। এখানে আসতে নাকি তার ভয় হয়। শুধু বলল, নানার বাসায় যাবে। জিজ্ঞেস করলাম, নানার বাসা কোথায়? যেখানকার কথা বলল, সেখানে নিয়ে যাওয়া তো সহজ নয়!'

'কোথায় তার নানার বাসা?' – ঈগল জিজ্ঞেস করল – 'যেখানে যাওয়া তুমি কঠিন মনে করছ?'

'রাহাতের নানার বাসা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে।' রুকাইয়া বলল।

এবার ঈগল একটু চিন্তায় পড়ে গেল। কিছু সময় মৌন থাকার পর বলল, 'বর্তমানে সিরিয়া যাওয়া একটু কষ্টকরই বটে। আচ্ছা, দেখা যাক কোনো পন্থা বের করতে পারি কিনা। আমি এখন রাহাতের কাছে যাচ্ছি। ওর সাথে দেখা করে নাঈমার ওখানে যাব।'

♦ ♦ ♦

'তুমি কে বাবা? তোমাকে তো চিনলাম না' – মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা গেট খুলে ঈগলকে দেখে বলল – 'তুমি কাকে চাচ্ছ?'

'এটা জাফর মুসা সাহেবের বাসা না?' ঈগল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, এটা জাফর সাহেবের বাসা' ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন – 'তবে উনি এখন বাসায় নেই।'

'আচ্ছা, তাঁর কন্যা জান্নাতুন নাঈমা বাসায় আছে?' ঈগল আবার প্রশ্ন করল। তবে এ প্রশ্নটি করতে গিয়ে লজ্জায় সে ঘেমে উঠল।

এবার ভদ্রমহিলা কিছুটা বিরক্ত হলেন। তিনি খানিক চড়া গলায় বললেন, 'আশ্চর্য যুবক তো তুমি! তোমাকে আমি তোমার পরিচয় জিজ্ঞেস করছি। পরিচয় না দিয়ে তুমি আমাকে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করছ। তোমার আর কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। এবার তুমি যেতে পার।' বলেই তিনি গেট বন্ধ করে দিলেন। ঘরে যেতে-যেতে তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন, 'যতসব জঞ্জাল এসে সন্ধ্যাবেলা উৎপাত শুরু করেছে। যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে এমনিতেই জীবনে শান্তি নেই; তার মধ্যে আবার উটকো ঝামেলা এসে হাজির হয়... ।'

সালেহা বেগম তার কথা শেষ করতে পারলেন না। এরই মধ্যে পাঁচ তলার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতগতিতে নেমে এল নাঈমা। মা-মেয়ে মুখোমুখি হতেই থেমে গেলেন তিনি। নাঈমা তার মায়ের শেষ কথাটির রেশ ধরে জিজ্ঞেস করল, 'আম্মাজান, কিসের ঝামেলা? গেটে কে এসেছিল?'

'আরে কোথাকার কোন এক যুবক' – সালেহা বেগম বললেন – 'তা তুমি জানলে কী করে মা-মণি?'

'আমি ছাদে ছিলাম আম্মাজান' – নাঈমা বলল – 'সেখান থেকে দেখেছি, গেটে তোমার সাথে কে যেন কথা বলছে। লোকটিকে আমার কেমন পরিচিত মনে হয়েছে। অন্ধকারটা গাঢ় হয়ে আসায় পুরোপুরি ঠিক করতে পারিনি। তোমাকে উনি কী পরিচয় দিলেন।'

'সেজন্যই তো আমার মাথাটা গরম হয়েছে' – সালেহা বেগম বললেন – 'আমি পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, এটা কি জাফর মুসা সাহেবের বাড়ি? আমি বললাম, হ্যাঁ; তবে তিনি বাড়ি নেই। আবার জিজ্ঞেস করল, তার কন্যা জান্নাতুন নাঈমা আছে? একথা শুনেই তো আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল। যত সব... ।'

'কী বললে আম্মিজান! উনি আমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন?' নাঈমা তার আম্মাজানের কথা শুনে চমকে উঠে বলল– 'তার মানে আমাকে উনি চেনেন? তাহলে আমি যাকে ধারণা করেছিলাম, এ লোক তিনিই হবেন। তুমি উনাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভুল করেছ আম্মিজান।' বলেই নাঈমা দৌড়ে গেটের দিকে গেল। সালেহা বেগম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নাঈমার মা গেট খুলে আবার গেট বন্ধ করে দেওয়ার পর ঈগল সেখানে দাঁড়িয়েই ভাবল, আরেকবার তাকে ডেকে সরাসরি পরিচয়টা দেবে কিনা? আবার ভাবল, তাতে তিনি আরো ক্ষেপে যেতে পারেন। এভাবে খানিক সময় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এদিকে মাগরিবের সময়ও যায়-যায় অবস্থা। তাই দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠল এবং মসজিদের উদ্দেশে গাড়ি ছোটাল।

নাঈমা গেট খুলে বের হয়ে দেখল, ঈগল গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। এবারও সে তাকে পুরোপুরি দেখেনি। তবে সে মোটামুটি নিশ্চিত লোকটি ঈগলই। তাই সে

'ঈগল ভাইয়া' বলে ডাক দিল। কিন্তু গাড়ির গ্লাস বন্ধ থাকায় তার ডাক ঈগলের কানে পৌঁছেনি। নাঈমা তাড়াতাড়ি গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ঈগলের পিছু নিল। সালেহা বেগম মেয়েকে বাধা দিতে গিয়ে আবার কেন যেন বাধা দিলেন না।

নাঈমাকে বেশি দূর যেতে হল না। ঈগল মাইলখানেক দূরত্বে গিয়ে একটি মসজিদের সামনে গাড়ি রেখে নামায পড়তে ঢুকল। নাঈমা তার গাড়িটা ঈগলের গাড়ির সামনে প্রায় লাগিয়ে রাখল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাত থেকে দুটো ইট কুড়িয়ে আনল। ইটদুটো ঈগলের গাড়ির পিছনের চাকার নিচে দিয়ে রাখল আর নিজে একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল।

ঈগল নামায পড়ে বের হল। গাড়ির কাছে এসে দেখল, তার গাড়ির সামনে আরেকটা গাড়ি রাখা। সে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল। তারপর বের হওয়ার জন্য গাড়ি পিছনে টার্ন নিল।

কিন্তু গাড়ি তো পিছনে যাচ্ছে না। ব্যাপারটা দেখার জন্য গাড়ি থেকে নামল এবং পিছনে গেল। কিন্তু কিছুই সে দেখল না। গাড়ির পিছন দিক অন্ধকার থাকায় ইটদুটো তার নজরে পড়েনি। সে ভেবে পাচ্ছে না, ঘটনাটা কী ঘটল। ভাবল ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হল কিনা। তাই ইঞ্জিন কাভার খুলে ইঞ্জিন চেক করতে লাগল।

ঠিক সে মুহূর্তে একটা পিস্তলের অগ্রভাগ তার মাথার পিছন অংশ স্পর্শ করল। সেই সাথে নির্দেশ এল– 'একটুও এদিক সেদিক করলে সাথে-সাথে এই পিস্তলের গুলি তোমার মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে।'

'কী চাও তুমি?' শান্তভাবে ঈগল প্রশ্ন করল। তার ভাবখানা এমন, যেন কিছুই হয়নি। অবশ্য আক্রমণকারীর কণ্ঠস্বরেই সে বুঝে নিয়েছে, মানুষটা মহিলা। পুরুষ হলেও চিন্তা ছিল না। কারণ, এদের শায়েস্তা করার কৌশল তার জানা আছে।

'তুমি কে?' – আক্রমণকারী বলল – 'পরিচয়টা দিলেই ছেড়ে দেব।'

'আমার পরিচয় দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন?' প্রশ্ন ঈগলের।

'প্রয়োজন যা-ই থাকুক তা তো তোমাকে বলা যাবে না' – আক্রমণকারী বলল – 'তুমি ভালোয় ভালো পরিচয়টা বলে দাও; নইলে গুলিটা কিন্তু চালালাম।'

আক্রমণকারী এ কথা বলার সাথে-সাথে ঈগল চট করে তার হাতদুখানা ধরে ফেলল। হাতে একটু চাপ দিতেই পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল। এবার তার হাত ধরা অবস্থায়ই ঈগল ঘুরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সে হতভম্ব হয়ে গেল। নাঈমা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। ঈগল বলল, 'আশ্চর্য মেয়ে তো তুমি! আমার পরিচয় জানতে এই নাটক করার দরকার কী ছিল? সামনা-সামনি জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে।'

'নাটক না করে কি আমার উপায় ছিল?' – নাঈমা বলল – 'এটা করতে হল আপনার জন্যই। আপনি যদি গেটে আম্মাজানের কাছে পরিচয়টা দিতেন, তাহলে আমার এই নাটক করতে হত না। আচ্ছা, যা হবার হয়েছে। আল্লাহর শোকর যে, আপনাকে পেয়েছি। এখন বাসায় চলুন। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, অনেক সময় হয়েছে। এখন আর রাস্তায় থাকা নিরাপদ নয়।'

'আমার গাড়িটা পিছন টার্ন নিচ্ছে না। হয়ত কোনো সমস্যা হয়েছে' – ঈগল বলল – 'তোমার গাড়িটা আগে সরাও। আমারটা সামনের দিকেই বের করতে হবে বোধহয়।'

'আপনার গাড়ির কিছুই হয়নি।' বলেই নাঈমা গাড়ির চাকার নিচ থেকে ইটদুটো সরিয়ে ফেলল।

'হায়রে দুষ্ট! ভালো নাটকই তো এঁটেছিলে।' ঈগল তার কাণ্ড দেখে বলল।

অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বাড়িতে পৌছে গেল। সালেহা বেগম কন্যার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিলেন। তাকে কাছে পেয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু সাথে ঈগলকে দেখে কিছুটা বিরক্ত হলেন। নাঈমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, 'আম্মিজান! এত দিন যাকে একনজর দেখার জন্য তুমি বেকারার ছিলে, এই হল সেই ঈগল। আমাদের গর্বের বাগদাদের ঈগল।'

ঈগলের পরিচয় পেয়ে সালেহা বেগম যারপরনাই বিস্মিত হলেন। ঈগল এগিয়ে গিয়ে তাকে সালাম করল। তিনি বললেন, 'বেটা! আমি তোমার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো... ।'

ঈগল সালেহা বেগমকে বাধা দিয়ে বলল, 'চাচি! আমি আপনার ছেলের মতো আর আপনি আমার মায়ের মতো। মা কোনো দিন সন্তানের কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন না। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। প্রথমেই আপনাকে আমার পরিচয় না দিয়ে ভুলটা আমিই করেছি। সেই হিসেবে আপনি বরং আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

'আসলে মূল ভুলটা করেছি আমি' – নাঈমা বলে উঠল – 'প্রথমবার যখন ঈগল ভাইয়া আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমার উচিত ছিল, তখন আম্মিজানের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু আম্মিজানের শরীরটা সে সময় খারাপ থাকায় এবং তিনি তখন পঞ্চম তলায় অবস্থান করায় সেটা হয়নি। এজন্য আপনাদের দুজনের কাছেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা কি ক্ষমা করবেন আমাকে?'

নাঈমার এমন কথায় ঈগল ও সালেহা বেগম উভয়ে হেসে উঠলেন। সেই হাসিতে যোগ দিল সে নিজেও। গম্ভীর পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যই মূলত সে এমনটা বলল। তারা হাস্যরোলে মগ্ন, ঠিক সে সময় কলিংবেলটা পরপর দুবার বেজে উঠল। সালেহা বেগম নাঈমাকে বললেন, 'দেখো তো মা-মণি, কে এল গেটে?'

নাঈমা উঠে গেট খুলতে গেল। গেট খুলে সে দেখল, তার বাবা এসেছেন। তাই সে তার পিতাকে একটি সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য বলল, 'আব্বু! তুমি তাড়াতাড়ি এসেছ ভালোই হয়েছে। আজ সন্ধ্যায়-না একজন অপরিচিত যুবক এসে তোমাকে খুঁজছিল। আম্মিজান তো তাকে দেখে দারুণ ভয় পেয়েছিলেন এবং গেট থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি এসে তাকে ডেকে এনে ঘরের ভিতর আটকে রেখেছি।'

'অপরিচিত যুবককে আটকাতে গেলে কেন মা-মণি' – জাফর মূসা সাহেব বললেন – 'পরে আসতে বলতে।'

'এখন তো আর এসব বলে লাভ নেই। তুমি ঘরে চলো। দেখো তাকে চিনতে পার কিনা' – বলেই নাঈমা পিতার হাত ধরে টানতে-টানতে ঘরের ভিতর নিয়ে চলল। জাফর সাহেব মেয়ের কাণ্ড দেখে অবাক হলেন। তিনি ভাবছেন, অপরিচিত যুবককে আটক করায় নাঈমা এত উচ্ছ্বসিত কেন? নিশ্চয়ই এতে কোনো রহস্য আছে।

ঈগল ও সালেহা বেগম তখন বাড়ির দ্বিতীয় তলায় অবস্থান করছিলেন। নাঈমা পিতাকে নিয়ে সেখানে এল। ঈগলকে দেখে জাফর সাহেব চিনলেন না। তিনি নাঈমাকে ডেকে রুমের বাইরে নিয়ে এলেন এবং বললেন, 'মা-মণি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। তুমি বললে, ঐ যুবক আমাকে খুঁজতে এসেছিল। তোমার আম্মি তাকে দেখে ভয় পেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তুমি ডেকে এনে আটকে রেখেছ। কিন্তু একটা কথাও তো সত্য প্রমাণিত হল না। আমি ঐ যুবককে চিনি না। কোনো দিন দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না। তোমার আম্মিজান দিব্যি পরিচিতজনের মতো তার সাথে আলাপ করছে। তুমি তাকে আটকে রেখেছ তাও ভুল প্রমাণিত হল। ব্যাপরটা খুলে বলো তো মা?'

'আব্বাজান! আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব। বলো, বিনিময়ে আমাকে কী দেবে?' নাঈমা বলল।

'সারপ্রাইজটা আমার মনমতো হলে তুমি যা চাইবে তা-ই তোমাকে দেওয়া হবে।' বললেন জাফর মূসা সাহেব।

'এই অঙ্গীকার আবার ভুলে যেও না যেন।' নাঈমা বলল।

এরই মধ্যে সালেহা বেগমের কণ্ঠ ভেসে এল – 'কই রে নাঈমা! পিতা-পুত্রী মিলে কোথায় গেলে?' সম্ভবত তিনি এদের কথাবার্তার শব্দ শুনেতে পাচ্ছিলেন।

'এই তো আম্মিজান; এখনই আসছি।' নাঈমা উচ্চৈঃস্বরে বলল।

'যাও, পাক্কা অঙ্গীকার করলাম, ভুলে যাব না' – জাফর সাহেব কন্যাকে উদ্দেশ করে বললেন – 'দাও তোমার সারপ্রাইজ।'

'আব্বাজান! তুমি না ইরাকি বীর মুজাহিদ ওমর শুজা ওরফে বাগদাদের ঈগলকে দেখার জন্য উদগ্রীব ছিলে?' নাঈমা পিতাকে জিজ্ঞেস করল।

'ভারী দুষ্ট হয়েছ তো তুমি' – জাফর সাহেব কিছুটা বিরক্তির স্বরে বললেন – 'ড্রইং রুমে বসা ছেলেটাকে তাই জানতে চেয়েছিলাম আমি তোমার কাছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে তুমি বললে, আমাকে সারপ্রাইজ দেবে। প্রমিজ করালে সারপ্রাইজের বিনিময়ে পুরস্কার পেতে। আবার এখন উঠিয়েছ বাগদাদের ঈগলের প্রসঙ্গ। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঈগলের প্রসঙ্গ উত্থাপনের মানে কী? ঈগল কি এখানে-সেখানে উড়ে বেড়ায় যে, তাকে মন চাইলেই দেখা যাবে? তাছাড়া বর্তমানে সে জেলখানায় বন্দি। সুতরাং তোমার কথার কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না। যা জানতে চেয়েছি, স্পষ্ট করে বলো তো মা-মণি।'

'দুষ্ট আমি, না তুমি? যে ছেলে মায়ের সাথে কথা বলতে জানে না, মায়ের কথায় ভুল ধরে; প্রকৃত দুষ্ট তো সে।' বলেই নাঈমা হেসে দিল।

মেয়ের এমন কথায় জাফর মূসা সাহেবও হেসে দিলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ; আম্মিজান। আমার ভুল হয়েছে। এবার দয়া করে আপনার এই দুষ্ট ছেলেটাকে প্রকৃত তথ্য জানিয়ে আশ্বস্ত করুন।'

'এই যে লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা বলেছ' – নাঈমা হেসে-হেসে বলল – 'এবার তোমাকে আসল তথ্য দেওয়া যায়। আর এটাই তোমার সারপ্রাইজ। আর এটাই তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর। আচ্ছা ছেলে, তোমাকে যদি বলা হয় ড্রইংরুমে বসা ঐ যুবকই বাগদাদের ঈগল, তাহলে কি তুমি তোমার এ মায়ের কথা বিশ্বাস করবে।'

'কী বললে মা-মণি তুমি! এই সেই বাগদাদের ঈগল?' বলেই জাফর মূসা সাহেব এক প্রকার দৌড়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন। ঈগল দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল। প্রথমবার যখন তিনি রুমে প্রবেশ করেছিলেন, তখন ঈগলের কাছে তাঁর পরিচিতি অজ্ঞাত ছিল বিধায় সে তাঁকে কোনো অভিবাদন জানায়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে সালেহা বেগমের কাছ থেকে সে তাঁর পরিচয় জেনে নিয়েছে। তাই তিনি রুমে প্রবেশের সাথে-সাথে সে অভিবাদন জানাল। জাফর সাহেব এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 'আমার সুনসিব যে, এত দিনে তোমার সাথে সাক্ষাত হল!'

তারপর জাফর মূসা সাহেব ঈগলকে নিয়ে সোফায় বসে কুশলবিনিময় শুরু করলেন এবং নাঈমা ও তার মাকে ঈগলের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে পাঠিয়ে দিলেন। জাফর সাহেব বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করে ঈগলের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৌতূহল ছিল ঈগলের কারামুক্তি নিয়ে। তিনি কিছুক্ষণ পূর্বেও জানতেন, সে কারাবন্দি আছে। তাই এ ব্যাপারে ঈগলকে প্রশ্ন করলে সে রুকাইয়ার অভিযানের কাহিনী তাকে শুনিয়ে দিল।

'আব্বাজান! ঈগলের কাহিনী তুমি একাই শুনবে?' – নাস্তার ট্রে হাতে নিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করতে-করতে নাঈমা বলল – 'নাকি আমাদের জন্যও কিছু বাকি রাখবে?'

'তোমরা রান্না-বান্নার কাজ সেরে তারপর শোনো' – জাফর মূসা সাহেব বললেন – 'তার আগে আমি একটু শুনে নিই। ঈগল তো আর এখনই উড়াল দিচ্ছে না। কী বল বেটা ঈগল!'

'এখন না হলেও রাত সাড়ে নটানাগাদ আমার যেতে হবে।' জাফর সাহেবের কথা কেটে ঈগল বলল।

'কী বললে ঈগল ভাইয়া! তুমি রাতেই চলে যাবে?' নাঈমা ঈগলের কথা শুনে চমকে উঠে বলল – 'না না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।'

'আহা, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন মা-মণি!' – জাফর সাহেব বললেন – 'ঈগল কি বসে থাকার মানুষ; ওর কাজ আছে না?'

'রাতের বেলা কিসের কাজ?' – নাঈমা আরো উত্তেজিত হয়ে বলল – 'ঈগল ভাইয়া তোমার কি আরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন নেই? এভাবে রাত-দিন সমানে কাজ করলে তো তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'তুমি শান্ত হও নাঈমা' – ঈগল বলল – 'আর শোনো, আমার কাজ দিনের চেয়ে রাতেই বরং বেশি। আজ রাতেও দুটা প্রোগ্রাম আছে। এখান থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে বাগদাদের উত্তর মহাসড়ক দিয়ে রাত ১২টায় দুটা হামভী যান অপারেশন যাবে। এদের ঘায়েল করতে রাস্তার পাশে চারটা শক্তিশালী বোমা পুঁতে রেখেছি। যদি কোনো কারণে পুঁতে রাখা বোমায় কাজ না হয়, তাহলে সাথে-সাথে আমাকে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আমাকে কম করে হলেও আধা ঘণ্টা আগে স্পটে পৌঁছতে হবে। তারপর রাত ৩টায় দ্বিতীয় অপারেশনের জন্য বের হতে হবে। আর বিশ্রাম-আরামের কথা বলছ; এই দুটা শব্দ আমার জীবনের অভিধান থেকে মুছে গেছে।'

ঈগলের কথা শুনে নাঈমা শান্ত কণ্ঠে বলল– 'ঠিক আছে, তুমি অভিযানে যাও। তবে অভিযান শেষে আমাদের এখানে চলে আসবে। প্রয়োজনে আমিও আজ তোমার অভিযানের সঙ্গী হব। তবে হ্যাঁ, তোমার দ্বিতীয় প্রোগ্রাম অবশ্যই আজ বন্ধ রাখতে হবে।'

'কিন্তু কেন নাঈমা?' প্রশ্ন ঈগলের।

'আমার এখানে তোমার অন্য একটা জরুরি কাজ আছে।'

'সেই কাজটি যদি আমার অপারেশনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সম্ভব; নচেৎ নয়।' ঈগল বলল।

'হ্যাঁ; কাজটি অতি... ।'

নাঈমা তার কথা শেষ করতে পারল না। এরই মধ্যে তার আম্মিজান কক্ষে ঢুকে তাকে উদ্দেশ করে বললেন, "হ্যাঁ রে নাঈমা! তোকে বললাম, নাস্তাটা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আয়। অথচ এখানে এসে গল্পে মজে গেলে? কিচেনে কত কাজ পড়ে আছে।'

'আম্মিজান! আমি গল্পে মজিনি। শোনো-না ঈগল ভাইয়া কী বলছে। রাতেই কিনা সে চলে যাবে' – নাঈমা বলল – 'উনি চলে গেলে আর রান্নাবান্না করে কী হবে?'

'কেন বেটা! রাতটা থেকে গেলে কী হবে?' সালেহা বেগম বললেন।

'আচ্চা, থাকবে তো বলেছে। এবার তোমরা যাও, তাড়াতাড়ি কিচেনের কাজ সেরে আস।' জাফর সাহেব স্ত্রী-কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন।

ঈগল থাকবে এ ব্যাপারটা আশ্বস্ত হয়ে নাঈমা দ্রুত তার মাকে নিয়ে কিচেনে চলে গেল। মন দিয়ে কাজ করতে লাগল নাঈমা। প্রত্যেকটা আইটেম সে নিজহাতে রান্না করছে। তার মা তাকে শুধু সাহায্য করে চলছেন। ঈগল আসার পর থেকে সালেহা বেগম তার মেয়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন। যে মেয়েকে বলে-কয়ে আধা ঘণ্টা কিচেনে রাখা যায় না, সে কিনা দু-ঘণ্টা কিচেনে অবিরাম কাজ করে চলছে। নিজহাতে সব রান্না করছে। মেয়েদের রান্নার কাজে যত্নশীল হওয়া ভালো ভেবে তিনি মেয়েকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু যা বোঝার তিনি বুঝে নিয়েছেন। কেননা, কথায় আছে, মেয়েদের মনের খবর জানে দুজন – মা ও অন্তর্যামী। এর মানে এই নয় যে, মা অন্তর্যামী হয়ে গেছেন। বরং এর মানে হল, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা মায়ের কাছে বেশি সময় অবস্থান করে। যে কারণে মেয়ের চলা-বলা-ভাষা সব থাকে মায়ের নখদর্পণে। অনেক সময় মেয়ে নিজেই সবকিছু মাকে বলে দেয়। সে কারণে মেয়ের মনের খবর আর মায়ের অজানা থাকে না।

রাত ৯টার মধ্যে নাঈমা তার মাকে নিয়ে রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে ফেলল। ডাইনিংয়ে খাবার সাজিয়ে নাঈমা ঈগল ও তার পিতাকে ডেকে নিয়ে এল।

জাফর মূসা সাহেব ঈগলকে নিয়ে দস্তরখানায় বসে গেলেন। নাঈমা ডাইনিং থেকে খানা এনে দিচ্ছে। সহসা ঈগলের চোখ পড়ল দেওয়ালে সাঁটানো ঘড়িটার দিকে। সে 'ইয়া আল্লাহ' বলে জিহ্বায় কামড় দিল এবং দাঁড়িয়ে গেল।

'কী হয়েছে বেটা!' জানতে চাইলেন সালেহা বেগম।

'বড্ড দেরি হয়ে গেল' – ঈগল বলল – 'নয়টা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে। এখন আর খেতে বসা যাবে না। আমাকে এক্ষুনি উত্তরের মহাসড়কে যেতে হবে। আপনারা খানা খেয়ে নিন। আমি অপারেশন শেষ করে এসে খাব।'

'তা হয় না বেটা' – জাফর মূসা সাহেব বললেন – 'তুমি এখন না খেলে আমিও খাব না। খাবে না বাসার কেউ। তুমি অপারেশন শেষ করে আসো। তারপর সবাই একসঙ্গে খাব।'

'আমার একার জন্য আপনারা সবাই কষ্ট করবেন তা হতে পারে না' – ঈগল বলল – 'তার চেয়ে বরং আপনারা খেয়ে নিন প্লিজ।'

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বেটা' – জাফর মূসা সাহেব বললেন – 'আমার খাওয়ার জন্য তুমি অস্থি হয়ো না। তুমি যাও; জলদি কাজ সেরে আস।'

♦♦♦

এত দ্রুত তোমার অপারেশন শেষ হয়ে গেল?' জাফর মূসা সাহেব ঈগলকে প্রশ্ন করলেন।

'আমি পৌঁছার পূর্বেই অপারেশন সম্পন্ন হয়ে গেছে।' ঈগল বলল।

'ভালোই হল' – জাফর সাহেব বললেন – 'এবার তাহলে চলো; আমরা খানা খেয়ে নেই। খেতে-খেতে তোমার অপারেশনের কাহিনী শোনা যাবে।'

'তা হবে না' – নাঈমা বলে উঠল – 'খানা খাওয়ার পর সবাই একত্রে বসে অপারেশনের কাহিনী শুনব। এখন তোমরা খানা খাও; আমি আর আম্মিজানও ওপাশের রুমে খেয়ে নিচ্ছি।' বলেই সে চলে গেল।

'চাচাজান! যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।' খানা খেতে-খেতে ঈগল বলল।

'মনে করার কী আছে বেটা! তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞেস করো।' জাফর সাহেব বললেন।

'বিষয়টা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনার কী হন?' ঈগল প্রশ্ন করল।

'সাদ্দাম হোসেন আমার কিছুই হন না। মানে তিনি আমার রক্তসম্পর্কের কোনো আত্মীয় নন' – জাফর মূসা সাহেব বললেন – 'প্রশ্ন করতে পার, তাহলে তিনি আমার এখানে আশ্রয় পেলেন কিভাবে? এর উত্তর হল, আমি একসময় বাথ পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলাম। প্রেসিডেন্টের আস্থাভাজনদের একজন ছিলাম আমি। ব্যক্তিগতভাবেও সাদ্দাম হোসেন আমাকে ভালবাসতেন। এমনকি আমার মেয়ে নাঈমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে একটি হীরার নেকলেস উপহার দিয়েছিলেন। নাঈমাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। সেই সুবাদে তিনি প্রায়ই আমার বাড়িতে আসতেন। কোনো একপর্যায়ে আমি যেকোনো কারণে বাথ পার্টির রাজনীতি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তবুও প্রেসিডেন্ট সাহেব যথারীতি আমার বাড়িতে আসতেন। আসতেন আমার মেয়ের জন্য। ওকে তিনি আম্মাজান বলে ডাকতেন। এই সম্পর্কের দরুনই তিনি আমার এখানে এসেছিলেন, আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখন অন্যত্র চলে গেছেন। কোথায় আছেন নাঈমা জানে, আমি জানি না। শুধু তা-ই নয়, তিনি ফেরারী জীবনটা কোথায় কখন কিভাবে কাটাচ্ছেন, তার সবই নাঈমার জানা।'

কথা বলতে-বলতে তাদের খানা খাওয়া শেষ হল। তারা দ্বিতীয় তলার বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে নাঈমা ও তার আম্মিজানও সেখানে এলেন। নাঈমা বৈঠকখানায় ঢুকেই বলল, 'ঈগল ভাইয়া! এবার তোমার অপারেশনের কাহিনী শোনাও।'

'এই অপারেশনটা ছিল ছোট্ট; কিন্তু দুশমনের ক্ষতি হয়েছে অভাবনীয়' – ঈগল বলল – 'দুশমনের বহরে গাড়ি এসেছিল দুটার জায়গায় পাঁচটা। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মাত্র একটা। বর্তমানে পুরো এলাকা মার্কিন সৈনিকরা

ঘিরে রেখেছে। আমি গাড়ি নিয়ে দূর থেকেই ফিরে এসেছি। তবে ফিরে আসার আগে পায়ে হেঁটে কাছে গিয়ে যা দেখেছি তাতে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য আগামীকাল ছাড়া জানা যাবে না।'

'তুমি ঘটনাস্থলের কাছে গেলে কোন সাহসে?' – নাঈমা বলল – 'তোমাকে যদি ওরা গ্রেফতার করত?'

'পরিস্থিতি সে রকম ছিল না' – ঈগল বলল – 'বিস্ফোরণস্থলের দুধারে রাস্তায় দীর্ঘ লাইন পড়ে গেছে। অনেক গাড়ির লোকজনই কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। যদিও মার্কিনিরা জনতাকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না; তথাপি জনতার কৌতূহল থামাতেও পারছে না। অবস্থা যা দেখে এলাম, তাতে রাস্তার ক্লিয়ার হতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে আরো বেশি সময় লাগবে।'

'রাস্তায় এত আগুন জ্বলছে কিসে যে, নিয়ন্ত্রণে আনা সহজসাধ্য নয়?' প্রশ্ন করলেন সালেহা বেগম।

'বলতে ভুলে গেলাম, বহরের তিনটা গাড়িই ছিল তেলবাহী লরি' – ঈগল বলল – 'এই লরিগুলো ছিল মাঝখানে। সামনে-পেছনে ছিল হামভী যান দুটি। আমার পর্যবেক্ষণ ও ধারণামতে বিস্ফোরণের প্রথম শিকার হয়েছিল একদম মাঝখানের ট্যাঙ্কলরিটি। এ লরির তেলভর্তি ট্যাঙ্কি ব্রাষ্ট হয়েই সামনে-পেছনে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। পেছনে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে সামনের হামভী যানটি দ্রুতগতিতে সম্মুখপানে এগিয়ে যায়। যার জন্য শুধু এ গাড়িটিই আগুনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু পেছনের হামভী যানটির অবস্থা হয়েছে ঠিক এর বিপরীত। এটির চালক সম্মুখে বিস্ফোরণ আর আগুন দেখে আতঙ্কিত হয়ে সম্ভবত ব্রেক কষতে ভুলেই গিয়েছিল। যদ্দরুন সেটি জ্বলন্ত লরির উপর উঠে যায়। আমি আসার সময় পর্যন্ত দেখেছি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তখনও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি।'

'আচ্ছা ঈগল ভাইয়া! তোমার এ অপারেশনের চূড়ান্ত ফলাফল যেহেতু এখনও জানা যাচ্ছে না, সেহেতু এ আলোচনাটা আপাতত এখানেই স্থগিত থাকুক' – নাঈমা বলল – 'এখন তোমাকে একটি জরুরি বার্তা দেব। তোমার একটি চিরকুট আছে আমার কাছে। একটু অপেক্ষা করো; আমি সেটি নিয়ে আসছি।' বলে সে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

অল্প সময়ের মধ্যে নাঈমা চিরকুট নিয়ে ফিরে এল। সেটি এগিয়ে দিল ঈগলের দিকে। ঈগল তার হাত থেকে চিরকুটটি নিয়ে পড়তে লাগল।

'স্নেহের বাগদাদের ঈগল! তুমি অতিসত্বর আমার সাথে দেখা করবে। আমি কোথায় যাচ্ছি, কোথায় থাকছি তা স্নেহের মা-মণি নাঈমা আম্মিজানের জানা আছে। আজ এ পর্যন্তই।

সাদ্দাম হোসেন
ইরাকের একমাত্র বৈধ প্রেসিডেন্ট।'

চিরকুটটি পড়ে ঈগল জিজ্ঞেস করল, নাঈমা! প্রেসিডেন্ট সাহেব এটি কবে লিখেছেন?'

'সে অনেক আগে' – নাঈমা বলল – 'তোমার সাথে তার সাক্ষাতের দুই সপ্তাহ পর; যখন তিনি আমাদের এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন, তখন এটি লিখে তিনি আমার কাছে দিয়ে যান।'

'আমি তাঁর সাথে আজই সাক্ষাত করতে চাই' – ঈগল বলল – 'তুমি আমাকে তাঁর ঠিকানাটা দাও তো।'

'তাঁর বর্তমান অবস্থানের ঠিকানা পেতে আমাকে একটা দিন সময় দিতে হবে।' নাঈমা বলল।

'ঠিক আছে; তুমি কালকের মধ্যে ঠিকানাটা সংগ্রহ করো। কাল রাতে আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে সাক্ষাত করব' – ঈগল বলল – 'রাত ১১টা বেজেছে, এখন তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।'

সে কী! তুমি-না বললে আজ আমাদের এখানে থাকবে' – নাঈমা ঈগলের চলে যাওয়ার কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল – 'এখন আবার যাওয়ার কথা বলছ কেন ঈগল ভাইয়া?'

'আজ রাতটা আমাদের এখানে থেকে যাও বেটা।' সালেহা বেগম ও জাফর মূসা সাহেব বললেন।

'থাকতে আমারও মন চাচ্ছে' – ঈগল বলল – 'কিন্তু কী করব বলুন। দখলদাররা যত দিন আমাদের দেশ না ছাড়বে, ততদিন আমাদের বহু সাধ-ইচ্ছাকে এড়িয়ে যেতেই হবে।'

'আমি চিরকুটটি তোমাকে এখন দিয়েই ভুল করেছি' – রাগতস্বরে নাঈম বলল – 'ওটা এখন না দিয়ে সকালে দিলেই তোমাকে আটকানো যেত।'

'তীর যখন ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন শিকারীর আর আফসোস করে লাভ কী' – ঈগল বলল – 'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি বোন। কিন্তু আমার সামনে যে কাজটা উপস্থিত, সেটা আজকেই সারতে হবে। অবশ্য এটা আগামীকাল করলেও হত। কিন্তু কাল যেহেতু প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে দেখা করব, তাই কাল এ কাজটা নাও হতে পারে। অথচ এ কাজটা না করা পর্যন্ত আমার নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি ওদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। শারজা রেজার আত্মা আমাকে অভিসম্পাত করছে রে নাঈমা। আমাকে অভিসম্পাত করছে।' বলতে-বলতে ঈগল আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল।

'বেটা! কাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছ বলে মনে হচ্ছে তোমার?' সালেহা বেগম হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন। ঈগলের আবেগপ্রবণতা তাঁর কোমল মাতৃহৃদয়কে ব্যাকুল করে তুলেছে। 'শারজা রেজা কে বেটা?' তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন।

'চাচিজান! সে এক দীর্ঘ উপাখ্যান' – ঈগল বলল – 'এখন তা বলে আর কী হবে? ওদের ভাগ্যে যা ছিল তা-ই ঘটেছে। তবে প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে এবং তা আজ রাতেই।'

'ঈগল ভাইয়া! আম্মিজান যা জানতে চাচ্ছেন, সেটা যদি বল, তাহলে আমি তোমার পথ আটকাব না' – নাঈমা বলল – 'নতুবা গেটের বাইরেই তোমাকে বের হতে দেব না।'

'থাক বেটী! ওর মন এখন ভালো নয়। বলতে না চাইলে ওকে জোর করো না তুমি।' নাঈমাকে তার আম্মিজান বাধা দিয়ে বললেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। নাঈমা যখন আবদার করেই বসেছে, তখন বলছি' – ঈগল বলল – 'শারজা রেজা ছিল এক বীর ইরাকি কন্যা। তার বাবা ছিল মার্কিনিদের দালাল। আর এখানেই তার মহত্ত্ব বিরাজিত যে, এক দালালের ঘরে লালিত-পালিত হয়েও সে দেশমুক্তির লড়াইয়ে জড়িত হয়েছিল যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায় থেকে।'

এরপর ঈগল সবিস্তারে বর্ণনা করল কিভাবে শারজার সাথে প্রতারণা করে তার পিতা ঈগলের ঠিকানা নিয়েছিল এবং মার্কিনিদের কাছে তার সে সময়কার অবস্থানের সংবাদ পৌঁছিয়েছিল। কিভাবে আবার শারজা ঈগলকে বাঁচতে সহায়তা করেছিল। ঈগলকে ধরতে কিংবা মারতে মার্কিনিদের ব্যর্থতা, উপরন্তু ঈগলকর্তৃক বিমান ছিনতাই হয়ে মার্কিন সৈনিকদের বোমা মেরে হত্যা করার দায়ে পরবর্তীতে শাহীন রেজার প্রতি মার্কিনিদের অফাদারিতে সন্দেহ প্রকাশ। অফাদারির প্রমাণ পেশ করতে না পারার দরুন মার্কিনিদর হাতে কন্যাসহ শাহীন রেজার গ্রেফতার হওয়া। সেখান থেকে পালিয়ে এসে মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য ঈগলের কাছে শাহীন রেজার আকুতি। শাহীন রেজার অপরাধী হওয়ার কাহিনী। মেয়েকে উদ্ধার করার শর্তস্বরূপ নিজে সে আত্মঘাতী হামলায় অংশগ্রহণে রাজি হওয়া। শাহীন রেজাকর্তৃক জাতিসংঘের বাগদাদ অফিসে হামলা পরিচালনা। পরবর্তীতে শারজাকে উদ্ধারের জন্য ঈগলের তৎপরতা। ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসনের সহায়তা কামনা। তার সহায়তায় কারাগারে প্রবেশ। নিজের বন্দি হওয়া। নির্যাতন ভোগ। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর রুকাইয়ার প্রচেষ্টায় তার মুক্তি। সর্বশেষ আজ রুকাইয়ার কাছে শোনা শারজা রেজার পরিণতি সবই বর্ণনা করল ঈগল।

শারজা রেজার কাহিনী শুনে নাঈমা, সালেহা বেগম ও জাফর মুসা সাহেব সবার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তারা সবাই নির্বিকার হয়ে গেলেন।

'এখন আপনারাই বলুন, এর প্রতিশোধ না নিলে কি আমার বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না?' ঈগল তাদের প্রশ্ন করল।

'এর প্রতিশোধ নিতেই হবে ঈগল ভাইয়া!' কাঁদো-কাঁদো স্বরে নাঈমা বলল – 'এই বীর ইরাকি শহীদ কন্যার রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। তার পিতার

আত্মদানের মূল্যও উসুল করতে হবে। আমিও তোমার সাথে এই অভিযানে অংশ নেব। আমাকে তোমার সাথে নিতেই হবে।

'তোমার যাবার প্রয়োজন নেই বোন।' ঈগল বলল।

আমাকে তোমার প্রয়োজন না হলেও আমাকে এই অভিযানে শরীক হতে হবে।' নাঈমার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ – 'বোন শারজা রেজার জন্য আমার হৃদয়েও রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। অভিযানে অংশ নিয়ে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত এ রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। চলো তুমি। এক মুহূর্তও দেরি সইছে না আমার।'

নাঈমার পিতামাতাও তাকে অভিযানে অংশ নিতে বারণ করল না। তার মা শুধু বলল, 'বেটী, অভিযানে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করবে। আবেগতাড়িত হয়ে কখনো কোনো কাজ করবে না। ঈগল যেভাবে বলে, সেভাবে সব করবে।'

কন্যার আবেগ দেখে জাফর সাহেবও আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনিও অভিযানে অংশ নিতে তৈরি হয়ে গেলেন। অবশেষে পিতা-কন্যা দুজনকে সাথে নিয়েই ঈগল অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

♦ ♦ ♦

রাত তিনটা। দজলা নদীর পশ্চিম তীরে মার্কিনিদের একটি মধ্যম সারির সেনাছাউনি। এখানে অবস্থানরত সকল সৈনিক গবীর ঘুমে অচেতন। পাহারারত দু-সৈনিক বসে-বসে ঝিমুচ্ছে। দুজনের মধ্যে দূরত্ব দুশ গজের বেশি হবে না। উত্তর পার্শ্বের সৈনিকটির সম্মুখে হঠাৎ এক খণ্ড পাথর এসে পড়ল। ঘুমাতুর চোখে সে বকবক করে উঠল। এক মিনিট পর ছোট্ট আর এক খণ্ড পাথর তার কপাল স্পর্শ করে চলে গেল। সে তার সহকর্মীর নাম ধরে গালাগাল করতে লাগল। কিন্তু তবুও স্থান ছাড়ল না। পাঁচ মিনিট পর কী যেন দৌড়িয়ে গেল সৈনিকটির সামনে দিয়ে। তথাপিও তার স্থান ত্যাগের ইচ্ছে হল না। মুখে শুধু উচ্চারণ করল, 'মার্টিন! ফাজলামি বেশি হয়ে যাচ্ছে। ভালো হবে না বলছি।' বলে আবারও ঝিমুতে লাগল।

তিন মিনিট পর সৈনিকটির কোলের কাছের অস্ত্রটি নিয়ে কে যেন নদীর দিকে ছুটল। এবার আর সৈনিক না উঠে পারল না। উঠে অস্ত্র নেওয়া লোকটির পিছন-পিছন যেতে-যেতে বলল, 'মার্টিন! এসব ভালো হচ্ছে না কিন্তু। তুমি আজ আমার সাথে বেশি বাড়াবাড়ি করছ। তোমাকে আমি আজ গুলি করে হাসপাতালে পাঠাব। অফিসারের কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেব।'

তার ধারণায় অস্ত্র নেওয়া লোকটা তারই সহকর্মী জোশেফ মার্টিন। তাই তাকে উদ্দেশ করে সে উপরোক্ত উক্তিগুলো করল।

কিন্তু অস্ত্র ছিনতাইকারী যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। থামার নাম নেই। তার উক্তিরও কোনো প্রতিউত্তর সে করছে না। নদীর তীরে গিয়ে লোকটি থেমে গেল। সৈনিকও তার কাছাকাছি চলে গেল। চোখ কচলাতে-কচলাতে সে বলল,

'মার্টিন! ভদকাটা আমি না হয় একটু বেশিই খেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তো আমার থেকে টাকাও বেশি নিয়েছ। আমি কি তখন তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম? এখন আমি একটু ঘুমালে তোমার অসুবিধা কোথায়? তুমি যখন কোনো সুন্দরীকে রাতের বেলা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে লোকালয় থেকে তুলে এনে গোপন অভিসারে মিলিত হও, তখনও তো আমি তোমাকে... ।'

সৈনিক তার কথা শেষ করতে পারল না। এই মধ্যে তার গালের মধ্যে কঠিন আকারের একটি থাপ্পড় পড়ল। এক থাপ্পড়েই সে ঘুরে পড়ে গেল।

'মার্টিন! তুমি এভাবে আমাকে মারতে পারলে?' সৈনিক গালে হাত রেখে উঠতে-উঠতে বলল।

'কে মার্টিন? আমি তোর যমদূত!' ঈগল সৈনিকের শার্টের কলার ধরে কাছে এনে বলল।

সৈনিক যার হাতে মার খাচ্ছে, সে তার সহকর্মী মার্টিন নয় শুনে এবং দেখে ভয়ে কুচকে গেল। তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সমগ্র শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। তবু সাহসে ভর করে কাঁপা গলায় সে বলল, 'আমাকে মারছেন কেন ভাই? আমি তো কোনো অপরাধ... ।'

'চুপ কর দুরাচার! শয়তান' – ঈগল ধমক দিয়ে বলল – 'তোদের চিনতে আমার আর বাকি নেই। আমি যা জিজ্ঞেস করছি, সব যদি সত্য-সত্য বলিস, তাহলে তোকে ছেড়ে দেব। নতুবা এ মুহূর্তে তোকে পরপারের টিকিট ধরিয়ে দেব।'

'ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে হত্যা করো না। তুমি যা জানতে চাও, আমার জানা থাকলে সব বলে দেব।' সৈনিক অনুনয় করে বলল।

'এখানে কতজন সৈনিক অবস্থান করছে?'

'পঞ্চাশজনের বেশি হবে না।'

'সবাই কি ঘুমায়?'

'হ্যাঁ, মার্টিন ছাড়া সকলেই ঘুমান।'

'মার্টিন কে? সে কী করছে?' সম্ভবত দক্ষিণ পার্শ্বের সৈনিকটিকে ঈগল লক্ষ্য করেনি।

'মার্টিন আমার সহকর্মী। সে ছাউনির দক্ষিণ পার্শ্বে পাহারা দিচ্ছে।'

ঈগল সৈনিকের উত্তর শুনে মুখে আঙুল দিয়ে একটা শিষ দিল। খানিক দূর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। তারা কাছাকাছি পৌঁছলে ঈগল হাতের ইশারায় তাদেরকে কাছে ডেকে সৈনিকটিকে তাদের হাতে সোপর্দ করে অন্যত্র চলে গেল। নাঈমা ও তার পিতা সৈনিকের হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। এক টুকরো কাপড় দিয়ে তার মুখও বেঁধে দিল। তারপর নদীর একেবারে কিনারায় নিয়ে তাকে ফেলে রাখল।

ঈগল দ্রুত ছাউনির দক্ষিণ দিকে চলে গেল। মার্টিন নামক সৈনিকটি তখনও নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ঈগল আস্তে করে তার হাত থেকে অস্ত্রটা উঠিয়ে নিল। সে লাফিয়ে উঠল। সাথে-সাথে ঈগল তার মুখটা চেপে ধরল। তারপর অস্ত্রটা তার বুকে ঠেকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'একটি শব্দ বেরুবে তো একদম জানে শেষ করে ফেলব। বল, ছাউনিতে কত জন সৈন্য আছে?'

'বায়ান্নাজন।' ভয়ার্ত কণ্ঠে উত্তর দিল সৈনিকটি। মুখ থেকে যেন কথা-ই বের হচ্ছে না। ভয়ে তার অর্ধমৃত অবস্থা। ঈগলের চোখে সে আজরাইলের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। ঈগল তার উত্তরে আশ্বস্ত হল। ছাউনির সৈন্য সংখ্যা দুজনে একই কথা বলেছে। আগের সৈনিক নিজেদের দুজনকে বাদ দিয়ে বলেছে পঞ্চাশজন। আর এ নিজেদের দুজনসহ বলেছে বায়ান্নজন। এখন ছাউনির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

'ওঠ, চল।' ঈগল পকেট থেকে তার সাইলেন্স রিভলবারটি বের করে সৈনিকের মাথায় ঠেকিয়ে বলল।

'কোথায়! কোথায় যাব?' আতঙ্কিত সৈনিকের প্রশ্ন।

'নো স্পোকিং, ফুললি স্টপ' – ঈগল বলল – 'জাহান্নামে চল।'

জাহান্নাম বলে ঈগল কী বুঝিয়েছে সৈনিক বুঝল না। সে শুধু তার নির্দেশ অনুসরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কিছু দূর যাবার পর সে একদিকে দৌড় দিল। ঈগল ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। বলল, 'তোকে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু তুই নিজেই বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিস্। সুতরাং এই শেষ মুহূর্তে একটি সত্য কথা বল; এ পর্যন্ত কতজন ইরাকি নারীর ইজ্জত হরণ করেছিস?'

ঈগলের এ প্রশ্নে মার্টিন নামক এই মার্কিন সৈনিকটি নীরবতা পালন করল। মুখ ফুটে কোনো কথাই সে বলছে না। সহসা ঈগল একটা ঘুষি মারল তার পিঠের মধ্যে। ভ্যাক করে উঠল সৈনিকটি। ধপাস করে বসে পড়ল মাটিতে। ঈগল তার বুকের উপর পিস্তল রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যা জানতে চাইছি, তার উত্তর না দিলে তোকে কঠিন শাস্তি দিয়ে মারব। বল, কতজন মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিস্ তুই?'

'কুড়ি-পঁচিশজনের বেশি হবে।' কোনোমতে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল সৈনিক।

'হারামজাদা!' বলেই ঈগল রিভলবারের ট্রিগার টেনে দিল। খ্যাচ করে একটি চাপা আওয়াজ হল। মার্টিন নামক জানোয়ার মার্কিন সৈনিক চিরতরে জাহান্নামে চলে গেল।

ঈগল এই জাহান্নামের কীটটার কাছ থেকে উঠে সেনা ছাউনির দিকে এগুলো। এরই মধ্যে ছাউনি থেকে কমান্ডার বেরিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'মার্টিন! ব্রেমার! কোথায় তোমরা?'

ঈগল গা ঢাকা দিয়ে দূর থেকে ঘুরে উক্ত মার্কিনির পেছনে চলে গেল। সে ডাকতে-ডাকতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আর বিরক্তি প্রকাশ করছে। ঈগল তার মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'নো কলিং ইওর সোলজার্স। সাইলেন্টলি এ্যাহেড!'

সে আর ডাকাডাকি করল না। নিঃশব্দে সম্মুখপানে হাঁটতে লাগল। ছাউনি থেকে বেশ দূরত্বে আসার পর উক্ত মার্কিনি বলল, 'তুমি যে-ই হও, আমার সামনে এসে কথা বলো। তোমার সব কথা আমি শুনব। আমি জানি, তুমি গেরিলা সৈনিক। এই নাও, আমার অস্ত্রটাও তোমার কাছে রাখো।' বলে সে তার কোমরের কালো লেদার কাভার থেকে অত্যাধুনিক মডেলের ক্ষুদ্র পিস্তলটি বের করে ঈগলের দিকে এগিয়ে দিল।

কমান্ডারের কথা শুনে ঈগল অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তার মাথার কাছ থেকে পিস্তল সরিয়ে নিল। তবে তার পিস্তলটিও নিজের কাছে নিয়ে নিল। সেটা এজন্য যে, তার ধারণায় কমান্ডারের কথাগুলো প্রতারণাও হতে পারে। যত নীতিবানই হোক, সে বুশের সৈনিক, এটাই তার প্রতারক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা, তাদের যুদ্ধের নেতা বুশ হলেন বিশ্বপ্রতারক। সে ইরাকে যুদ্ধ করছে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণার উপর নির্ভর করে।

'তুমি কী জন্য আমাকে এ্যাটাক করেছ তা আমি জানি' – ঈগল সামনে আসার পর উক্ত মার্কিনি বলল – 'তোমার আবেগকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি এ ছাউনির কমান্ডার। তোমার স্থানে আমি হলে অর্থাৎ আমার দেশকে কেউ অবৈধভাবে দখল করলে আমিও তাদের ছেড়ে দিতাম না। তুমি এখন আমাকে এ্যাটাক করেছ কেন, আমি শুধু এতটুকু জানার আবদার করছি তোমার কাছে। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।'

'কমান্ডার সাহেব! আপনি আমার সাথে অভিনয় করছেন কিনা জানি না' – ঈগল বলল – 'আমি এখানে কী করতে চাচ্ছি সব আপনাকে বলব। তবে আপনাকে একটু কষ্ট করে নদীর ধারে যেতে হবে?'

'কেন? নদীর তীরে কী, কেন?' কমান্ডারের প্রশ্ন।

'সেখানে আমার আরো দুজন সহকর্মী আছে। তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।' ঈগল বলল।

'ওখানে গিয়ে তোমার ইচ্ছায় পরিবর্তন আসবে না তো?'

'তার মানে! আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?' – একটু কর্কশ কণ্ঠে ঈগল বলল – 'আমি ওখানে নিয়ে আপনাকে হত্যা করব এটাই কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'এমনটা হতেও তো পারে।' কমান্ডার বললেন।

'আপনি ভুল ধারণা করছেন জনাব' – ঈগল বলল – 'আপনাকে খুন করলে আমি এখানেও করতে পারি; তার জন্য নদীর তীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি যে রকম আমার আবেগকে শ্রদ্ধা করছেন, আমিও আপনার শুভ চিন্তাকে সমীহ করি। দয়া করে সামনে চলুন।'

'ঠিক আছে, চলো।' বলে মার্কিন কমান্ডার ঈগলের সাথে নদীর দিকে হাঁটতে লাগল।

নদীর তীরে পৌঁছার পর ঈগল মার্কিন কমান্ডারের হাতদুটো বেঁধে ফেলল। তিনি কোনো প্রকার বাধা দিলেন না। ঈগল বলল, 'আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনি এই গাড়িতে বসে বিশ্রাম নিন। আমরা কাজ সেরে এসে আপনার বন্ধন খুলে দেব।'

'আমাকে বেঁধে রাখার প্রয়োজন ছিল না। তুমি বললে আমি এমনিতেই বসে থাকতাম।' ঈগলকে লক্ষ্য করে কমান্ডার বলল।

'আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসছি। আপনি এতটুকু সময় ধৈর্য ধরুন।' বলেই ঈগল তার সামনে থেকে প্রস্থান করল। তবে কমান্ডারকে একা ছেড়ে যায়নি সে। জাফর মূসা সাহেবকে গাড়ির আড়ালে অস্ত্রসহ পাহারায় রেখে নাঈমাকে সাথে নিয়ে ছাউনির দিকে ছুটল।

ছাউনির সৈনিকরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ঈগল নাঈমাকে দায়িত্ব দিল পুরো ছাউনিতে পেট্রোল ছিটাতে। নিজে অস্ত্র তাক করে ছাউনির ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরের অবস্থা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, এখানকার সৈন্যরা লাশের মতে পড়ে আছে। দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে ঘুমচ্ছে তারা। ঈগলের সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায়ও কারো ঘুম ভাঙল না। তাদের বিছানার পাশে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য বোতল ও ক্যান। এগুলো ভদকা, বিয়ার আর শ্যাম্পেইনের পাত্র খালি পড়ে আছে। অবস্থা এমন যে, নাঈমাকে ভেতরে ডেকে দুজনে দুই সারিতে ব্রাশফায়ার করেই সবগুলোকে জাহান্নামে পাঠানো সম্ভব। কিন্তু ঘুমন্ত শত্রুর উপর আঘাত হানতে তার মনে সায় দিল না। যদিও গেরিলা যুদ্ধের অভিধানে এসব কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ, গেরিলা যুদ্ধের শুরুটাই হয় জালিম-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মজলুমের প্রতিরোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা সত্য। তবে ব্যতিক্রমও আছে। সে ক্ষেত্রে বঞ্চিত-নির্যাতিতরা লড়াই করে সম্পূর্ণরূপে তাদের বুদ্ধি ও কলাকৌশল দিয়ে। কিন্তু এখন যদি তারা জায়েয-নাজায়েয ভালো-মন্দ, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয় ভাবতে যায়, তাহলে লড়াই না করে ঘরে বসে মার খাওয়াই শ্রেয়। তবে হ্যাঁ, জালিমকে দমন করতে গিয়ে নিজেদেরকে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া কখনো কাম্য হতে পারে না। তাহলে উভয়ের মাঝে আর পার্থক্য থাকল কই!'

খানিকক্ষণ এসব চিন্তা করার পর ঈগল তার কাজ শুরু করল। সে তার পিঠে বাঁধা ব্যাগ থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির টাইম বোমাগুলো সৈনিকদের বিছানার আশপাশে ছড়িয়ে দিল। কিছু পেট্রোল বোমা তাঁবুর কর্নারে-কর্নারে রেখে দিল। তাঁবু থেকে বের হতে গিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়াল। 'আঁহ' শব্দটা পুনরায় তার কর্ণগোচর হল। সেই শব্দটির উৎস নির্ণয়ের জন্য সার্চলাইটটি পুনরায় জ্বালাল। দেখল, উত্তর কর্নারে একটা কম্বলের ভেতর সামান্য নড়চড় হচ্ছে।

শব্দটা ওখান থেকেই আসছে। সে উক্ত কম্বলের কাছে গেল। কিন্তু আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

ঈগল মনে-মনে ভাবল, এটা হয়ত তার শোনার ভুল। ঘুমন্ত মানুষের কম্বল মাঝে-মধ্যে নড়তেই পারে। এসব ভেবে সে তাঁবুত থেকে বের হতে উদ্যত হল। ঠিক তখন তার কানে ভেসে এল, 'ও আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যু দাও। এই জাহান্নাম থেকে আমাকে মুক্তি দাও।' অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠের এ মেয়েলি আওয়াজ কানে পৌঁছতেই তার কলিজাটা ধক্ করে উঠল। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাদুটো যেন মাটিতে আটকে গেল। দ্রুত সে কম্বলটার কাছে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কম্বলটা অল্প একটু সরাল। দেখল, এলো কেশ, বিধ্বস্ত চেহারার এক তরুণী চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে বলল, 'বোন! আমি মুসলিম, তুমি চলো আমার সাথে।'

ঈগলের কথায় মেয়েটির কোনো ভাবান্তর ঘটল না। সে শুধু তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রইল। ঈগল তাড়া দিয়ে বলল, 'প্লিজ বোন! দেরি করো না। অল্প সময়ের মধ্যে এই তাঁবু ধ্বংস্তূপে পরিণত হবে। তোমাকে এই জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর দোহাই তাড়াতাড়ি ওঠো।'

'আমি কিভাবে উঠব ভাই। আমার শরীরে যে কোনো বস্ত্র নেই!' তরুণীটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল – 'তাছাড়া আমি একা বেঁচে কী হবে, এখানে আমার মত আরো দশজন তরুণী আছে। সবাই বিবস্ত্র। ওরা আমাদেরকে বিবস্ত্র হতে বাধ্য করেছে।'

মেয়েটির কথা শুনে ঈগল স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার হাত-পায়ের রগগুলো কে যেন কেটে দিয়েছে। ইরাকি কন্যাদের-মুসলিম মেয়েদের এই করুণ পরিণতি অবলোকন করার পূর্বে তার কেন মৃত্যু হল না এটাই এখন তার আফসোসের বিষয়। ইতিমধ্যে তার হাতঘড়িটা একটা সাইরেন দিল। সে সচকিত হয়ে উঠল। বোমাগুলো বিস্ফোরণের আর মাত্র ৪ মিনিট বাকি। এদের বাঁচাতে হলে তার আগেই এখান থেকে বের করতে হবে। সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'বোন! তোমাদের কাপড়গুলো কোথায় রাখা হয়েছে, বলতে পার?'

'তাঁবুর ওপাশে একটা ড্রেস বদলের খিমা আছে; ওখানে।' তরুণ হাতের ইশারায় কাপড় রাখার স্থানটি দেখিয়ে দিল।

ঈগল দৌড়ে গিয়ে কাপড়গুলো নিয়ে এল। সময় বাকি আছে আর মাত্র ৩ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। তাই সে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'বোন! খুব জলদি কাপড় পরে নাও। অন্যদেরকেও উঠিয়ে কাপড় পরিয়ে বের করে নিয়ে এস। তোমাদের সহযোগিতার জন্য তোমাদের আরেক বোনকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো, সময় আছে মাত্র ৩ মিনিট। এরপরই এ ছাউনি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।' বলেই ঈগল তাঁবু থেকে বের হল এবং নাঈমাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল।

নাঈমাকে ভেতরে পাঠিয়ে ঈগল ছাউনির বাইরে দাঁড়িয়ে অস্থির সময় অতিবাহিত করতে লাগল। ঘড়ির কাটার দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এক-একটা সেকেন্ড যেন তার কাছে এক-একটা ঘণ্টা হয়ে আবর্তিত হচ্ছে। এক-একটা মিনিটকে মনে হচ্ছে এক-একটা মাস। দু-মিনিট শেষ। আর মাত্র এক মিনিট বাকি আছে। ঈগল শশব্যস্ত হয়ে উঠল। তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে চাপা আওয়াজে বলল, 'নাঈমা! খুব তাড়াতাড়ি করো। আর মাত্র এক মিনিট বাকি। হায়-হায়! আর ৫০ সেকেন্ড বাকি।'

এরই মধ্যে নাঈমা তরুণীদের নিয়ে তাঁবু থেকে বের হতে শুরু করল। সবাই বের হয়েছে, মাত্র দুজন বাকি। ঠিক সে সময়ই একটা বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। দুই তরুণী লাফ দিয়ে বাইরে এসে পড়ল। সময় অবশ্য তখনও তিন সেকেন্ড বাকি ছিল। সম্ভবত ঐ বোমাটায় তিন সেকেন্ড এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাতে সমস্যা তেমন হয়নি। তিন সেকেন্ড আগে বিস্ফোরিত বোমায় এক সৈনিকের শুধু চিৎকার শোনা গেল। তার কানফাটা আর্তচিৎকারে কিছু সৈনিক জাগতে শুরু করলেও অধিকাংশই নেশায় বুঁদ হয়ে অন্তিম ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছিল যেন।

তিন সেকেন্ড অতিবাহিত হতে না হতে একযোগে বিস্ফোরিত হল সব কটা বোমা। মার্কিনিদের সেনাছাউনিটাতে যেন মিনি কেয়ামত ঘটে গেল। পেট্রোল বোমার বিস্ফোরণ আর পেট্রোল দিয়ে ভিজানো তাঁবু দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের লেলিহান শিখা উঠে গেল বহু উপরে, যেন উন্মুক্ত ময়দানে আগুনের সার্কাস শুরু হয়েছে।

ঈগল অস্ত্র নিয়ে আগুনের পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে রইল। তার প্রতিজ্ঞা আজ একটা সৈনিককেও জীবন নিয়ে পালাতে দেবে না। তাই যখন সে বুঝল, আর কোনো সৈন্য বেঁচে থাকা কিংবা জীবন নিয়ে পালানোর সম্ভাবনা নেই, তখন সে নদীর তীরের পথ ধরল। সাথে নাঈমা ও নির্যাতিতা তরুণীরা।

পথে নাঈমা একটি বিষয়ে ঈগলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিষয়টি হল তরুণীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর বাহন-বিষয়ক। কেননা, অপারেশনের পর এখন দ্রুত এই এলাকা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তারা যে গাড়িটা নিয়ে এসেছে, তাতে তারা তিনজন বাদে বড়জোর আর দুজনকে বসানো যাবে; বাকি আটজনের কী হবে?

'একটি জরুরি কথা মনে করেছ তো' – নাঈমাকে উদ্দেশ করে ঈগল বলল – 'তুমি এদের নিয়ে সামনে হাঁটতে থাকো, আমি দেখি, মার্কিনিদের গ্যারেজে কোনো গাড়ি পাই কিনা।' বলেই সে গাড়ির খোঁজে চলে গেল।

নাঈমা মেয়েদের নিয়ে প্রায় নদী তীরে পৌঁছে গেল। এরই মধ্যে ঈগল একটা বড় আকারের সাঁজোয়াযান নিয়ে হাজির হল। ঈগল তাদের দ্রুত গাড়িতে উঠতে নির্দেশ দিল।

◆◆◆

'ঈগল! আমি তোমাকে তোমার কাজের জন্য ধন্যবাদও দেব না, আবার ধিক্কারও দেব না। তবে তোমার কাজটা আমাকে সাময়িকভাবে কষ্ট দিলেও এতে আমার বরং উপকারই হয়েছে' – ঈগলকে লক্ষ্য করে বললেন ধ্বংসপ্রাপ্ত মার্কিন ছাউনির কমান্ডার যোশেফ এ্যান্থনি।

'আপনার ক্যাম্প ধ্বংস হয়ে গেল, সৈন্যরা সব মারা পড়ল আর আপনি বলছেন আপনার উপকার হয়েছে' – কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে নাঈমা বলল – 'এটা কেমন কথা বলছেন আপনি? আপনার মাথা ঠিক আছে তো?'

'বেটী! আমি যা বলছি, হুশ-জ্ঞান ঠিক রেখেই বলছি' – মার্কিন কমান্ডার বললেন – 'তুমি কি দেখছ না আমার অধীন ঐ সৈনিকগুলো এই নিষ্পাপ-নিরপরাধ মেয়েগুলোর সাথে কেমন জঘন্যতম আচরণ করছে? আমি বারংবার নিষেধ করেও ওদেরকে এই নোংরামি থেকে বিরত রাখতে পারিনি।'

'আপনার মধ্যে যখন এত মানবিকতা বিরাজ করছে, তাহলে আপনি কোন যুক্তিতে ইরাকের নিরপরাধ মানুষ হত্যার এই মহোৎসবে যোগদান করেছেন?' – ঈগল বলল – 'আপনার দৃষ্টিতে কি প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষিত তথাকথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী এই যুদ্ধটা ন্যায়সঙ্গত?'

'বেটা ঈগল!' ইরাক যুদ্ধে পাঠানোর প্রাক্কালে পেন্টাগনের পক্ষ থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, ইরাকে বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ হবে না। ওখানে আমরা যাব সবাই শান্তির দূত হয়ে। ইরাকের জনগণ সাদ্দামের স্বৈরশাসনে খুবই অতিষ্ঠ। তাই আমাদেরকে তারা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে। আমরা শুধু সাদ্দামের হাত থেকে ক্ষমতার বাগডোর কেড়ে নিয়ে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সহায়তা করব। তবে জনগণের সেই সরকার চলবে আমাদের পরামর্শে। আর এভাবেই সেখানে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে যিশুর রাজত্ব।'

'এই যিশুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়েই আমি ইরাকে এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। ইরাকি জনগণ ফুলের মালার পরিবর্তে আমাদের উপহার দিল কঠিন প্রতিরোধের মালা। আর আমাদের সেনাবাহিনীও তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো। বিষয়টি অন্য দশজন সৈনিকের মতো আমি মেনে নিতে পারিনি। ইরাকি জনতার প্রতিরোধ আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে। তাই আমি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে সৈনিক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার আবেদন করলাম। কিন্তু আমার আবেদন মঞ্জুর তো হলই না, উপরন্তু এক প্লাটুন সৈনিকের কমান্ডার নিযুক্ত করে আমার কাজের পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হল। তবে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলেও আমার মন এখানে কাজ করার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এ কারণে অদ্যাবধি আমার হাতে একজন ইরাকির গায়েও একটা গুলি ছোড়া সম্ভব হয়নি।'

'এজন্য আপনাকে ইরাকি জনতার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি' – ঈগল বলল – 'কিন্তু আপনার সৈনিকদের হত্যা করে কিভাবে আপনার উপকার করলাম, বিষয়টি বুঝিয়ে বললে খুশি হতাম।'

'বিষয়টা সহজ' – বললেন কমান্ডার যোশেফ এ্যান্থনি – 'এখন আমি জোরালোভাবে আবেদন করতে পারব, আমার দ্বারা যুদ্ধ করা বা সৈন্য পরিচালনা করা কোনোটাই সম্ভব নয়। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি না করে আমাকে দেশে ফেরত পাঠানো হোক। আশা করি, এ ক্ষেত্রে আমার আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে। এটা কি আমার উপকার করা হল না?'

'তা ঠিক; কিন্তু আপনার যুক্তির সাথে আমি একমত নই' – ঈগল বলল – 'আমার তো মনে হয়, একথা বললে আপনাকে দেশে ফেরত না পাঠিয়ে বরং আপনার কর্মকর্তারা আপনার কাঁধে আরো কোনো বড় দায়িত্ব চাপাতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেশে ফেরা আপনার অপূর্ণই থেকে যাবে।'

'তাহলে আমার কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর বেটা?' ঈগলের কাছে জানতে চাইলেন যোশেফ এ্যান্থনি।

'আমার পরামর্শ কী আপনি গ্রহণ করবেন কমান্ডার সাহেব?'

'উপযুক্ত হলে অবশ্যই গ্রহণ করব।'

'আপনাকে আমি হাত-পা বেঁধে সেনাছাউনির ধ্বংসস্তূপের পাশে রেখে যাব' – ঈগল বলল – 'আপনি যখন আপনার কর্মকর্তার প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, তখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবেন এবং আরো এক প্লাটুন সৈন্য আপনার দায়িত্বে ন্যস্ত করার জোর আবদার জানাবেন। তাহলে উক্ত অফিসার... ।'

'না-না, আমি এই দায়িত্ব আর মোটেও পালন করতে পারব না' – ঈগলের কথা শেষ করতে না দিয়েই কমান্ডার যোশেফ এ্যান্থনি বললেন – 'এই মাতাল অথর্ব মানসিক দুর্দশাগ্রস্ত একজন সৈনিকের পরিচালনার দায়িত্বও আমি আর নিতে পারব না।'

'মানসিক দুর্দশাগ্রস্ত কারা?' – প্রশ্ন ঈগলের – 'আপনি কাদের মাতাল-অথর্ব বলছেন বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি কিছুই জান না ঈগল!' – কমান্ডার যোশেফ বললেন – 'ইরাকে অবস্থানরত অধিকাংশ মার্কিন সৈন্য মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে। ডাক্তারি চিকিৎসায়ও তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এদের নিয়ে হাইকমান্ড খুবই উদ্বিগ্ন। আমার দায়িত্বে যে কজন সৈন্য ছিল, তাদের ৯০ ভাগই ছিল মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত। এরা দিবা-রাত্রির বেশির ভাগ সময়ই মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে মাতলামি করত। বাধা-নিষেধ এরা কমই মানত। এত বেশিসংখ্যক সমস্যাগ্রস্ত সৈন্য আমার দায়িত্বে দেওয়াও ছিল আমার প্রতি কর্মকর্তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। এখন আবার নতুন করে সৈন্য পরিচালনার আবেদন করব,

তা আমাকে দিয়ে হবে না। তবে তুমি আমাকে প্রথম যে পরামর্শটা দিয়েছ অর্থাৎ আমাকে বেঁধে ক্যাম্পের পার্শ্বে ফেলে রাখবে; সেটা গ্রহণ করা যায় এবং এর বিকল্প নেই। সুতরাং তোমরা আমাকে ওখানে রেখে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করো।'

ধ্বংসপ্রাপ্ত মার্কিন সেনাছাউনির অদূরে ছাউনিপ্রধান যোশেফ এ্যান্থনিকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে ঈগল সবাইকে নিয়ে নদীর তীর ত্যাগ করল। নাঈমা ও তার পিতাকে তাদের গাড়িতে করে বাসায় পাঠিয়ে দিল। আর সে মার্কিন সাঁজোয়াযানে করে তরুণীদের যার-যার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছুটল। কারণ, রাতের অন্ধকার থাকতে-থাকতে তাদের পৌঁছাতে না পারলে পরে অনেক সমস্যা হবে।

নির্যাতিতা দশ তরুণীর মধ্যে আটজনকে গন্তব্যে পৌঁছে দিলেও দুজনকে নিয়ে ঈগল বিপাকে পড়ল। তাদের দুজনের দেওয়া ঠিকানায় পৌঁছে দেখল, তাদের বাড়ি-ঘরের কোনো চিহ্নও নেই। মার্কিনিরা হামলা চালিয়ে সবকিছু মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে।

তারা জানাল, তারা একই বিল্ডিংয়ে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস করত। সেদিন তারা কলেজ থেকে আসার সময় একটি মার্কিন টহলযান তাদের অনুসরণ করে বাসা পর্যন্ত আসে। তারপর তারা তাদের মাতাপিতার কাছে প্রস্তাব দেয়, মার্কিন সেনাক্যাম্পে একটি নৈশভোজের অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনের জন্য দুজন তরুণী আবশ্যক। সুতরাং তারা যেন তাদের কন্যাদের সৈনিকদের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু তাদের অভিভাবকরা সরাসরি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং মার্কিনিদের অন্যায় আবদারের জোর প্রতিবাদ জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মার্কিন সৈনিকরা। তারা সাথে-সাথে মেয়েদের টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

মেয়েরা শুধু এতটুকুই জানে। কিন্তু তাদের নিয়ে যাওয়ার পর তাদের অভিভাবকদের ওপর যে বিভীষিকা চালানো হয়েছিল, তা তাদের অজানা। এখন এসে বাড়ি-ঘরের ধ্বংসস্তূপ দেখে তারা শোকে-দুঃখে-ক্ষোভে পাথর হয়ে গেল। অগত্যা ঈগল তাদেরকে নাঈমাদের বাড়িতে নিয়ে গেল।

দুই তরুণীকে নিয়ে ঈগল যখন নাঈমাদের বাড়িতে পৌঁছল, তখন সকাল ৬টা বাজে। এখন পড়ল আরেক সমস্যায়। তা হল মার্কিনিদের গাড়ি। এটা কী করবে তা নিয়ে সে ভাবতে লাগল। নাঈমা পরামর্শ দিল গাড়িটা তাদের গ্যারেজে লুকিয়ে রাখতে। ঈগল তাতে সায় দিল না। সে চাচ্ছে এ আপদ এখনই বিদায় করতে। সহসা তার মাথায় একটি নতুন কৌশল কাজ করল। মার্কিনিদের এই সামরিকযানটি নিয়ে সে বাগদাদের তুলনামূলক জনবিরল এলাকায় গেল। তারপর গাড়ির ড্রাইভিং ছিটের নিচে একটি শক্তিশালী বোমা রেখে নিজে গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত সেখান থেকে চলে এল। এখন যে কেউ এই গাড়ি চালাতে উঠবে, গাড়িসহ সে নিশ্চিত মারা পড়বে। তবে এটা সত্য যে, কোনো ইরাকি এ গাড়ি চালাতে আসবে না।

মার্কিনিদের সাঁজোয়াযানটি তাদের জন্যই মৃত্যুফাঁদে পরিণত করে ঈগল পুনরায় চলে এল নাঈমাদের বাসায়। এসে দেখল, নাঈমাসহ বাসার সবাই নাস্তা নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাই দেরি না করে সে তাদের সাথে নাস্তা খেতে বসে গেল।

নাস্তাপর্ব শেষ হওয়ার পর জাফর মূসা সাহেব বললেন, 'আজ রাতে আমরা কেউই এতটুকু ঘুমুতে পারিনি। এখন সবাই আচ্ছামতো ঘুমিয়ে নাও।'

'আপনারা সবাই ঘুমান; আমার ঘুম হবে না' – ঈগল বলল – 'আমি এখনই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে বের হব। কেননা, মার্কিনিরা যেভাবে হণ্যে হয়ে তাঁকে খুঁজছে, তাতে যেকোনো সময় তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। আর তখন তাঁর জীবনের অনেক অজানা বিষয় অজানাই থেকে যাবে।'

'ঈগল ভাইয়া! প্রেসিডেন্ট সাহেবের বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে আমি তোমার কাছে একটি দিন সময় চেয়েছিলাম' – নাঈমা বলল – 'আর সেই দিনটি হল আজ। সুতরাং আমি তথ্য নিয়ে আসি; তুমি ঘুমাও।'

'ও আচ্ছা। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার থেকে তথ্য নিতে হবে দেখা করার জন্য' – ঈগল বলল – 'তা তুমিও তো রাতে ঘুমাওনি। তোমার এখন ঘুমের প্রয়োজন। তুমিও ঘুমাও। ঘুম থেকে উঠে তারপর তথ্য আনতে যেয়ো। আমি তাহলে রাতে যাব প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে।'

'ঠিক আছে। তাহলে এখন সবাই আমরা ঘুমাই' – নাঈমা বলল – 'ঘুম থেকে উঠে যার-যার কাজ করব।'

নাঈমার কথায় সায় দিয়ে সবাই ঘুমাতে গেল। ঈগলকে দেওয়া হল দোতলার মেহমানখানায় ঘুমুতে। রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে শুতে গেল। কিন্তু বিছানায় শুয়ে সে শুধু এপাশ-ওপাশ করছে; চোখে ঘুম আসছে না। তার মনে ভেসে উঠছে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের স্মৃতি। কত প্রভাবশালী ছিলেন তিনি। অথচ আজ জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ইঁদুরের মতো। আর হানাদাররা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বুনো বিড়ালের মতো হণ্যে হয়ে। সে কি পারবে তাঁর সাথে দেখাত করতে? নাঈমা কি বিকালের মধ্যে তাঁর বর্তমান অবস্থান জানাতে পারবে? মেয়ে মানুষ হয়ে সে এত খবর রাখে কী করে? আসলেই সে একটি কর্মক্ষম মেয়ে। রাতের অভিযানে সে তার কর্মদক্ষতার যে স্বাক্ষর রেখেছে, তা অতুলনীয়।

ঈগল বিছানায় শুয়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের স্মৃতিচারণ করতে-করতে যখন নাঈমার স্মৃতিচারণে প্রবেশ করল, তখন তার হৃদয়ে অন্য রকম এক অনুভূতির শিহরণ জাগরূক হল। তার মনে পড়ল, রুকাইয়া তাকে নাঈমার বাসায় পাঠিয়েছিল বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য। অথচ সে ব্যাপারে কোনো কথাই হল না তার সাথে। ভাবল, ঘুম থেকে ওঠে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় নাঈমাকে সবকিছু বলবে। কিন্তু কী বলবে তাকে

সে? ভাবতেই এক রাশ লজ্জা জড়িয়ে ধরল তাকে। এরই ফাঁকে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল, তা নিজেও টের পেল না।

ঈগলের যখন ঘুম ভাঙল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সজাগ হয়ে দেওয়ালে সাঁটানো ঘড়ির দিকে দৃষ্টি যেতেই সে চমকে উঠল। এত সময় তো তার ঘুমানো ঠিক হয়নি! শোওয়া থেকে সে তড়াক করে উঠে বসল। দ্রুত খাট থেকে নেমে বাথরুমে গেল। ওজু-গোসল সেরে জোহরের সালাত আদায় করল। তারপর নাঈমার খোঁজে তৃতীয় তলায় গেল। নাঈমার আম্মিজান সালেহা বেগম জানালেন, সে বাড়িতে নেই। বেলা ১১টার দিকে প্রেসিডেন্টের তথ্য সংগ্রহে গেছে। অগত্যা সে দোতলার রুমে চলে এল এবং নাঈমার ফেরার অপেক্ষায় থাকল। মনে-মনে সে মেয়েটির তারিফ না করে পারল না। দায়িত্বজ্ঞানের প্রতি মেয়েটির অতিশয় সচেতনা তাকে সত্যিই অভিভূত করল।

ঈগলের সহসা রুকাইয়ার কথা স্মরণ হল। সে যে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে এ বাড়িতে পাঠিয়েছিল, সে ব্যাপারে তো কোনো কথাই হলো না। তাই ভাবল, নাঈমা ফেরার পূর্বেই তার আম্মিজানের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনাটা সেরে নিবে কিনা! একথা ভাবতেই এক রাশ লজ্জা-জড়তা তাকে চতুর্দিক থেকে গ্রাস করল। সেই সাথে এই চিন্তাও তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে, নাঈমার পছন্দের বিষয়টি তার আম্মিজান নাও জেনে থাকতে পারেন। তাছাড়া, তাঁর একমাত্র আদরের দুলালীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার মতো কোন যোগ্যতাটা তার আছে!

ঈগল মেহমানখানার সোফায় বসে যখন উক্ত চিন্তায় মগ্ন, তখন সেখানে কারো আগমনধ্বনি শোনা গেল। সে দরজায় তাকিয়ে দেখল, সালেহা বেগম আসছেন। তাঁকে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল।

'বেটা ঈগল! নাঈমার ফিরতে হয়ত আরো দেরি হবে। তুমি 'খানাটা খেয়ে নাও!' সালেহা বেগম বললেন।

'তা হয় না চাচিজান!' – ঈগল বলল – 'নাঈমা ফিরে এলে খাব। তাছাড়া আমার তেমন ক্ষুধাও পায়নি।'

'বেটা! তুমি যাবে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করতে। নাঈমা ফিরলে হয়ত খাওয়ার সময়ও তুমি পাবে না। তাই এসো! সময় থাকতে এক্ষুনি খাবারটা খেয়ে নাও।' জোর দিয়ে বললেন সালেহা বেগম। এ যেন মায়ের আদেশ; এমনই ঠেকল ঈগলের কাছে।

ঈগল আর কিছু বলার সাহস করল না। সালেহা বেগমের পিছু-পিছুই ডাইনিং রুমের দিকে চলল। সালেহা বেগম আগেই দস্তরখানে খাবার সাজিয়ে রেখেছিলেন। ঈগল শুধু হাত ধুয়ে বসে গেল। খানা খাওয়ার অবসরে সালেহা বেগম ঈগলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বেটা ঈগল! তোমাকে একটি প্রশ্ন করি – একান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তুমি আবার কিছু মনে কর না যেন।'

'চাচিজান! আপনার যত ইচ্ছা-যতগুলো ইচ্ছা প্রশ্ন করুন, আমি কিছুই মনে করব না।' ঈগল বলল।

'আচ্ছা! তাহলে বলো তো! তুমি বিয়ে করেছ কি?' স্বলজ্জ্বভাবে-সংক্ষিপ্তভাবে সালেহা বেগম প্রশ্নটি করে ফেললেন।

'চাচিজান! সেই সুযোগটা এখনো হয়ে ওঠেনি' – এতটুকু বলেই ঈগল নিশ্চুপ হয়ে গেল। মাথাটা নীচু করে খাবারেই মগ্ন রইল। লজ্জা তাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে।

'বেটা! তুমি রণাঙ্গনের সৈনিক। সাংসারিক জীবনের চেয়ে ময়দানই তোমার অধিক পছন্দ, সেটা আমি জানি' – সালেহা বেগম বললেন – 'কিন্তু তাই বলে পারিবারিক জীবনটাকে একেবারে উপেক্ষা করাও উচিত নয়। এটা আমাদের রাসূলের সুন্নতও নয়। তাকিয়ে দেখো তো তাঁর জীবন! নবুয়তপ্রাপ্তির পর কোন বছরটিতে তিনি স্বস্তিতে কাটিয়েছেন! তদুপরিও তিনি বিবাহ-শাদী করেছেন। সংসারকে পাশ কাটাননি। তাই তুমিও অতিশীগ্র বিবাহের কাজটি সেরে ফেল! কী বল?

'চাচিজান! আপনার সাথে আমিও একমত' – ঈগল বলল – 'কিন্তু আমার মতো ভবঘুরে ছেলেকে মেয়ে দেবে কে? যার জীবন সদা মৃত্যুর ময়দানে ঘোরাফেরা করে, যার না আছে কোনো বসত, না আছে নির্দিষ্ট কোনো আশ্রয়।'

এদিকে সালেহা বেগম ও ঈগল যখন ডাইনিং রুমে আলোচনায় রত, তখন বাড়িতে প্রবেশ করল নাঈমা। সে আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে চুপি-চুপি ডাইনিংয়ের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গেল। খুশিতে তার প্রাণটা নেচে উঠল। অন্যরকম এক আনন্দের শিহরণ ঢেউ তুলল হৃদয়-সরোবরে। ভালোলাগার এক তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাকে জড়িয়ে ধরল। সে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইছে; কিন্তু পারছে না! পাদুটো যেন আটকে গেছে ফ্লোরের সাথে। তাই দাঁড়িয়ে আলোচনার পরবর্তী অংশ শোনায় মগ্ন রইল। সে তো শুনতে পাচ্ছে তার মায়ের কণ্ঠ–

'বেটা! বর্তমান অবস্থায় প্রায় প্রতিটি ইরাকি নাগরিকই আশ্রয়হীন উদ্বাস্তুর কাতারে শামিল। তোমার বিবাহের জন্য এটা কোনো সমস্যা নয়। তুমি তো দেশকে শত্রুমুক্ত করার লড়াইয়ে একজন বীর সিপাহী। তুমি দেশ ও জাতির গৌরব। বলো! কে তোমাকে মেয়ে দেবে না? তোমার আপত্তি না থাকলে আমিই তোমার কাছে মেয়ে বিবাহ দিতে প্রস্তুত! বল! তুমি রাজি কিনা?

সালেহা বেগমের এমন আকস্মিক প্রস্তাবে ঈগল হয়রান হয়ে গেল। যেখানে সে নিজে এমন কিছু বলার কথা ভেবে সালেহা বেগমের গোস্বার ভয়ে চুপসে গিয়েছিল, সেখানে স্বয়ং তিনিই এই প্রস্তাব দিলেন! এ যে প্রত্যাশার চেয়ে বহুগুণ বেশি পাওয়া! অপ্রত্যাশিত এই প্রাপ্তিতে সে লজ্জায় অধোবদন হল। খাওয়ার কোনো রুচি আর তার রইল না। পারলে সে এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেত। সেটা অভদ্রতা হবে ভেবে শান্তভাবেই প্রস্থানের জন্য দাঁড়াল। আর ক্ষীণ কণ্ঠে

ছোট্ট একটি জবাব দিল, 'জি; আমি রাজী!' এতটুকু বলেই সে ঝড়ের গতিতে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে দরজার কাছে দণ্ডায়মান নাঈমার অবস্থা তখন তড়িতাহত ব্যক্তির মতো। সে তার নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এ যে বাস্তব ঘটনা, তাও তার দেমাগে ধরছে না। মনে হচ্ছে, সে স্বপ্নে বিচরণ করছে। সে একেবারে আত্মভোলা হয়ে গেল। এখন যে এ স্থান থেকে তার সরে যাওয়া উচিত, তাও সে ভুলে গেল। আর এই ভুলের মাশুল তাকে তাৎক্ষণিকভাবেই দিতে হল। কেননা, সে যে দরজার কাছটিতে দাঁড়ানো তা তো অন্য কারো জানা নেই। তাই ঈগল যখন ঝড়গতিতে ডাইনিং থেকে বেরুল, তখন তার সাথে খেল একটা ধাক্কা। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় ঈগল হায় আল্লাহ্! বলে কুঁকিয়ে উঠল। নাঈমা কোনো শব্দ করল না। ভাগ্য ভালো যে, সে পড়ে যাওয়ার আগেই ঈগল তার হাত ধরে ফেলল।

'সরি! আমি বুঝতে পারিনি '– ঈগল অনুশোচনার সুরে বলল – 'এখানে কেউ থাকতে পারে ভাবিনি। তুমি বাসায় ফিরলে কখন?'

ঈগলের হাল্কা চিৎকার ও পরে কারো সাথে কথা বলার শব্দে সালেহা বেগম দরজার দিকে আসতে আসতে বললেন– 'কী হয়েছে বেটা? কে ওখানে? কার সাথে কথা বলছ তুমি?'

মায়ের আগমন টের পেয়ে নাঈমা দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। ঈগলের পরিবর্তে সে নিজেই উত্তর দিল– 'কিছু হয়নি আম্মিজান! আমি এসে গেছি।'

'তুমি কখন এলে মা-মণি? দরজায় পৌঁছে সালেহা বেগমের জিজ্ঞাসা।

'এই তো এইমাত্রই তো আমি এলাম আম্মিজান!' কিছুটা জড়তা নিয়ে নাঈমা বলল। কেননা, সে এসেছে কিছুক্ষণ পূর্বে, যা অন্য কেউ না জানলেও সে নিজে তো জানে। তাই এই সামান্য মিথ্যার জন্য তার জড়তা। যারা সর্বদা সত্য বলে, তারা একটু-আধটু মিথ্যাতেও ঘাবড়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

'চলো বেটী। হাত-মুখ ধুয়ে খাবারটা খেয়ে নাও' – সালেহা বেগম বললেন – 'আর ঈগল বাবাজি! তুমি ততক্ষণে মেহমানখানায় বিশ্রাম নাও।'

'আম্মিজান! আমি খানা পরে খাব' – নাঈমা বলল – 'ঈগল ভাইয়া! চলো তোমার রুমে। প্রেসিডেন্টে সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে হলে এখনই তোমরা রওনা হয়ে যেতে হবে। তোমাকে আমি ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিয়ে তারপর খানা খাব।'

'বেলা অনেক হয়েছে নাঈমা! তুমি গিয়ে খাওয়া শুরু করো' – ঈগল বলল – 'আমি তোমার পাশে বসে ঠিকানাটা নোট করে নিচ্ছি।'

'হ্যা, সেটাই ভালো হয়। চলো মা-মণি!' সালেহা বেগম বললেন। কথামতো ঈগল ডাইনিং সোফায় বসল। নাঈমা ফ্রেশ হতে বাথরুমে গেল। আর তার আম্মিজান দস্তরখানে তার জন্যে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন।

'ঈগল ভাইয়া! রাত ১১টা নাগাদ তোমাকে তিকরিতে পৌঁছতে হবে' – নাঈমা খাবার খেতে-খেতে বলল – 'সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ-পূর্বে আদ-দাওয়ার গ্রামে চলে যাবে। তিকরিত শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৫ মাইল। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটি বাজার পাবে। বাজারে ছোট-বড় অনেকগুলো দোকানের দেখা মিলবে। এর মধ্যে সব থেকে পিছনের দিকে একটি কসমেটিকসের দোকান পাবে। দোকানীর নাম আলী আবদুল্লাহ সালেহ। ঐ দোকান পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছতে হবে। এরপর সেখান থেকে তোমাকে গাইড করা হবে।'

'বহুত আচ্ছা! তোমাকে অসংখ্য মোবারকবাদ নাঈমা' – ঠিকানা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঈগল বলল – 'আমি তাহলে দেরি না করে এখনই রওনা দিলাম, আল্লাহ হাফেজ।'

বলেই রুম থেকে বেরুল ঈগল। তাকে এগিয়ে দিতে সালেহা বেগম বাড়ির সদর গেট পর্যন্ত তার পিছন-পিছন চললেন। নাঈমারও ইচ্ছা জাগল, প্রিয় মানুষটিকে বিদায় জানাতে। অন্যদিন হলে ঠিকই যেত। কিন্তু খানিক পূর্বের শোনা কথাগুলো তাকে এক অদৃশ্য লজ্জানুভূতির জালে আটকে দিল, যা ছিন্ন করে বের হওয়া তার পক্ষে এ মুহূর্তে অসম্ভব। তাই যথাস্থানে বসেই প্রিয়তমের জন্য প্রভূর দরবারে কল্যাণ কামনা করে চলল।

ঈগল যখন গেট দিয়ে গাড়ি বের করে সালেহা বেগমকে বিদায়ী সালাম জানাল, তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বেটা! তুমি প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে সাক্ষাতপর্ব শেষ করে অন্য কোনো প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার আগে আমার সাথে দেখা করবে?'

'চাচিজান! আমি আপনার কথা রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ!' এই বলে ঈগল তিকরিতের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালিয়ে দিল এবং মুহূর্তেই সালেহা বেগমের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ছয়.

'পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান সামান্য সময়ের; ঠিক একজন পথচারীর পথে অবস্থানের মতো।' এই একটি বাক্যের তাৎপর্য হল মানুষের গোটা জিন্দেগী। কিন্তু মানুষ এই কথাটি জেনে-শুনে ভুলে যায়। অধিকাংশ মানুষের জীবন-যাপন আর কর্মপদ্ধতি এই বাক্যটিকে সরাসরি অস্বীকারের শামিল। তারা বাক্যটিতে উল্টে দিতে চায়! তাদের বাস্তব জীবন এই ঘোষণারই বহিঃপ্রকাশ যে, দুনিয়ায় তাদের অবস্থান অনন্তকালের। সে যেন পৃথিবীর স্থায়ী অধিবাসী। সে তার বাড়িকে সাজায়। এক তলাকে দুই তলা বানায়। দুই তলাকে পাঁচ তলা। একটি থাকলে দুটা বাড়ায়; দুটা থাকলে তিনটি। নানা রকম বিশাল সামগ্রী সংগ্রহে

প্রতিযোগিতা করে। সবকিছুতে নান্দনিকতার ছোঁয়া ফোটাতে ব্যস্ত সময় পার করে। তার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলে। কিন্তু আল্লাহপাক যখন পাকড়াও করেন, তখন বড়-বড় রাজা-বাদশাহও ফকিরে পরিণত হয়। বিলাসবহুল প্রাসাদওয়ালারাও মাটিতে গড়াগড়ি খায়। আফসোসের কিস্তিতে সওয়ার হয়ে জিন্দেগীর বাস্তবতা থেকে পলায়নের পথ খোঁজে। কিন্তু জিন্দেগী তার সাথে তখন বড়ই উপহাস করে, তাকে দুনিয়ার কাছে পরিহাসের পাত্র বানায়।

ঈগল ইরাকের এককালের প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বর্তমান জীবন-যাপনের দৃশ্য অবলোকন করে উপরোক্ত কথাগুলো ভাবছিল। যার কথা দূরে থাক, ইশারা পালনের জন্য ডজন-ডজন খাদেম-খাদেমাহ সর্বক্ষণ সতর্ক থাকত। আজ তাঁর ফেরারি জীবনের কেউ সঙ্গী হতে চায় না। একপ্রকার নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করছেন তিনি। তাঁর জীবন-যাপনের এই বাস্তব চিত্র দ্বিতীয়বার দর্শনে ঈগলের হাসিও পেল, আবার কান্নাও এল। কিন্তু সে হাসলও না, কাঁদলও না। কেননা, এ যে নিয়তির নির্মম পরিহাস! এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়! এটা হাসি-কান্নার কোনো বিষয় নয়। তবে তার ইচ্ছা করছে, চিৎকার দিয়ে জগদ্বাসীকে এই ঘোষণা শুনিয়ে দিতে– ওহে ক্ষমতাপাগল শাসকগোষ্ঠী! ক্ষমতার দম্ভে যারা অন্ধ হয়ে আছে, ওহে বিলাসিতার পিছনে ছুটনেওয়লাগণ একবার এসে দেখে যাও! প্রতাপশালী এক রাষ্ট্রনায়ক, যিনি জান্নাতসম আট-দশটি প্রাসাদ গড়েছিলেন, তিনি আজ কী নিদারুণ পরিণতি বহন করেছেন! দেখে যাও তোমরা তাঁর শেষ সম্বল! দেখে যাও কীভাবে তিনি বেঁচেও মরে আছেন।

◆ ◆ ◆

জান্নাতুল নাঈমার দেওয়া ঠিকানামতে ঈগল প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাক্ষাত পাওয়ার নিমিত্তে তিকরিত শহরে আগমন করল। শহর ছেড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যখন গাড়ি ছাড়ল, তখন রাত এগারোটা পার হয়ে গেছে। ঈগল দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। নাঈমা তাকে ১১টার মধ্যে আদ-দাওয়ার এলাকায় পৌছতে বলেছিল। তাই গাড়ির গতি সর্বোচ্চ করল। অবশেষে ১১টা ২০ মিনিটে সে গন্তব্যে পৌছাল। সেখান থেকে তাকে গাইড করে একটি বাড়িতে নেওয়া হল। বাড়িটা সাদ্দাস হোসেনের পুরনো এক বন্ধুর। এই বাড়িরই কোনো এক গোপন কক্ষে তিনি অবস্থান করছেন।

ঈগলকে প্রথমে বাড়ির সামনের কামরায় বসিয়ে রাখা হল। কিছুক্ষণ পর তিনজন তরতাজা যুবক এসে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই তার চোখদুটো বেঁধে ফেলল। ঈগল নির্লিপ্তের মতো বসে রইল। অবশ্য এ ব্যাপারে পূর্বেই তাকে অবহিত করা হয়েছিল। এই যুবকরা হল সাদ্দামের ফেরারী জীবনের পাহারাদার। নির্দেশমতো ঈগল উঠে তাদের সাথে হাঁটা দিল। কিছু সময় হাঁটার পর একস্থানে থেমে গেল। এর মধ্যে অবশ্য পাঁচটা কামরা ঘুরে একবার বাইরে

নিয়ে পুনরায় ঘরে ঢোকানো হয়েছে। এবার চোখের কাপড় খোলা হল। তারা যেখানটিতে দাঁড়ানো তার সামনে একটি লিফ্‌ট। এক যুবক সুইস চাপতেই দরজা খুলে গেল। সবাই লিফটে চড়ল। ভিতরের একটা সুইচ চাপতেই লিফ্‌ট চলতে শুরু করল।

ঈগল এই দোতলা বাড়িটিতে লিফ্‌ট দেখে প্রথমেই অবাক হল। দ্বিতীয়বার অবাক হল লিফ্‌ট চলার গতি দেখে। লিফটের কাউন্ট নির্দেশক সিম্পলটির নির্দেশনা নিচের দিকে। চার সেকেন্ড চলার পর থেমে গেল সেটি। আরও এক সেকেন্ড পর দরজা খুলল। এবার তৃতীয় বিস্ময়। সম্মুখেই প্রশস্ত একটি কম্পাউন্ড। মাটির নিচের কম্পাউন্ডটি একেবারেই ফাঁকা। তিন গার্ড যুবকের সাথে ঈগলও সামনের দিকে হাঁটা দিল। সেখান থেকে সামনে গিয়ে আরেকটি দরজা খোলা হল। এটিও সুইসসিস্টেম ডোর। এবার চতুর্থ বিস্ময়! দরজাঘেঁষে নিচে নেমে গেছে একটা সিঁড়ি। জায়গাটা অন্ধকার। কিন্তু সমস্যা হল না। এটি হল মুভিং ল্যাডার বা চলন্ত সিঁড়ি। কয়েক সেকেন্ডেই নিচে পৌঁছল তারা। এবার বাতি জ্বালানো হল। সম্মুখেই দেখা গেল একটা খাট। আর তাতে শুয়ে আছেন এক ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কম্বলাবৃত; চেনা গেল না।

ঈগলকে গাইড করে নিয়ে আসা যুবকত্রয় এই প্রথম মুখ খুলল। খাটে শোওয়া ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। তাঁর ঘুম ভাঙা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।' এই বলে তারা সেখান থেকে চলে গেল। ঈগল চেয়ারটা সাদ্দাম হোসেনের মাথার কাছে এগিয়ে নিয়ে বসল। অপেক্ষা তাঁর ঘুম ভাঙার।

মধ্যরাতেরও অনেক পরে সাদ্দাম হোসেনের ঘুম ভাঙল। ঈগল তাঁকে দাঁড়িয়ে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আনমনা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। খানিক বাদে তিনি শোওয়া থেকে উঠে বসলেন। সেই সাথে ঈগলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি বাগদাদের ঈগল না? কখন এলে বেটা? আমাকে আগেই কেন জাগালে না! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসো!'

'মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব! আমি এখানে এসেছি বেশি সময় হয়নি' – ঈগল বলল – 'আপনার ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে জানাইনি! তা আপনি কেমন আছেন? শরীর-স্বাস্থ্য তো দেখছি অনেক ভেঙে পড়েছে।'

'শরীরটাকে ভেঙেই যেতে দাও বেটা' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'যার রাজ্য ভেঙে গেছে, তার শরীর দিয়ে আর কী হবে! তবে বাহ্যিক শরীর ভেঙে গেলেও মনের শক্তি অটুট আছে। আচ্ছা আমার কথা এখন আলোচ্যসূচি থেকে বাদ রেখে তোমার কথা বলো। ইরাকের জন্য আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তোমার মতো ঈগলদের বাগদাদের আজ ঢের প্রয়োজন। তুমি আমার সাথে আর দেখা করনি কেন? বহুদিন যাবৎ তোমার সাক্ষাতের জন্য মন ছটফট করছিল। তোমার সাথে আমার জরুরি কিছু কাজ আছে।'

'প্রেসিডেন্ট সাহেব! আল্লাহর অশেষ কৃপায় বর্তমানে আমি ভালো ও সুস্থ আছি' – ঈগল বলল – 'তবে দ্বিতীয়বার আপনার সাথে মিলিত হব ভাবিনি। কারণ, আমি মার্কিনিদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। আপনি জানেন না, ওরা ইরাকের কারাগারগুলোকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। ওখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারা ভাগ্যের বিশেষ দান! আমি বলি জীবন দ্বিতীয়বার ফিরে পাওয়া' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'কিন্তু তুমি মুক্তি পেলে কী করে বেটা?'

'ওরা আমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল' – ঈগল বলল – আর এজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে একটি মেয়ে। মূলত সে মুক্তিপণের মাধ্যমে একাজে সফলতা লাভ করেছিল।'

'বেটা ঈগল! তুমি তো আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিলে!' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'একজন মেয়ে তোমাকে মুক্ত করল! তাও আবার মুক্তিপণের বিনিময়ে! কে সেই মেয়ে? কী ছিল সেই 'পণ'? আমাকে খুলে বলো তো বেটা! বিষয়টা আমার বুঝে আসছে না!'

সাদ্দাম হোসেনের কৌতূহল দেখে ঈগল মুচকি হাসল। তারপর তাঁর কৌতূহল নিবারণের জন্য বলল, 'প্রেসিডেন্ট সাহেব! আজ ইরাকের কন্যা-জায়া-জননীরাও জেগে উঠেছে। তাঁরা অস্ত্রহাতে ময়দানে নেমেছে। দেশকে হানাদারমুক্ত করতে বজ্রশপথ নিয়েছে।

এভাবে ঈগল ইরাকি কন্যাদের সাফল্যগাথা, তাদের সংঘবদ্ধ অভিযানের বিবরণ, রুকাইয়ার পরিচয়, তাকে উদ্ধারে রুকাইয়ার পরিকল্পনা, বিদেশি সাহায্যকর্মীদের অপহরণ, তাদেরকে 'মুক্তিপণ' হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনা বিস্তারিত সাদ্দাম হোসেনকে জানাল।

সব শুনে সাদ্দাম হোসেন একটি তৃপ্তির হাসি হাসলেন। যুদ্ধ শুরুর পর তিনি এই প্রথম মন খুলে হাসলেন। তার কারণও ব্যক্ত করলেন এভাবে– 'বেটা ঈগল! শত হতাশার মাঝে তুমি আমাকে একটি খোশখবর শোনালে। যা শুনে খুশিতে আমার দিলটা ভরে গেল। আজ বহু মাস পর আমি হাসলাম। আমার পক্ষ থেকে ইরাকি অগ্নিকন্যাদের বিপ্লবী সালাম পেশ করবে। সেই সাথে আমার কারণে তাদের এই কঠিন পথে নামতে বাধ্য হওয়ায়, আমার হয়ে তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে। আর রুকাইয়া আম্মিজানের জন্য আমার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পুরস্কার নিয়ে যাবে।'

'শুকরিয়া প্রেসিডেন্ট সাহেব! শুকরিয়া। আপনার আজ্ঞা যথারীতি পালিত হবে' – ঈগল বলল – 'এবার বলুন! আমাকে আর কী-কী কাজ করতে হবে?'

'বেটা! তুমি খানিক বসো; আমি আসছি।' বলেই সাদ্দাম হোসেন খাট থেকে নামলেন এবং চলে গেলেন পাশের রুমে। ফিরলেন বড় একটা লাগেজ নিয়ে। ঈগল দেখল, সেটা বহন করতে তার কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত উঠে গিয়ে সে তাঁর হাত থেকে নিজহাতে নিল।

সাদ্দাম হোসেন লাগেজটা ঈগলের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে খাটে গিয়ে বসলেন। ঈগলকে বললেন লাগেজটা তাঁর সম্মুখে তুলে রাখতে। ঈগল তা-ই করল। তিনি নিজহাতে সেটা খুললেন। ঈগল দেখল, লাগেজটা ডলারে ভর্তি। তিনি ঈগলকে বললেন, 'বেটা! এগুলো তুমি নিয়ে যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপকারে আসবে। আর এই সবুজ কাপড়ে মোড়ানো হীরের নেকলেসটা আসাদকন্যা রুকাইয়াকে দিবে। এটা তার বীরত্বের এনাম। আর হ্যাঁ, এই চিঠিটা তোমার কাছে হেফাযত করে রাখবে। এর ব্যাপারে বিস্তারিত তোমাকে পরে জানাচ্ছি।'

ঈগল সাদ্দাম হোসেনের হাত থেকে শুধু সবুজ কাপড় জড়ানো নেকলেস ও চিঠিখানাই নিল। ডলার নিতে অস্বীকৃতি জানাল। বলল, 'প্রেসিডেন্ট সাহেব! রণাঙ্গনের চেয়ে আপনার ফেরারি জীবনে এই অর্থ বেশি কাজে আসবে। আমাদেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার পূরণের রাস্তাও খোলা আছে। একটু চেষ্টা করলেই আমরা অর্থের জোগান দিতে পারব; আপনার জন্য এই সুযোগ নেই। সুতরাং এই অর্থগুলো আপনার হেফাযতেই রেখে দিন।'

'বেটা ঈগল! আমার অর্থের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'আমি হয়ত অল্প দিনের মধ্যে মার্কিনিদের হাতে গ্রেফতার হব! সে রকম কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই এই অর্থগুলো আমার কাছে রেখে মার্কিনিদের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে মুক্তিযোদ্ধা-মুজাহিদদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া কি ভালো নয়?'

'সেটা অবশ্যই ভালো!' – ঈগল বলল – 'কিন্তু আপনাকে যে শত্রুরা শীঘ্রই গ্রেফতার করতে যাচ্ছে সেটা কিভাবে টের পেলেন? আপনি যদি নিরাপত্তা-সংকট অনুভব করেন, তাহলে আপনাকে আমার কাছে নিয়ে যাব। আমি নিজে আপনার হেফাযতের দায়িত্ব পালন করব ইনশাআল্লাহ্।'

'শুকরিয়া হে বাগদাদের ঈগল! শুকরিয়া!' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'আজ এ-ই প্রথম স্বেচ্ছায় কেউ আমার হেফাযতের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তোমার আন্তরিকতায় আমি খুবই প্রীত; আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এই কামনা করি। তবে তোমার প্রস্তাবটি আমি গ্রহণ করতে পারছি না বেটা। তুমি আবার মনে কষ্ট নিও না যেন।'

'প্রেসিডেন্ট মহোদয়! জানি না কী কারণে আপনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারছেন না' – ঈগল বলল – 'নাকি আমাকে এই দায়িত্ব পালনের অযোগ্য ভাবছেন? কণ্ঠে তার অনুযোগের সুর।'

'ব্যাপারটা এমন নয় বেটা!' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'তুমি মুক্তির সৈনিক! দেশকে শত্রুমুক্ত করা তোমার ব্রত। আমার মোহাফেযের দায়িত্ব কাঁধে নিলে তোমার আসল কর্তব্যে বিঘ্ন ঘটবে। এটা হতে দেওয়া যায় না। আমি আপন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে দেশের স্বার্থে আঘাত হানতে চাই না। ঐ নিরাপত্তা আমাকে সারাক্ষণ পীড়া দিবে।'

'মাননীয় প্রেসিডেন্ট! আপনার সাথে আমিও একমত' – ঈগল বলল – 'তবে আমাদের চলমান লড়াইকে বেগবান রাখতে আপনার নিরাপদে থাকা একান্ত জরুরি। আমার কথায় বেয়াদবি নিবেন না। আপনার অতীত জীবনের বহু কর্মকাণ্ডের জন্য আপনাকে অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু হানাদার-কবলিত ইরাকে আপনাকে আমরা কাছে পেতে চাই।'

'বেটা ঈগল! আমাকে ক্ষমা করো তুমি' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'আমাকে আমার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দাও। আমি আমার বর্তমান গার্ডদেরও ছুটি দিয়ে দেব। আমি একাকি নির্জনে সময় কাটাব। সুযোগ পেলেই তোমাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে শরিক হব। মনে করতে পার, আমি তোমাদের সাথেই আছি। ভেবো না, আমি যুদ্ধের ময়দানকে ভয় পেয়ে নির্জনবাস অবলম্বন করতে যাচ্ছি। বরং আমার শরীরে জটিল কিছু রোগ বাসা বেঁধেছে। এর জন্য উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। দেশে যা হওয়ার নয় আর বিদেশেও তো যাওয়ার পথ খোলা নেই। অবশ্য পথ হলেও আমি যাব না। কারণ, দখলদাররা তাহলে আর আমাকে দেশের মাটিতে ফিরতে দিবে না। তাই মরতে হলেও দেশের মাটিতেই মরব। এ আমার চিরকালীন ইচ্ছা।'

'প্রেসিডেন্ট মহোদয়! আমার কথাটি আমি প্রত্যাহার করলাম। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আল্লাহর কাছে সেই দু'আ-ই করি' – ঈগল বলল – 'তবে একটি আর্জি! সকল গার্ডকে ছুটি দিবেন না। সেটা ঠিকও হবে না।'

'বেটা! গার্ডদের আমি অনিচ্ছায় বিদায় করতে চাচ্ছি' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'আমার গ্রেফতারের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এদের জন্যেই।'

'সেটা কেমন!' ঈগল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ, মার্কিনিরা আমার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সাদ্দাম হোসেন।

'জ্বি; আড়াই কোটি ডলার ঐ ঘোষণার মূল্যমান!' ঈগলের উত্তর।

'ঐ ঘোষণার পর থেকেই দু-তিনজন গার্ডের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে। নিবেদিতপ্রাণ গার্ডরা বিষয়টি আমার গোচরে আনে এবং অভিযুক্তদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে। ইতিমধ্যে উক্ত গার্ডরা তাঁবেদার ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের বেশ কজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করেছে বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

'কী ধরনের প্রমাণ?' ঈগল জিজ্ঞেস করল।

'ঐ গার্ডদের মাধ্যমে তাঁবেদর গভর্নিং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি সমঝোতা বার্তা পাঠানো হয়েছে' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'বার্তায় এমন কিছু শর্ত রাখা হয়েছে, যা যুদ্ধ শুরুর বহু পূর্ব থেকে মার্কিনিরা আমার কাছে পেশ করে রেখেছিল। কিন্তু তখনই যখন ওগুলো মানিনি, এখন আর মানব কেন? এর দ্বারা ঐ গার্ডদের অফাদারি প্রশ্নবিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়।'

'তা ঠিক। যুদ্ধের পূর্বে মানলে হয়ত এত ধ্বংসযজ্ঞ ঘটত না' – ঈগল বলল – 'সেই তখনই যখন মানেননি, ধ্বংসযজ্ঞের পর মেনে কী লাভ?'

'বেটা! তুমি বুঝতে পারছ না!' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'এ এমন শর্ত, যা মানলেও ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হত না। এখন হচ্ছে প্রকাশ্য ধ্বংস, তখন হত নীরব ধ্বংস। ঐ অবস্থায় কোনো প্রতিরোধ যুদ্ধেরও সুযোগ থাকত না; তোমরা এখন যেটা লড়ছ। এজন্যেই আমি শর্তগুলো মানতে রাজি হইনি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি কারবালার মধ্য দিয়েই মুসলিমদের ঈমান জেগে ওঠে। আর জাগ্রত ঈমানের সামনে যেকোনো বাতিল শক্তি পরাজিত হতে বাধ্য!'

'শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট! আপনি অসুস্থ। এ অবস্থায় কম কথা বলাই শ্রেয়। কিন্তু আমি কথার মাধ্যমে আপনাকে বসিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছি' – ঈগল বলল – 'তা এ কারণে যে, অনেক জরুরি বিষয় জানতে পারছি। বিধায় আপনাকে আর একটু কষ্ট দিতে চাই, ক্ষমা করে দিবেন।'

'বেটা! আমার এই ফেরারি জীবনের অধিকাংশ সময় একাকিত্বে কাটে' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'কথা বলার মতো উপযুক্ত কাউকে কাছে পাই না। আজ অনেক দিন পর তোমাকে দ্বিতীয়বার পেলাম। জানি না, তোমার সাথে আর দেখা হবে কিনা। তোমার সাথে মন খুলে কথা বলতে ভালো লাগবে। মনের মধ্যে চেপে থাকা অনেক কষ্ট বিদূরিত হচ্ছে। তুমি আর কী জানতে চাও বলো?'

'সেই সমঝোতা প্রস্তাব সম্বন্ধে কি আমি খানিকটা জানতে পারি?' ঈগলের কণ্ঠে সংকোচ।

'অবশ্যই পার' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'তবে খুব করে স্মরণ রাখবে বেটা! শুধু আমিই নই, যেকোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ইরাকি ঐ শর্ত মানবে না; মানতে পারে না। বেটা! একা তুমিই শুধু নও; বরং গোটা ইরাকবাসীর ঐ শর্তগুলো জানা একান্ত আবশ্যক; নতুবা ইতিহাস কেবল আমাকে দোষারোপ করে যাবে। তুমি পারলে কাগজ-কলম নিয়ে এ কথাগুলো নোট করে রাখো। এগুলোই ইতিহাসে দলিল হয়ে থাকবে।

সাদ্দাম হোসেনের কথামতো ঈগল কাগজ-কলম খুঁজল। জামা ও ব্যাগ খুঁজে শুধু কলম পেল, কাগজ পেল না। কাগজের ব্যবস্থা করলেন সাদ্দাম নিজেই। এবার তিনি পুনরায় বলে চললেন– 'বেটা ঈগল! আমার এই কথাগুলো প্রত্যেক ইরাকির কানে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করবে। কেননা, পশ্চিমাদের ক্রমাগত অপপ্রচারে তাদের মনে এই ধারণা তৈরি হতে পারে যে, তাদের বর্তমান দুঃখ-কষ্ট আর দুর্ভোগ-দুর্দশার জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু-না! আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি মার্কিনি এই সয়লাব ঠেকিয়ে রাখতে। এই তাগুতি সয়লাব বহু পূর্বেই ইরাককে প্লাবিত করে ছাড়ত।'

'যাহোক, তুমি আমার কাছে জানতে চাইছিলে শর্তগুলো সম্বন্ধে। সেগুলো মোটামুটি এরকম–

০১. আমি সিরিয়াসহ অন্যান্য যেসব দেশ গণবিধ্বংসী অস্ত্র সরবরাহ করেছি বলে ওদের ধারণা, সেসব দেশের নাম প্রকাশ করতে হবে।

০২. মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়াখ্যাত জারজ ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

০৩. এই জারজ রাষ্ট্রটায় আমি যে ৩৯ বার মিসাইল হামলা করেছিলাম, তার ক্ষয়ক্ষতি পুষিতে নিতে আমাদের তেলের একটি অংশ ইসরাঈলকে দিতে হবে এবং এ নিয়ে হৈ-চৈ করা যাবে না।

০৪. ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়া তেলের রসিদ বইয়ে আমাকে এই বলে স্বাক্ষর করতে হবে যে, আমি স্বেচ্ছায় ও নিজ উদ্যোগে এই ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি।

০৫. আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি পরিবারকে যে দশ হাজার ডলার করে অনুদান দিতাম, এই কাজটি আমার একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে স্বীকার করতে হবে।

০৬. স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবির প্রতি আমার তথা ইরাকের সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে।

০৭. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল তা স্বীকার করে নিয়ে তাদের পক্ষ ত্যাগ করতে হবে।

০৮. নিষিদ্ধ অস্ত্রের যথেষ্ট মজুদ আমার ছিল আর বর্তমান যুদ্ধ শুরুর পর আমি তা ধ্বংস করেছি কিংবা পাচার করেছি বলে স্বীকারোক্তি দিতে হবে।

০৯. চলমান গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব ওদের দৃষ্টিতে আমার হাতে। তাই দ্রুত গেরিলা যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০. উক্ত শর্তসমূহ পূরণ হলে তারা আমাকে ইরাক ত্যাগের অনুমতি দিবে। এ ব্যাপারে তারা প্রয়োজনে প্রাইভেট বিমানের সহযোগিতা দিতেও প্রস্তুত।'

'প্রেসিডেন্ট সাহেব! মার্কিনিদের শর্তাবলি দেখে আমার সেই ডাকাত বাহিনীর কাহিনীটা স্মরণ হলো।' ঈগল বলল।

'কোন কাহিনী বেটা?'

'একদা এক বাড়িতে ডাকাত ঢুকল। তারা বাড়ির মালিকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করল। তারপর রান্না-বান্না করে খাওয়া-দাওয়া করল। ডাকাত সর্দার বাড়ির মালিকের বেডরুম নিজের রুমে পরিণত করল। আরাম করে বিশ্রাম করতে লাগল। টিভি ছেড়ে নাচ-গানে মত্ত হলো। মোটকথা, ডাকাতরা বাড়িটাকে নিজেদের বাড়ির মতো ব্যবহার করতে লাগল। পাড়া-পড়শীরাও বুঝতে পারল, বাড়িটা ডাকাত-কবলিত। একপর্যায়ে বাড়ির মালিকের কাছে দস্যুরা শর্ত পেশ করল, কোনোরূপ হৈ-চৈ করা যাবে না। পুলিশকে সংবাদ দেওয়া যাবে না। স্ট্যাম্পে লিখিতভাবে বাড়িটা তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এই শর্তগুলো মানলেই বাড়িওয়ালারা নিরাপদে বাড়ি ত্যাগের অনুমতি

পাবে। প্রয়োজনে গাড়িতে করে শহরের বাইরে কিংবা যেখানে তারা যেতে চায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

'তোমার গল্পের সাথে মার্কিনি ডাকাতদের অদ্ভুদ মিল রয়েছে বেটা ঈগল!' সাদ্দাম বললেন।

'সেজন্যেই গল্পটা বললাম প্রেসিডেন্ট সাহেব!' – ঈগল বলল – 'আমার আরও একটি বিষয় নোট করা জরুরি মনে করছি। তাহল, গার্ডদের মধ্যে গাদ্দার চিহ্নিত হবার পরেও তাদের কেন বহাল রাখলেন।

'বেটা! কিছু-কিছু ব্যাপারে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'আমার গার্ডদের সব কজনই আমার একান্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু অর্থের লোভ বহু মানুষকেই তার বিশ্বস্ততা কোরবান করতে উসকে দেয়। ওদের ব্যাপারটাও আমি এই দৃষ্টিতেই দেখছি। ওরা অর্থের লোভে পড়ে আমার বন্ধু থেকে শত্রু হয়েছে। তবে শত হলেও বিপদমুহূর্তে ওরা আমার সঙ্গ দিয়েছিল এবং এখনও দিচ্ছে। এমন দুশমনকে ক্ষমা করতে আমার ভালো লাগে। তাছাড়া, এরা শত্রু হলেও বুদ্ধিমান শত্রু। কেননা, আমি বর্তমানে বাইরের সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। ওরা ইচ্ছা করলে মার্কিন বাহিনীকে সরাসরি আমার আস্তানার পথ দেখিয়ে দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করাতে পারত। কিন্তু ওরা তা করেনি। বরং ওরা চেয়েছে সমঝোতার মাধ্যমে একটা সমাধানে পৌঁছুক আর ওরাও পুরস্কারের অর্থটা পেয়ে যাক! তাই ওদের অপরাধের জন্য আমি কোনো পদক্ষেপ নেইনি। ভেবেছি, ওদেরসহ সকল গার্ডকে বিদায় দিয়ে একাকিত্বের পথ গ্রহণ করব। কিন্তু তুমি যখন বলছ দু-একজন সাথে রাখতে, প্রয়োজনের তাগিদে তা-ই আমাকে করতে হবে।'

'মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব! এবার তাহলে আমাকে বিদায় দিন।' ঈগল বলল!

'হ্যাঁ; বেটা! তোমাকে আমি এখনই বিদায় দিচ্ছি। তবে চিঠির ব্যাপারটা জেনে নাও' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'আমার দুই পুত্র উদে ও কুশেকে গত জুলাই মাসের শেষের দিকে হানাদার বাহিনী শহীদ করেছে। সেটা নিশ্চয়ই তুমি জান?'

'জি; জানি' – ঈগল বলল – 'তাঁরা দখলদার বাহিনীর সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে বীরের মতো শহীদ হয়েছেন!'

'হ্যাঁ; বেটা! তাদের এই বীরত্বে আমি গৌরবান্বিত' – সাদ্দাম হোসেন বললেন – 'বর্তমানে ওদের পরিবার-পরিজন কোথায় আছে, আমার জানা নেই। তুমি তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে আর আমার দুই কন্যা রাঘাদ ও রানা তাদের ফ্যামিলি নিয়ে জর্ডানে অবস্থান করছে। তাদের সকলের কাছে আমার এই চিঠির কপি পৌঁছে দিতে চেষ্টা করবে। তোমাকে এই কঠিন কাজের দায়িত্ব আমি দিতাম না। দিয়েছি এজন্যে যে, এর মাধ্যমে আমি অতীত জীবনের কিছু

প্রায়শ্চিত্ত্ব করতে চাই। ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে অবহেলা করে যে পাপ আমি সারা জীবন করেছি, তার থেকে কিছুটা হলেও পরিত্রাণ চাই।'

'সম্মানিত প্রেসিডেন্ট সাহেব! আপনার আদেশ শিরোধার্য!' – ঈগল বলল – 'কিন্তু আপনি চিঠি সম্বন্ধে যে কথাগুলো বললেন, তাতে চিঠির প্রতি আমার কৌতূহল অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাকে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কি খানিক ধারণা দেওয়া যায় না?'

'বেটা! তুমি বরং চিঠিটিই খুলে পড়ে দেখো।' সাদ্দাম হোসেন বললেন।

সাদ্দাম হোসেনের অনুমতি পেয়ে ঈগল চিঠিটি বের করে পড়তে শুরু করল। আরবীতে লেখা চিঠির ভাবানুবাদ অনেকটা এ রকম–

'প্রিয় পরিবাব-পরিজন!

পত্রের শুরুতে তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক আশীষ ও দু'আ রইল। বর্তমান অবস্থায় তোমরা যে ভালো নেই তা আমি জানি ও বুঝি। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি তোমাদেরকে যেন ভালো অবস্থায় পৌঁছে দেন। তোমাদের উপর থেকে এই দুঃসহ অবস্থাটা দ্রুত সরিয়ে দেন। সুখ-শান্তিময় স্বাধীন ইরাক তোমাদেরকে দান করেন। আমীন!

তোমরা আমার দুটা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি তোমাদের পরিবারের সর্বোচ্চ মুরুব্বী হিসেবে আরজ করছি! তোমরা সবাই খাঁটি মুসলমান হতে চেষ্টা করো। আরবদের জন্য ইসলামই হল খোদার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ইসলাম আরবদের ভূষণ। ইতিপূর্বে যেসব ধ্যান-ধারণায় আমরা জীবন-যাপন করেছি, তা নিতান্তই একটি অবাঞ্ছিত বিষয় ছিল। ইসলাম চর্চা ও অনুসরণের মধ্যেই তোমাদের ইহ-পরকালীন কল্যাণ-মুক্তি-সফলতার গ্যারান্টি নিশ্চিত হবে। আমি ক্ষমতায় থাকাকালীন তোমাদেরকে দুনিয়ার আরাম-আয়েশের সকল উপকরণ সরবরাহ করেছিলাম। কিন্তু দুনিয়ার এই ব্যাবস্থাপনা খুবই সামান্য সময়ের জন্য, যার বাস্তব সাক্ষী তোমরা। তাই তোমাদের প্রতি আমার আকুল আহবান! তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সমস্ত মোহ-মায়া ত্যাগ করো। পরকাল তথা চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করো। এ লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করো। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ো। ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ বুযুর্গ আলেমদের সংস্পর্শ গ্রহণ করো। তারা তোমাদের সত্যের দিশা দিবেন।

প্রিয় কন্যারা!

মহান আল্লাহ তোমাদেরকে অনেকগুলো সন্তান-সন্ততি দান করেছেন। এদেরকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হিসেবে গড়ে তোলো। তোমরা আমার নাতি-নাতনিদেরকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করো। তাদেরকে কুরআন শরীফের হাফেজ বানাও। আর তাদেরকে ধর্মীয় পরিবেশে গড়ে তোলার চেষ্টা করো। আমার নাতনিদের বলবে, তোমাদের নানাভাই জোর দিয়ে বলেছেন, তোমরা

যেন অবশ্যই প্রতিদিন কোরআন পাঠ কর এবং কোরআনের অর্থ অনুধাবনের প্রতি মনোযোগী হও।

প্রিয় রাঘাদ ও রানা!

তোমরা আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলে। তোমাদের বর্তমানে আমি জান্নাতি সুখ অনুভব করতাম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আজ পিতার থেকে কন্যাদের বহুদূরে সরিয়ে দিল। জীবনে হয়ত আর কখনও তোমাদের সাথে সাক্ষাত হবে না। যদি আমার উপরোক্ত ওসিয়ত তোমরা পালন কর, তাহলে আমি মরে গেলেও আমার আত্মা শান্তিতে থাকবে। আশা করি, তোমরা সবাই আমার জীবনের অন্তিম ইচ্ছা পূরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

ইতি
তোমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন
সাদ্দাম হোসেন
ইরাকের একমাত্র বৈধ প্রেসিডেন্ট!'

◆◆◆

ভোর হওয়ার অনেক আগেই ঈগল প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের গোপন আস্তানা থেকে বেরুল। তার সাথে দুটা ব্রিফকেস। একটার মধ্যে ডলার, নেকলেস, চিঠি ও স্বর্ণের একটা হার। বিদায়বেলা সাদ্দাম হোসেন যখন জানতে পারলেন, ঈগলের সঙ্গে নাঈমার বিয়ে হচ্ছে, তখন এই উপহারটি জোরপূর্বক ঈগলকে নিতে বাধ্য করলেন। অপর ব্রিফকেসটার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কিছু নথিপত্র। এগুলো গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগবে বলে সাদ্দাম হোসেনের বিশ্বাস। তাই ঈগলও আগ্রহভরে কাগজগুলো সাথে নিয়ে এল।

সাদ্দাম হোসেনের আস্তানা থেকে বেরিয়ে ঈগল প্রথমে তার গন্তব্য স্থির করেছিল নাঈমাদের বাড়ি। নাঈমার মা মিসেস সালেহা বেগমের নির্দেশনা এমনই ছিল। কিন্তু খানিক সময়ের জন্য তার মন তাকে ভিন্ন একটি চিন্তায় নিমগ্ন করে দিল। তাই দ্রুত সে নিজ আস্তানায় ফেরার গরজ অনুভব করল।

ঈগল গাড়িতে উঠে দ্রুত বাগদাদের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালিয়ে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। এখানটায় গাড়ির দীর্ঘ লাইন দেখে তার পিলে চমকে যাবার মত অবস্থা। এসব চেকপোস্টকে সে কখনোই পাত্তা দেয়নি। কিন্তু তাকে চিন্তিত করেছে সাথে থাকা দুটি মূল্যবান ব্রিফকেস। ভাবল, গ্রেনেড ছুড়ে চেকপোস্ট উড়িয়ে দেবে কিনা! তবে আক্রমণ সফলের জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা দরকার। সে গাড়ি থেকে নামল। তার সম্মুখে চেকপোস্ট পর্যন্ত অন্তত ৫০টি গাড়ি দাঁড়ানো। চেক হচ্ছে ঢিমেতালে। ছাউনিতে মার্কিন সৈনিক পাঁচজন। ইরাকি সেনা জনাদশেক। তবে মার্কিন সৈনিকদের তিনজনই নেশাগ্রস্ত। দুজন ইরাকি সেনাদের সহায়তায় চেকিংয়ের কাজ করছে।

ঈগল একজন ইরাকি সৈনিককে ডেকে কথা বলল। জানতে চাইল চেকিংয়ের কাজটা দ্রুত সারা যায় কিনা? সৈনিক তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পর্যক্ষেণ করতে লাগল। এতে সে একজন সাধারণ নাগরিকের মতো বিরক্তি প্রকাশ করল।

'তোমরা সাধারণ নাগরিকদের এ রকম সন্দেহের চোখে দেখ কেন?' – ঈগল বলল – 'তোমাদের সাথে কথা বলা যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে সেটা ঘোষণা আকারে চেকপোস্টের সামনে লিখে রাখলেই তো পার!' বলেই ঈগল নিজ গাড়ির দিকে চলে যেতে উদ্যত হল। কিন্তু সৈনিক তার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

ঈগল সৈনিকদের সাথে মুখোমুখি ঝামেলায় জড়াতে চাচ্ছিল না। কিন্তু ইরাকি এই সৈনিকটাকে মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি রকমের অতিউৎসাহী। এদের শায়েস্তা করার কৌশল তার ভালোভাবেই রপ্ত আছে। তবে ব্রিফকেসদুটার কথা মাথায় রেখে নীরবে সে স্থানটা অতিক্রমের চিন্তা করছিল। সৈনিকটাকে এড়িয়ে পুনরায় নিজ গাড়ির দিকে হাঁটা দিল। এবার সৈনিক খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলল। সেই সাথে বলে উঠল, 'ঈগল! সকলের জন্যে কথা বলা নিষিদ্ধ হলেও তোমার জন্যে নিষিদ্ধ নয়।'

'কোন ঈগল? কিসের ঈগল?' – আশ্চর্য হওয়ার মতো করে ঈগল বলল – 'মানুষ আবার ঈগল হয় কী করে? এসব তুমি কী বলছ সৈনিক? আমি তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার পথ ছাড়ো। আমাকে যেতে দাও।'

'দেব, যেতে দেব। বাগদাদের ঈগলকে বন্দী করে রাখার মতো খাঁচা এখনো বুশ তৈরি করতে পারেনি, তাই এখনই যদি তাকে আটক করি, তাহলে রাখব কোথায়?' – স্বাভাবিক ভাবলেশহীনভাবে সৈনিক বলল।

এবার আর ঈগলের মুখে কোনো কথা সরল না। সে সত্যি-সত্যিই এবার অবাক হল। কে এই সৈনিক যুবক? কী তার পরিচয়? কীভাবে সে তাকে চিনল? ইত্যাদি চিন্তায় সে নীরব হয়ে গেল।

'ঈগল ভাই! আমার পরিচয় নিয়ে তোমার চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই' – সৈনিক বলল – 'বিখ্যাতদের সবাই চেনে। বিখ্যাতরা সবাইকে চেনে না; এটা আবশ্যকও নয়, প্রয়োজনও নয়। আমার নাম খালেদ। তোমাকে আমি ভালোভাবেই চিনি। তুমি আমাকে একটা সমস্যার সমাধান দিতে পারলে চির কৃতজ্ঞ থাকব!'

'তোমার সমস্যাটা কী খুলে বলো আমাকে?' – ঈগল বলল – 'আমি সমাধানের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করব!'

'সমস্যাটা প্রকৃতপক্ষে আমার নয়' – খালেদ বলল – 'তবে যার সমস্যা, সে ব্যাপারটা আমার ওপর সোপর্দ করায় তার সমস্যা এখন আমারই সমস্যা।'

'আচ্ছা; সমস্যাটা বলবে তো। নতুবা সমাধান দেব কীভাবে!' ঈগল বলল।

'চেকপোস্টে যে দুজন মার্কিন সৈনিক চেকিং করছেন, তার মধ্যে একজনের নাম জর্জ হেরিনসন। সে ইরাক এসে ইসলাম ও মুসলমানদের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সে মুসলমান হতে চায়। আমার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমাকে সব খুলে বলেছে। এখন মুসলমান হওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞ। বলতে গেলে ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না। তাই একজন ভালো মুসলমানের খোঁজ করছিলাম। যে তাকে ইসলাম সম্পর্কে ভালো ধারণা দিতে পারবে, মুসলমান হতে সহায়তা করতে পারবে। আমার দৃষ্টিতে তোমরা, মানে মুজাহিদীনরা হল ভালো মুসলমান। সুতরাং তুমিই আমাকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'সরকারের দৃষ্টিতে আমরা সন্ত্রাসী ও বিশৃঙ্খলাকারী। তুমি সরকারি লোক হয়ে আমাদেরকে ভালো মুসলমান বলছ কোন যুক্তিতে' – ঈগল বলল – 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করব কীভাবে?'

'ঈগল! আমি সরকারি বাহিনীতে কাজ করছি দুটা কারণে' – সৈনিক খালেদ বলল – 'প্রথমত রুটি-রুজির জন্য। দ্বিতীয়ত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশ পালন। তিনি আমাদেরকে সরকারি বাহিনীতে মিশে দেশের পক্ষে কাজ করতে বলেছেন। সুতরাং সরকার তোমাদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিলেও আমি ও আমার সঙ্গীরা তা বিশ্বাস করি না।'

'তোমার এ কথারইবা সত্যতা কতটুকু?' ঈগলের প্রশ্ন।

'হায়! তোমাকে যে আমি কিভাবে বিশ্বাস করাব!' – সৈনিক খালেদ বলল – 'তোমাকে যদি আমি সাদ্দাম হোসেনের কাছে নিতে পারতাম, তাহলে তিনি এক নিমিষেই তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারতেন। কারণ, তাঁর কাছে আমাদের নাম-পরিচয় সব নথিভুক্ত করা আছে।'

সৈনিক খালেদের এবারের কথা ঈগল যাচাই করার সুযোগ পেল। সে তার থেকে পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে গাড়িতে এল। এদিকে চেকিংয়ে দাঁড়ানো লাইন অনেকটা কমে এসেছে। ৫০ থেকে সংখ্যা কমে বিশ-পঁচিশে এসেছে। সে প্রথমে গাড়িটা টার্ন দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করল। লাইনে থাকা অন্য গাড়িগুলোও সম্মুখে অগ্রসর হল। এতক্ষণ গাড়িগুলো এভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল।

ঈগল গাড়ির সিটে বসেই একটা ব্রিফকেস খুলল। সাদ্দাম হোসেনের দেওয়া রাষ্ট্রীয় নথিপত্রের মধ্যে রিপাবলিকান গার্ডদের তালিকাটা খুঁজল। এ সংক্রান্ত দুটা নথি পেল। একটা অনেক পুরনো। অন্যটা সাম্প্রতিক। সাম্প্রতিকের নথিটা-ই সে তার কাজের জন্য সহায়ক মনে করল। বাস্তবে হলোও তা-ই। তাঁবেদার ইরাকি বাহিনীতে মিশে যাওয়া সাবেক রিপাবলিকান গার্ডদের তালিকা এটা। আরবী অক্ষরের ক্রমানুযায়ী নামগুলো সাজানো বিধায় তাকে বেশি সময়ও নষ্ট করতে হল না। অক্ষরের সিরিয়ালে ১৫৪৮ ক্রমিকে সৈনিক খালেদের

পরিচিতি পাওয়া গেল। নামের সাথে ছবির সংযুক্তি থাকায় শনাক্তকরণে মোটেই বেগ পেতে হল না।

ঈগল সৈনিক খালেদের পরিচিতির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে দ্রুত চেকপোস্টের কাছে এল। খালেদকে ইশারায় ডাকল। চেকপোস্ট থেকে একটু দূরে গেল। তারপর তাকে বলল, 'খালেদ তুমি নিজের পরিচিয়টা সত্য দিয়েছ। বিধায় মার্কিন সৈনিকের ব্যাপারটাও আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি। তবে সাবধান! একজন মানুষের ধর্মান্তরের ব্যাপারটি এত সহজে নেওয়া যাবে না। তাও আবার এমন ব্যক্তি, যে নাকি আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ।'

'ঈগল ভাই! কিভাবে তুমি আমার পরিচিতির ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তা জানতে চাই না' – সৈনিক খালেদ বলল – 'তবে জর্জ হেরিসের ব্যাপারে তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, সে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে না।'

'বহুত আচ্ছা! এবার তাহলে কাজ করো, আমার একটা ঠিকানা রাখো। দুদিন পরে নির্ধারিত স্থানে, নির্দিষ্ট সময় আমার সাথে দেখা করবে।' বলে ঈগল এক টুকরা কাগজ খালেদের হাতে দিল।

সে চিরকুটটা পকেটে রেখ বলল, 'শুকরিয়া ঈগল! তোমার অনেক মূল্যবান সময় জ্যামে নষ্ট হচ্ছে। তুমি গাড়িটা ওভারটেক করে চলে যাও। চেকপোস্ট আমি সামলাচ্ছি।'

'তুমি যদি ঝামেলায় পড়?' ঈগল আশংকা ব্যক্ত করল।

'কোনো ঝামেলা হবে না' – সৈনিক খালেদ বলল – 'জর্জ হেরিনসনকে তোমার কথা বললে সে বরং উচ্ছ্বসিতই হবে। সে এখানকার প্রধান। তবে একটু অপেক্ষা করো! তোমার জন্যে একটি 'স্পেশাল পাস'-এর ব্যবস্থা করে দেই, যাতে এ সকল চেকপোস্টে ভবিষ্যতে তোমার সময় নষ্ট না হয়।'

চেকপোস্টের ঝামেলা চুকিয়ে যখন বাগদাদের নগর একাকায় পৌঁছল, তখন ফজরের আযান শুরু হয়েছে। ঈগল আবাসিক এলাকার রাস্তা ধরে এগুচ্ছে। বাগদাদের পাঁচ-ছয়টা আস্তানার সবচেয়ে নিরাপদ আস্তানাটাই এখন তার গন্তব্যস্থল। উত্তর দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ আসছে। সেদিকে এখন তার খেয়াল দেওয়ার সময় নেই। তার এখনকার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ব্রিফকেসদুটা হেফাযত করা।

ঈগল ভালোয়-ভালো তার আস্তানায় পৌঁছে গেল। ওজু করে প্রথমেই ফজরের সালাত আদায় করে নিল। নামাজান্তে সে কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করল। সারা রাত তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। সাদ্দাম হোসেন এক প্যাকেট বিস্কুট খেতে দিয়েছিলেন। সেটা না খেয়ে পকেটে পুরেছিল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেটাই খাবে ভাবল। হঠাৎ তার মনে পড়ল ছোট্ট রাহাতের কথা। সেদিন সে বিস্কুট খেতে চেয়েছিল। তাকে বিস্কুট দেওয়া যায়নি। কারণ, ইরাকে এখন টাকার বিনিময়েও খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। শিশুরা

তো তা বুঝতে চায় না। সেজন্যে তাকে বিস্কুট কিনে দেওয়ার ওয়াদা দিয়ে আসতে হয়েছিল। ঈগল তাই বিস্কুটের প্যাকেটটা রাহাতের জন্য রেখে দিল। নিজে দুটা শুকনো খেজুর খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করল।

♦ ♦ ♦

রুকাইয়া, মাহমুদা আর সালমা। বাগদাদের তিন অগ্নিকন্যা। ইরাক আগ্রাসনের শুরুতে অন্য দশজনের মতোই এদের চোখে-মুখেও ছিল ভয়, আতংক ও অনিশ্চয়তার প্রতিচ্ছবি। জাতির ভবিষ্যতের সাথে নিজেদের ভবিষ্যৎও তারা ধ্বংসের বেলাভূমিতে তলিয়ে যেতে দেখছিল। কিন্তু আজ তাদের চেহারায় ওরকম কোনো অভিব্যক্তি নেই। নিজেদের ভবিষ্যৎকে এখন আর তারা ধ্বংসের তরীতে সওয়ার ভাবে না। আজ তারা প্রতিবাদী নারীর প্রতিকৃতি। নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা নির্দিষ্ট করে ফেলেছে। হয় সম্মানের জিন্দেগী, না হয় ইজ্জতের মওত! তৃতীয় কোনো পন্থা তারা নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করে নিয়েছে।

এ জন্যেই তারা এখন গোটা ইরাকি নারী সমাজে আলোচিত নাম। বিশেষ করে বিদেশি সাহায্য কর্মীদের নাটকীয় কায়দায় অপহরণ ও দখলদারদের থেকে যথাযথ দাবি আদায়করণ, বাগদাদের এই ত্রিরত্নকে করে তুলেছে জীবন্ত কিংবদন্তীতুল্য। ইরাকি নারীদের প্রেরণার উৎস আজ তারা। তাদের অনুসরণে আজ ঘরে-ঘরে তৈরি হচ্ছে প্রতিরোধী নারী, মুজাহিদা বোন। বাগদাদ থেকে কারবালা, মসুল থেকে বসরা, উমকসর থেকে ফালুজা সর্বত্রই ইরাকি নারী আজ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে মুখর।

দেশমুক্তির লড়াইয়ে দিন-রাত সমানে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে রুকাইয়া। তাদের এমনও দিন যাচ্ছে যে, তারা আহার-নিদ্রারও ফুসরত পাচ্ছে না। নারীদের চিরাচরিত অভ্যাস রূপচর্চা করা, চুলের যত্ন নেওয়া, ঘরদোর সাজ-গোজ করা, অবসর বের করে গল্প-গুজব করা, পরচর্চা করার মতো বিষয়গুলো তারা যেন ভুলেই গেছে। অবশ্য এ সমস্ত কাজগুলো এখন তাদের কাছে বাহুল্য। কাজ বলেই বিবেচিত। মাহমুদা তো জোর গলায় বিভিন্ন নারী সমাবেশে একথা বলে বেড়ায়, নারীরা যেসময় রূপচর্চা আর পরচর্চায় নষ্ট করে, সে সময়গুলো কাজে লাগালে দেশ-জাতির বহু খেদমত আঞ্জাম দিতে পারত। প্রত্যেক মা যদি তার সময়কে ঐ সমস্ত ফালতু বিষয়ের পেছনে ব্যয় না করে তার সন্তানের পেছনে ব্যয় করত, সন্তানকে মানুষ বানানোর চিন্তা করত, তাহলে কারো না কারো একজন সন্তান খালিদ বিন ওয়ালিদ অথবা সালাহুদ্দীন আইয়ূবীতে পরিণত হত। অন্যেরা তার অনুগামী হয়ে তামাম কুফরী শক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যেত। জাতি তখন মাথা উচুঁ করে বাঁচত।

আজ বহু দিন পর বাগদাদের বীর-বাহাদুর কন্যারা একত্রে একটি মজলিসে বসেছে কিছুক্ষণ অবসর যাপন করবে বলে। তবে শুধু গল্পের জন্যেই এই আড্ডা

জমানো হয়নি। দুটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে তাদের এই আসর। প্রথমত মাহমুদা ও সালমার বিবাহ সম্পন্নকরণ, দ্বিতীয়ত খৃষ্টান তরুণী মারিয়া ও জুলিয়ার ইসলাম গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পাদন।

অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে মাহমুদাদের বাড়িতে। মাহমুদার বাবা জয়নুল আবেদীন অনুষ্ঠান আগত মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছেন। অবশ্য মেহমানের সংখ্যা নেহায়েতই কম। একান্ত যাদের না বললেই নয়, গুণে-গুণে শুধু তাদেরই দাওয়াত করা হয়েছে। সচরাচর বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো কোনো বাহুল্যতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সব রকম হৈ-হুল্লোড় আর প্রথা-পার্বন বিবর্জিত একটি শুচি-শুদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি এই অনুষ্ঠানটি। এ ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠান এ যুগে খুবই বিরল। অনুষ্ঠানটি এ রকম সুন্দর হওয়ায় বর-কণে উভয় পক্ষই খুশী।

আগত অতিথিগণ বরদের আগমন প্রতীক্ষায় আছেন। সন্ধ্যার পরপরই তাদের আসার কথা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে বেশ সময় হল। এখনও তারা আসছে না কেন? সহসা দেখা গেল, আঙিনায় একটি মার্কিন পতাকাবাহী মার্সিডিস বেন্‌জ কার ঢুকছে। বাড়িময় আতংক ছড়িয়ে পড়ল। মেহমানরা ভয়ে কেঁপে উঠল। অন্দরমহলেও সংবাদ পৌঁছল। রুকাইয়া অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল। কনেদের কাছে খবর দিতে বারণ করল। সে একটি জানালায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে অস্ত্র তাক করল, মার্কিনিরা গাড়ি থেকে বেরুনোর সাথেই যেন খতম করে দেওয়া যায়।

আকস্মিক এই বিপদে মাহমুদা ও সালমার মায়েরা কান্না ধরে রাখতে পারলেন না। তবে কনেদের ভয়ে শব্দ করে কাঁদতেও পারছেন না। তবে সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠায় পড়ল ধর্ম পরিবর্তন করতে যাওয়া মারিয়া ও জুলিয়া। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেল, তাদের এখানে আসার সংবাদ পেয়েই মার্কিনিরা এ বাড়িতে হানা দিয়েছে। তারা তৎক্ষণাৎ পরামর্শে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, যত অত্যাচার আর জোর জবরদস্তিই করা হোক ইসলাম গ্রহণ না করে তারা ফিরে যাবে না, তাতে যদি মৃত্যু হয়, তবুও তারা মত পাল্টাবে না।

মোটকথা, কালো রংয়ের মার্কিন মার্সিডিস বেন্‌জ কারটা বিয়ে বাড়িতে প্রবেশের সাথে-সাথে বাড়ির হাসি-আনন্দ সব স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গাড়িটা ঘরের সম্মুখে এসে থেমেছে দু-তিন মিনিট হল। এখনও গাড়ি থেকে কেউ নামছে না। আকস্মাৎ গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল এমন চারজান লোক, যাদের দেখে বাড়ির পরিবেশ পূর্বের মতো বরং তার চেয়েও বেশি আনন্দময় হয়ে উঠল। মেহমানরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল তাদের স্বাগত জানাতে। তবে সকলের চেহারায় উৎসুক ভাব বিরাজ করছে। তাদের একই প্রশ্ন, বরেরা এ গাড়ি পেল কোথায়? এ যে মার্কিনি কার! সবাই বরকে বরণ করে ঘরে নেওয়ার জন্যে অস্থির। কিন্তু বরদ্বয় ঘরে প্রবেশের পূর্বে গাড়িটা হেফাযতের জন্য অস্থির। তারা রুকাইয়াকে তালাশ করল।

সংবাদ পেয়ে রুকাইয়া অস্ত্রটি নিরাপদ স্থানে রেখে নেকাব পরে বাইরে এল। বরবেশী মুজাহিদ মাহমুদুল হাসান তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'রুকাইয়া আপা! আমরা আসার পথে একটি অভিযান পরিচালনা করে এসেছি। সেখান থেকে গনিমতস্বরূপ এই গাড়িটি নিয়ে এসেছি। এটি এখন কী করব? আপনি একটি ব্যবস্থা করুন।'

রুকাইয়া তাদের মোবারকবাদ দিল এবং ভেতরে গিয়ে আসন গ্রহণের আহ্বান জানাল। আর গাড়ি হেফাযতের দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিল।

মাহমুদার বর মাহমুদুল হাসান আর সালমার বর মোহাম্মদ মাহের এবং তাদের দুজনের দুই বন্ধু। তাদের জন্য নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসল। তাদের ঘিরে বসে গেল আগত মেহমানবৃন্দ। অল্প সময়ের মধ্যে আক্‌দ-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হল। সুন্নত হিসেবে খেজুর ছিটানো হল।

বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর মাহমুদার পিতা জয়নুল আবেদীন সাহেব দাঁড়ালেন। উপস্থিত মেহমানদের উদ্দেশে বললেন, 'সম্মানিত উপস্থিতি! মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে আমরা একটি পবিত্র কর্ম সম্পাদন করলাম। এরই সাথে-সাথে আমি আপনাদের আরও একটি খুশির খবর দিতে চাই।'

এ পর্যন্ত বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তার অসমাপ্ত কথায় মেহমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। তিনি রুকাইয়ার সন্ধান করছিলেন। সে দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠল, 'চাচাজান! আপনি ঘোষণা দিয়ে দিন ওরা তৈরি হয়েই আছে।'

'জি; সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! যেটা বলছিলাম, আমি আপনাদের একটি খুশির খবর দেব' – জয়নুল আবেদীন সাহেব বললেন – 'তাহলো, এখন আরেকটি পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পাদিত হবে।'

'মেজবান সাহেব! এটাও কি বিবাহ অনুষ্ঠান?' জনৈক বয়স্ক মেহমান কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠলেন।

'এটা কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান নয় সম্মানিত অতিথি!' – জয়নুল সাহেব বললেন – 'এ হল ধর্ম পরিবর্তনের অনুষ্ঠান।' তারপর তিনি সংক্ষেপে মারিয়া ও জুলিয়ার পরিচয়, তাদের ধর্ম পরিবর্তনে প্রেক্ষাপট বিবৃত করলেন। সেই সাথে তাদের অনুষ্ঠানে হাজির হতে ডেকে পাঠালেন। খানিক বাদে রুকাইয়া তাদেরকে ইসলামী পোশাক পরিয়ে নিয়ে এল।

মারিয়া ও জুলিয়াকে আজ অন্যরকম সুন্দর লাগছে। তাদের হিজাবপরা মুখচ্ছবি পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝকমক করছে। এ যেন সত্যি-সত্যিই আকাশের চাঁদ দুনিয়ায় নেমে এসেছে। ইসলামী পোশাক-হিজাবে নারীদের যে এত সুন্দর লাগে, তা মারিয়া ও জুলিয়া ভাবতেও পারেনি। এই পোশাকে প্রথমে তারা নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারছিল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারা চমকে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, আয়নাটা জাদুর তৈরী। ওটা যেন নিজে নিজেই

তাদের ছবি পরিমার্জন করছে। এই পোশাক শুধু যে তাদের বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন এনেছে, তা-ই নয়, তাদের অন্তর জুড়েও পবিত্রতার এক সোনালি আবহ ঢেউ খেলে গেল।

মারিয়া ও জুলিয়া হাজেরানে মজলিসে উপস্থিত হওয়ামাত্র সভা জুড়ে নীরবতা ছেয়ে গেল। সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রতে পরিণত হল তাদের পবিত্র অবয়ব। অভাবিত সৌন্দর্য-জ্যোতি সকলের কাছে স্বর্গীয় আভারূপে গণ্য হতে লাগল। স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়ে নিমিষেই সকলের দৃষ্টি নিম্নগামী হল।

'আমরা এই মেয়েদের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই' – বয়োজ্যেষ্ঠ সেই মেহমান বলে উঠলেন – 'কেন তারা মুসলমান হচ্ছেন, কোন জিনিসের প্রভাবে তারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হলেন, খৃষ্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে তারা প্রকৃত ব্যবধান কী দেখলেন এ বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে বললে খুবই প্রীতি হতাম। অবশ্য তাদের আপত্তি থাকলে আমার দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম।'

অন্যান্য অতিথিবৃন্দও এই বয়োজ্যেষ্ঠ মেহমানের প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। মারিয়ারা এতগুলো মানুষের আবেগ-আগ্রহ অগ্রাহ্য করতে পারল না। তাই পরামর্শ করে প্রথমে মারিয়া দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল–

'সম্মানিত উপস্থিতি! আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো জ্ঞান ও যোগ্যতা কোনোটাই আমার নেই। আমি তো এমন ব্যক্তি, যে কিনা কদিন পূর্বেও আপনাদের জাতশত্রু ছিলাম। তখন আমার চেষ্টা ছিল আপনাদেরকে খৃষ্টান বানানো। কিন্তু আল্লাহর মর্জি, আজ আমরাই আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। আর এ কাজটা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে। এর জন্য না কেউ আমাদের কোনো লোভ দেখিয়েছে, আর না কোনো চাপ প্রয়োগ করেছে। কারো ভয় অথবা ভালোবাসার খাতিরেও কাজটা হচ্ছে না। যা হচ্ছে, তাহল, নিজস্ব প্রয়োজনেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করছি। আমাদের কাছে প্রশ্ন এসেছে, আমরা কেন মুসলমান হচ্ছি? কীসের প্রভাবে হচ্ছি এবং খৃষ্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে আমরা কী-কী ব্যবধান প্রত্যক্ষ করলাম? আমি হয়ত আপনাদের জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হব না, তবে শুধু একটুকু আরজ করতে চাই যে, ইসলাম সে তো কবুল করারই বিষয়। গোটা মানবজাতির কল্যাণার্থেই বিশ্বস্রষ্টা এই ধর্মটি মনোনীত করেছেন। এর ব্যাপ্তি প্রথম নবী আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত। এর মাঝে যত ধর্মই স্রষ্টা থেকে এসেছে, সবই ইসলাম। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন নামে নামকরণ হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে ক্ষুদ্র গবেষণায় আমার এটাই অনুমিত হয়েছে। কিন্তু গির্জা আমাদের দেমাগের ওপর ভ্রান্তির এক আবরণ লেপ্টে দিয়েছিল। যদ্দরুন আমরা আলোকে অন্ধকার, সাদাকে কাল, সত্যকে মিথ্যা এবং ধোঁকা-প্রতারণাকে মুক্তির পথ ভেবেছিলাম।

অর্থাৎ– গির্জার শিক্ষানুযায়ী আমরা সত্য-সঠিক, নির্ভেজাল ইসলামকে মিথ্যা-ভুয়া আর বানোয়াট ধর্ম বলে উড়িয়ে দিতাম। আর ধোঁকা-প্রতারণায় বিকৃত খৃষ্টধর্মকে মুক্তির পথ সাব্যস্ত করতাম। মূলত আমরা আলোর সন্ধানে আলেয়ার পেছনে ছুটছিলাম। মহান আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদের জন্য হেদায়েতের বাহক পাঠালেন। আর সেই বাহক হল বোন রুকাইয়া বিনতে আসাদ।'

এ পর্যন্ত বলে মারিয়া হাজেরানে মজলিসে তাদের অপহরণ থেকে শুরু করে পাঁচ দিনের বন্দি জীবনের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

বন্দিত্ব থেকে মুক্তির পর ইসলাম নিয়ে তাদের গবেষণা, রুকাইয়াকর্তৃক সেই গবেষণায় সর্বাত্মক সহায়তা, গির্জাকর্তৃক যিশুর খোদায়িত্ব, প্রায়শ্চিত্ত ও ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি বিষয়ে অসংলগ্ন ও ভিত্তিহীন জবাব প্রদান, খৃষ্টজগৎকর্তৃক ইসলামকে সমূলে বিনাশ করার পরিকল্পনার বিষয়াবলি বিস্তারিত বর্ণনা করল। এ ছাড়াও সে খৃষ্টবাদ ও ইসলামের ব্যবধানগুলো এত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করল যে, উপস্থিত মেহমানগণ তো বটেই, স্বয়ং রুকাইয়াও অবাক হল তার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এই গবীর উপলব্ধির বিষয় অবলোকন করে।

মারিয়া তার বক্তব্য শেষ করে বসল। এবার জুলিয়া দাঁড়াল। ভূমিকা ছাড়াই বলা শুরু করল–

'আমি মুসলমানদের গাফলতি আর আত্মভোলা অবস্থান দেখে অবাক হয়ে যাই। যে ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ সাধনে, তার (নামসর্বস্ব) অনুসারীরা নিজেরাই আজ অকল্যাণের সরোবরে হাবুডুবু খাচ্ছে। যেখানে মুসলমানগণ মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে সত্য ধর্মের আবেদন তুলে ধরবে, তাদের সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে, উৎসাহ দিবে, সহায়তা করবে, সেখানে তারাই সত্য থেকে বিমুখ হচ্ছে, উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে হতাশায় ডুবে যাচ্ছে, সহায়তার জন্য অপরের কাছে হাত পাতছে। তাদের অবস্থা আজ ঐ ব্যক্তির মতো, যে পানির দরিয়ায় ভেসে পিপাসায় ছটফট করে বলছে– আমাকে পানি দাও, পানি দাও, পানি দাও।'

'আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন' – একটু থেমে জুলিয়া বলল – 'আপনাদের হেয় করার জন্য আমি কথাগুলো বলছি না। বরং আপনাদের অবগতির জন্য বলছি, খৃষ্টানরা তাদের বাতিল ধর্মের প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে দুনিয়াব্যাপী লাখ-লাখ প্রচারকের মাধ্যমে কোটি-কোটি মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার অর্থ খরচ করে চলছে। তাদের লক্ষ্য খৃষ্টধর্মের অনুসারীর সংখ্যা বাড়ানো। কিন্তু এজন্য তারা সর্বদা চতুরতার সাথে কাজ করে। তারা জনসাধারণের সমস্যার সমাধানের কথা বলে তাদের সাথে সখ্য গড়ে তোলে। অনুদান ও সেবার মাধ্যমে মন জয় করে। তারপর সুযোগমতো ছলে-বলে-কৌশলে তাদের ধর্মান্তরিত করে।'

'আজ ইরাকের উপর যে হামলা হয়েছে, তা নিছক সাদ্দাম উৎখাতের যুদ্ধ নয়। ইরাককে একটি পূর্ণাঙ্গ খৃষ্টরাজ্য বানানোই মূলত এই হামলার উদ্দেশ্য। এর সূত্রপাত করেছিল ১৯১৭ সালে ব্রিটেন। এ সময় লন্ডন বাগদাদ দখল করে ঔপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, যার ফলে ইরাকে আজ ৫০ লাখ খৃষ্টান অধিবাসী বর্তমান। কিন্তু এই সংখ্যায় তারা সন্তুষ্ট নয়। আমার হাতে চার্চের একটি পরিকল্পনা ফাইল আছে। এর দিকে একটু খেয়াল করুন-

● একটি নতুন রাষ্ট্র আমাদের হস্তগত হয়েছে, যা যিশুর দয়া ও অনুগ্রহের প্রতিফলন।

● খৃষ্টের বাণী প্রচারের এক অপূর্ব সুযোগ এসেছে।

● ইসলাম আর এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না। খৃষ্টধর্ম সে স্থান দখল করে নিবে।

● এ লক্ষ্যে জনগণের মনে চিন্তার স্বাধীনতা ও নব-অনুসন্ধিৎসার আবির্ভাব ঘটাতে হবে।

● বিশেষত ছাত্রসমাজে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি করতে হবে।

● ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।

● বেশি-বেশি মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

● এতিম, পঙ্গু, অসহায়দের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

● যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ টিম গঠন করতে হবে।

● এসব সেবার পাশাপাশি যিশুখৃষ্টের মহানুভবতার ধারণা দিতে হবে।

● সহায়তা হিসেবে দৈনন্দিন খাবারের যেসব সামগ্রী বিতরণ হবে, যেমন– আটার প্যাকেট, খেজুরের প্যাকেট, পানির বোতল, ঔষধের বাক্স ইত্যাদির সাথে 'খৃস্টান মিশনারীদের পক্ষ থেকে গিফট' এই লেবেলটি এঁটে দিতে হবে।

● সেই সাথে প্রত্যেককে একটি করে আরবীতে লেখা যিশুখৃষ্টের জীবনী দেওয়া হবে।

● আমাদের এ কাজ করতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

● আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা হবে, যেন নতুন-নতুন দম্পতি আমাদের এ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

● খৃষ্টবাদের এই মহৎ কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিতে যত অর্থের প্রয়োজন, তা 'মিশনারী সম্মিলিত পরিষদ' জোগান দিবে।

● খৃষ্টের অনুসারীদের মনে রাখতে হবে, আমরা যদি উপরোক্ত কর্মযজ্ঞ সুন্দরমতো আঞ্জাম দিতে পারি, তবে ঈশ্বর মুসলমানদের হৃদয়ের দ্বার খৃষ্টের বাণী গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। আর এভাবেই আমরা এ দেশবাসীকে যিশুর শিষ্য বানিয়ে আমাদের পবিত্রতার জয়গানে আনন্দ করব।'

'শ্রদ্ধেয় উপস্থিতি!

আপনারা জানেন, আমরা দুজন ছিলাম এই মিশনারী সংস্থার কর্মী। এর জন্য আমরা নিজেদের জীবন-যৌবন কুরবান করতেও প্রস্তুত ছিলাম। আমরা বিশ্বাস করতাম, এর বিনিময়ে কুমারী মাতা মেরির সাথে আমরা স্বর্গে অবস্থানের সুযোগ পাব। কিন্তু গির্জার রাহেবগণ আমাদের সাথে যে আচরণ করেছেন, তাতে আমার মনে হয় নরক ভিন্ন অন্য কোনো স্থান আমাদের জন্য উপযুক্ত নয়। অবশ্য এই উপলব্ধিও এসেছে ইসলামের সাথে পরিচয়ের পর। ইতিপূর্বে পাপের সেই অন্ধকার গলিকেই আমরা মুক্তির সোপান বিবেচনা করতাম। এই প্রেক্ষিতে আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক আহ্বান, পবিত্র ইসলামের শুদ্ধতা, মানসিকতা অন্যদের নিকট তুলে ধরুন। নিজেরা ধর্ম পালনে আরও যত্নবান হোন। সর্বোপরি খৃষ্টবাদের নাপাক সয়লাব থেকে দেশ-জাতি ও ধর্মকে রক্ষাকল্পে ময়দানে নেমে পড়ুন। মনে রাখবেন, সরাসরি মার্কিন সৈনিকদের সাথে যুদ্ধ লড়ার চেয়ে এই ময়দানে লড়াই করা কোনো অংশে কম নয়। কারণ, খৃষ্টানদের ধর্মান্তকরণের এই ধারা রুখতে না পারলে যুদ্ধ জয় করে যখন ঘরে ফিরবেন, তখন দেখবেন আপনার ঘরের লোকেরাই খৃষ্টান হয়ে গেছে। পাড়া-পড়শীদের অবস্থাও একই। তখন আপনার যুদ্ধজয়ের ফলাফল কী দাঁড়াবে? আমি জানি, মার্কিন বাহিনী বেশি দিন ইরাকে অবস্থান করবে না। তারা একটা পাতানো নির্বাচন দিয়ে একটা পুতুল সরকার গঠন করে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিবে। ওই সরকারকে পাহারা দেওয়ার জন্য হয়ত সামান্য কিছু সৈনিক থেকে যাবে। এরপর সর্বাত্মকভাবে সরকারি পৃষ্টপোষকতায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু হবে। কাজ করবে গির্জার লোকেরা, সরকার দিবে সাপোর্ট। সুতরাং ইরাকিদের আজ লড়াই করতে হবে দুই ময়দানে।'

'আমার সর্বশেষ কথা হল, আমরা এ দেশে এসেছিলাম সেবার আড়ালে ধর্ম প্রচার করতে। এ মিশন থেকে আমি অন্তত পিছপা হতে চাই না। এত দিন বাতিল ধর্মের প্রচার করেছি, এবার সত্য ধর্মের প্রচার করব। এ কাজে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করতে কে-কে প্রস্তুত আছেন, হাত তুলে দেখান।'

মারিয়া, রুকাইয়াসহ উপস্থিত সকলেই হাত তুলল। কিন্তু একজন লোকের হাত শুধু উঠল না। সে হল বয়োজ্যেষ্ট মেহমানের হাত। বিষয়টি অন্য কেউ খেয়াল না করলেও জুলিয়ার সতর্ক দৃষ্টি এড়াল না। অবশ্য ইতিপূর্বে লোকটির কণ্ঠস্বর এবং প্রশ্নের ধরনেই তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। এবার হাত না তোলায় সন্দেহটা প্রগাঢ় ধারণায় রূপান্তরিত হল। তবে প্রমাণ করার সময় এখনও আসেনি।

জুলিয়ার বক্তব্যের পর শুরু হল তাদের ধর্ম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। এটা এমন জটিল কোনো প্রক্রিয়া নয়। কেননা, প্রকৃতিগতভাবে প্রতটি মানবশিশুই ইসলামের উপর জন্ম নেয়। তারপর বড় হয়ে সে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির শিকার

হয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। ধর্মের নামে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য অধর্মের মধ্যে সে সবচেয়ে কাছেরটার মধ্যে ঢুকে যায়। পুনরায় যদি কেউ স্বধর্মে অর্থাৎ ইসলামে ফিরতে চায়, এ ক্ষেত্রে তার তেমন কঠিন কোনো বাধা ডিঙাতে হয় না। তবে পবিত্র ধর্মে প্রবেশের পূর্বে শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ– গোছল করতে হয়, এরপর পবিত্র কালিমা পড়ে নিয়েই সে একজন মুসলিমরূপে গণ্য হয়ে যায়।

মারিয়া ও জুলিয়ার গোসলপর্ব ইতিপূর্বেই সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি শুধু কালেমা পড়া। অবশ্য ইতিমধ্যে কালিমাও তারা পড়ে নিয়েছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা বাকি। কাজী মাওলানা সুলাইমান আবদুল আযীয এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন। তিনি যেই-না তার কাজ শুরু করবেন, এরই মধ্যে সেই বয়োজ্যেষ্ঠ মেহমান বলে উঠলেন, 'মাওলানা সাহেব! আপনি এই বিদেশি মেয়েদের যে ধর্মান্তরিত করছেন, এ ব্যাপারে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জেনে নিয়েছেন? আবার এমন না হয় যে, এই মহৎ কাজ করতে গিয়ে আপনি নিজেই কোনো ঝামেলায় পড়ে যান।

এমন একটি সময়োপযোগী পরামর্শে কাজী সাহেব দোটানায় পড়লেন। বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মুরুব্বীর কথাকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। আবার অনুষ্ঠানও বর্জন করতে পারছেন না। এ ব্যাপারে তিনি জয়নুল সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তৎক্ষণাৎ জুলিয়া ডাকল জয়নাল আবেদীন সাহেবকে। পাশের কামরায় নিয়ে গেল তাকে।

'চাচাজান! এই মুরুব্বী লোকটা কে? আপনাদের কেমন আত্মীয় উনি?' বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে জুলিয়া বলল। তার প্রশ্নে জয়নুল সাহেব হয়রান হয়ে গেলেন। লোকটা তাদের কোনো আত্মীয় তো নয়ই, বরং তাকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছেন বলেও মনে পড়ে না। জুলিয়াকে তিনি কী উত্তর দিবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করল জুলিয়াই।

'চাচাজান! আমি জানি, আপনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ। ওনাকে আমি চিনি। চিনে মারিয়াও। ইরাকে আমরা যে গির্জার আশ্রয়ে থাকতাম, উনি সেখানকার ফাদার। ওনার বেশ-ভূষা ও লম্বা সাদা দাড়ি আমাকে এতক্ষণ ধোঁকায় ফেলেছিল। ওনার নাম ফাদার সান্দ্রা কেভিনিন। উনি মোটেই বৃদ্ধ নন। এই বেশটা তার ছদ্ম। লোকটা বড়ই চতুর। তবে উনি যে একেবারে এ পর্যন্ত চলে আসবেন, তা আমরা ভাবতে পারিনি।'

'মা-মণি! আমাকে এখন কী করতে হবে বলো?' – জয়নুল সাহেব ব্যস্ততার সাথে বললেন – 'মেহমানরা যে অপেক্ষারত।'

'আপনি মেহমানদের আমার কথা বলুন যে, আমার খুব ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে' – জুলিয়অ বলল – 'পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়েই আমি ফিরছি। আর মারিয়া ও রুকাইয়া আপুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

উদ্ভুত পরিস্থিতি জয়নুল আবেদীন সাহেবকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিল। বেচারার ভাগ্যটাই এমন। তিনি সর্বদা ঝামেলামুক্ত থাকা পছন্দ করেন। কিন্তু তার কোনো কাজই ঝামেলা ছাড়া শেষ হয় না। এটা কেবল তার বেলাতেইবা বলব কেন, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে। তার মধ্যে মুমিনদের বেলায় একটু বেশি ঘটে। কেননা, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, দুনিয়াটা মুমিনদের জন্য কারাগার আর কাফের-অবিশ্বাসীদের জন্য বালাখানা। সুতরাং কারাগারে আসামী যেমন নিজ ইচ্ছা-খেয়াল ও ভালো লাগা অনুযায়ী কোনো কাজ করতে পারে না, ঠিক মুমিনরাও দুনিয়া নামক জেলখানায় অনুরূপ জীবন-যাপন করবে এটাই হাদীসের শিক্ষা। তাই এ সকল ঝামেলার মধ্যে পড়লে জয়নুল আবেদনি সাহেব এই হাদীসটি বারবার আওড়ান। আর এতেই তিনি মনের তৃপ্তি খুঁজে পান। আজও তাকে একই কাজ করতে হল এবং মনের অস্বস্তি ভাবও দূর হল।

◆◆◆

ঈগল সারা দিনের কাজ শেষ করে বিকালবেলা বাগদাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ এতিমখানাটিতে গেল। সেখানকার মসজিদে আসরের নামায আদায় করল। নামাযের জামাত অল্প আগে শেষ হয়েছে। তাই সে একা-একা নামায পড়ল। নামায পড়াবস্থায় সে একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। কচি কণ্ঠের ফোঁপানো কান্না। নামাযের সালাম ফিরিয়ে সে লক্ষ্য করল, মসজিদের উত্তর কর্ণারে একটি খামের আড়ালে ছোট্ট একটি শিশু প্রার্থনারত। সে-ই কাঁদছে। ছেলেটির বয়স দশ-বারো বছরের বেশি হবে বলে মনে হল না। ঈগল তার কাছে গেল এবং পাশঘেঁষে বসল। ছেলেটা এতই নির্বিষ্টমনা যে, সে তা টেরও পেল না। প্রার্থনায় সে শুধু কাঁদছেই। তেমন কিছু বলছে না। এতটুকু ছেলে কি-ইবা আর বলবে। কিছুক্ষণ পরপর আল্লাহ! আল্লাহ! বলছে। আর বলছে, উম্মী! আবী! জাদ্দী!

ঈগল প্রায় দশ মিনিট বসে শিশুটির সকাতর কান্না অবলোকন করল। তার কান্নার গতি ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। তাই সে তার পিঠে আস্তে করে হাত বোলাল। সাথে-সাথে সে তার কোলে নেতিয়ে পড়ল। কান্নাও থেমে গেল। শিশুটির সার্বিক অবস্থা অনুধাবন করতে তার তেমন বেগ পেতে হল না। পিতামাতাহারা অনাথ শিশু সে। কাঁদছিল তাদের স্মরণে। তার এটুকু বুকে কত বড় ব্যথার পাহাড় চেপে আছে তা কে বুঝবে! এই পাহাড় বহনের সাধ্য যে তার নেই। এই মুহূর্তে ঈগল তার পিঠে হাত না বোলালে ওর কঁচি বুকটা হয়ত ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

ঈগল শিশুটিকে ফ্লোরে শুইয়ে দিল। সাথে থাকা বোতলটা বের করে তার চোখে-মুখে পানি ছিটাল। দু-তিন মিনিট পর সে চোখ খুলল। ঈগল তাকে ফ্লোর থেকে উঠিয়ে কোলে তুলে নিল। শিশুটি 'আম্মী আম্মী' (চাচ্চু! চাচ্চু!)

বলে তার গলা জড়িয়ে ধরল। সেও পরম মমতায় তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিল। এই পৃথিবীতে দুঃখীদের বেদনা দুঃখীরাই বেশি বোঝে।

এদিকে মসজিদসংলগ্ন এতিমখানার খেলার মাঠে ছেলেরা খেলাধুলায় মেতে উঠেছে। তাদের হই-হুল্লোড়ের শব্দ মসজিদে বসেও শোনা যাচ্ছে। ঈগল শিশুটিকে নিয়ে খেলার মাঠের দিকে যেতে চাইল। কিন্তু সে কিছুতেই সেখানে যাবে না বলে জানাল। তার এমন আচরণে সে অবাক না হয়ে পারল না। কেননা, একজন শিশুর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল খেলাধুলা। শিশুদের মানসিক বিকাশেও নির্মল খেলাধুলার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খেলার কথা শুনলে খুশি হয় না এমন শিশু হয়ত পৃথিবীতে নেই। শিশুরা তো খেলাধুলার কথায় এত উদ্বেলিত যে, এজন্য তারা নাওয়া-খাওয়া-ঘুম সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মোটকথা, শিশু জীবনের ধ্যান-জ্ঞান সবই আবর্তিত হয় খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে। যেখানে অধিকাংশ সময় অভিভাবকগণ শিশুদের খেলাধুলার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকেন, সেখানে একটি শিশুর খেলার মাঠে যেতে অস্বীকৃতি জানানো কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটাকে অবশ্যই অস্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে আখ্যায়িত করা উচিত।

ঈগল শিশুটির আরও আপন হল। রাহাতের জন্য নিয়ে আসা সাদ্দাম হোসেনের দেওয়া সেই বিস্কুটের প্যাকেটটা ভেঙে তাকে অর্ধেক দিল। এবার তার কষ্টের কথাগুলো জানতে প্রবত্ত হল। সাজ্জাদ নামক এই ফুটফুটে রাজপুত্রসদৃশ শিশুটি যে বর্ণনাগুলো তাকে শোনাল, তা নিপীড়িত অন্যান্য ইরাকি পরিবারগুলোর করুণ কাহিনী থেকে যদিও আলাদা নয়, তথাপি কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

অন্যান্য দিনের মতো সাজ্জাদ তার খেলার সাথীদের নিয়ে বাসার পাশের মাঠটাতে খেলছিল। তার প্রিয় খেলাগুলোর মধ্যে ছিল ফুটবল, ক্রিকেট, যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা ও অন্যান্য। আজ তারা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছিল। প্রথমে কাঠের তৈরী তলোয়ার দ্বারা দ্বৈরথ যুদ্ধের কসরত চলল। তারপর খেলনা বন্দুক নিয়ে সরাসরি যুদ্ধের মহড়ায় মেতে উঠল ছেলেগুলো। এ সময় মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে একটা মার্কিন টহলযান যাচ্ছিল। গাড়িটা দেখে সাজ্জাদ খেলাচ্ছলে তার বন্দুকটা সেদিকে তাক করল। আর যায় কোথায়। তৎক্ষণাৎ টহলযানটা থেমে গেল। সাজ্জাদের বন্ধুরা তা দেখেই ছুটে পালাল। ঘটনার আকস্মিকতায় সাজ্জাদ তড়িতাহতের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সে না দৌড়ে পালাল, না বন্দুক নামাল। সৈনিকরা গাড়ি থেকে নেমে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

এ সংবাদ বাসায় পৌঁছার সাথে-সাথে তার বাবা-মা পাগলের মতো ছুটলেন মার্কিন সেনাক্যাম্পের দিকে। মার্কিন কমান্ডারের কাছে ছেলের মুক্তির জন্য আকুলভাবে অনুনয়-বিনয় করলেন, কান্নাকাটি করলেন। এতে মার্কিন

অফিসারের মন তো গললই না; উপরন্তু তাদেরও বন্দি করে ফেলল। শুধু বন্দি করে ক্ষান্ত থাকলেও কথা ছিল। সে অবস্থায়ই তাদের ওপর শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন।

মার্কিন হানাদার পশুরা একটা নিষ্পাপ শিশুর দুষ্টমির শাস্তিস্বরূপ তার বাবাকে ছাদের সিলিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে দিল। একজন সৈনিককে নিযুক্ত করল তাকে চাবুকাঘাত করার জন্য। স্বামীকে উক্ত সৈনিকের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন সাজ্জাদের মা। তিনি সেখানে আসতেই তিন-চার জন্য সৈনিক ক্ষুধার্ত হায়েনার মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলল পরনের পোশাক। তাঁর ওপর প্রকাশ্যে পালাক্রমে পাশবিক নির্যাতন চালাল বর্বর কুকুরগুলো। একপর্যায়ে এই দুঃখিনী মায়ের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। তিনি পাড়ি জমালেন তিনি পরপারের উদ্দেশে।

কিন্তু নরপশুগুলো এই জনম দুঃখিনী মায়ের লাশের সাথেও সমানতালে বলাৎকার করতে থাকল। তাদের এই ঘৃণ্য নৃশংসতা দেখে মার্কিন কমান্ডারও কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল। কিন্তু তাতে কী হবে? মার্কিন সৈনিকরা যে পশুর চেয়েও অধম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এদের শোধরাবে কে? দেশি-বিদেশি মিডিয়ার কল্যাণে শোনা যাচ্ছে, আফগান-ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। যারা মানুষের মৃত দেহের পবিত্রতা ছিন্নভিন্ন করে, তারা মানসিক ভারসাম্য হারাবে না তো কে হারাবে?

সাজ্জাদের বাবা ছিলেন হার্টের রোগী। সিলিংয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় স্ত্রীর এই করুণ পরিণতি দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। হার্ট এ্যাটাক করে তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ঝুলে থাকল তার মৃত দেহখানা। মুহূর্তের মধ্যে এতিম ও অসহায় শিশুতে পরিণত হল সাজ্জাদ। এ পর্যায়ে মার্কিনিরা সিলিং থেকে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটা নামিয়ে শুইয়ে দিল স্ত্রীর লাশের পাশে। সামান্য সময়ের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটা মার্কিন কমান্ডারের মনেও হয়ত কিঞ্চিৎ অপরাধবোধ তৈরি করল। তদ্দরুন সে বাবা-মার লাশের সাথে মুক্তি দিয়ে সাজ্জাদকেও বাড়িতে পৌঁছে দিল।

সাজ্জাদের বাবা-মায়ের লাশ বাসায় নিয়ে এলে সেখানে এক নিদারুন শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তার বৃদ্ধ দাদা ছেলে ও ছেলে বউয়ের নিথর দেহ অবলোকন করে হার্টে এমন আঘাত পেলেন যে, ক্ষণকালের মধ্যে তিনিও নিথর হয়ে গেলেন। লাশের এই মিছিল ছোট্ট শিশু সাজ্জাদকে করে তুলল নিরাশ্রয়-নিঃসহায়। ঠাই হল তার এই অরফানেজ ট্রাস্টে। সেই থেকে এই কচি শিশুটি খেলাধুলার নাম শুনলেও ভয়ে কেঁটে ওঠে। হায় আমেরিকা! ধিক্ তোমার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারে! শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় তোমার লোকদেখানো; অন্য কথায় লোকহাসানো পরিকল্পনার প্রতি শত-শত ধিক্!

ঈগল এতিমখানায় এসেছে মূলত রাহাতের সাথে দেখা করতে। কিন্তু সাজ্জাদের সাথে দেখা হওয়ায় মসজিদেই কেটে গেল অনেক সময়। সন্ধ্যা হতেও বেশি বাকি নেই। তাই সাজ্জাদ থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে দেখল, রাহাত অন্যান্য ছেলেদের সাথে খেলছে। ঈগল তাকে ডাক দিতে গিয়েও থেমে গেল। ভাবল, ইরাকি শিশুরা আজ সকল রকম শিশু-অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর এখানকার শিশুরা সবাই এতিম-অসহায়। এদের বঞ্চনার মাত্রা আরও বেশি। ওদের অনেকে তো খেলাধুলা ভুলেই গেছে। কেউ-কেউ তো খেলাধুলার নাম শুনলে ভয়ে চিমটে যায়। যেমন– সাজ্জাদ। তাই সকল বঞ্চনা ভুলে রাহাত যখন কিছুক্ষণের জন্য খেলায় মেতেছে, এ মুহূর্তে ওকে ডাক দেওয়া ঠিক হবে না। ওর এই আনন্দে ব্যাঘাত ঘটানো অন্যায় হবে। আর কিছু সময় পরই মাগরিবের আযান হবে। তখন ওরা নিজেরাই খেলার ইতি টানবে।

ঈগল শিশুদের খেলার ইতি টানার অপেক্ষায় মাঠের পূর্ব পার্শ্বে একটি রুমাল বিছিয়ে বসে পড়ল। শিশুদের এই খেলাধুলার দৃশ্য দেখে তার নিজের শৈশবের স্মৃতিগুলো দুলে উঠল। কে যেন একটি-একটি করে স্মৃতির পাতা উল্টাচ্ছে আর সে হারানো দিনের সেই সুখময় চিত্রাবলি তন্ময় হয়ে দেখছে। ওই তো বাল্যবন্ধু হাদীদ, কামাল, জামীর, হামিদ, মুশতাক, ইয়াসীররা মিলে কত ছোটাছুটি, কত দুষ্টুমি! সপ্তাহে একবার ছুটির দিনে সব বন্ধু মিলে দজলা নদীর বুকে সাঁতার কাটা কত-না আনন্দদায়ক ছিল। নদীর তীরে ফুটবল খেলা নিয়ে কত হুটোপুটি চলত বন্ধুদের মধ্যে। ছোট-ছোট নৌকা নিয়ে নদীর বুকে ভ্রমণ করার চমৎকার সেই আনন্দ আজ কই? সাইকেল নিয়ে বন্ধুরা মিলে শহরময় ঘুরে বেড়ানোর দুরন্ত সেই দিনগুলো কখনো কি ফিরে পাব আমরা? আমরা না-ই পাই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও কি পাবে কখনো আর অমন সোনালি দিন? কার কাছে খুঁজব আমাদের এই বেদনাদায়ক প্রশ্নের উত্তর? কে দিতে পারবে এর সমাধান? আমেরিকা? জাতিসংঘ? ইইউ? না; এরা দিবে না উত্তর। দিতে পারবেও না। হ্যাঁ; একজন পারবেন। কেবল তিনিই পারবেন আমাদের সোনালি ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিতে। তিনি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাই আমাদের সকল অভিযোগ তাঁর পবিত্র দরবারে সমর্পণ করে রাখলাম। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের সহায় থেকো।

ঈগল মাঠের কিনারে বসে যখন অতীতের স্মৃতিচারণ করছিল, সহসা পিছন দিক থেকে কে যেন তার চোখদুটো চেপে ধরল। ঈগল কে? কে? বলে হাতদুটা ধরে ফেলল। সে ধরেছে দুটা কচি হাত। তার বুঝতে বাকি রইল না কার হাত সে ধরেছে। তাই বলল, 'কার এত বড় সাহস রে বাগদাদের ঈগলের চোখে হাত দেয়?'

'পারলে বলো, কে হতে পারে সেই সাহসী ব্যক্তি?' – রাহাত প্রতিউত্তরে এ কথা বলেই হেসে ফেলল। আর ঈগল তাকে টেনে কোলে বসিয়ে বলল– 'এই যে আমার সেই সাহসী ভাইটি।'

হতভাগা রাহাতকে আজ হাসি-খুশি দেখে ঈগলের খুব ভালো লাগল। কেননা, প্রথম দিকে তো সে এখানে থাকতেই চায়নি। দিন-রাত কেঁদে-কেঁদে কাটাত। আজকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সে এখানকার পরিবেশে মিশতে পেরেছে। এটা একটা শুভ লক্ষণ। ভাঙা-গড়া, দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা, পাওয়া-না পাওয়া এই মিলিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু শিশুদের তো আর এত কিছু বোঝানো যায় না কিংবা তারা জীবনের এত জটিল হিসাব-নিকাশ বোঝার ক্ষমতাও রাখে না। সুতরাং সে যদি এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তবে তাকে সিরিয়ায় পৌঁছানোর চিন্তা থেকে আপাতত মুক্ত থাকা যাবে।

ইতিমধ্যে মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। ঈগল রাহাতকে সাথে নিয়ে মসজিদের দিকে চলল। মসজিদে প্রবেশ করে সাজ্জাদকে পূর্বের স্থানেই দেখতে পেল। ঈগল রাহাতকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। এই পরিচয়ের ফল দাঁড়াল, সাজ্জাদ এর আগে কারো সাথে মিশত না। এই পরিচয়ের সূত্রে পরবর্তী সময়ে ওদের দুজনের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মূলত সাজ্জাদের জীবনে যে প্রলংয়করী সাইক্লোন আঘাত হেনে তার বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বনগুলো তছনছ করে দিয়েছিল, তাতে ওর মানসিক অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বন্ধত্বের এ সম্পর্ক তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে অসম্ভব ভূমিকা রেখেছে।

ঈগল এতিম শিশুদুটিকে নিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করল। নামাযান্তে ওদের সাথে নিয়েই মসজিদ থেকে বেরুল। মসজিদের সম্মুখেই দেখা হল এতিমখানার পরিচালকের সঙ্গে। ঈগল ইতিপূর্বে এখানে একবার এসেছিল। তখন পরিচালক উপস্থিত ছিলেন না। তাই তার সাথে পরিচিতিও ছিল না। সেজন্য প্রাথমিক কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি ঈগলের পরিচিতি জানতে চাইলেন। পরিচয় দিল ঈগল। পরিচয় পেয়ে পরিচালক সাহেব যারপরনাই বিস্মিত হলেন। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তিনি অব্যাহতভাবে যার সুখ্যাতি শুনে আসছেন, সেই 'বাগদাদের ঈগল' এখন তার সামনে দণ্ডায়মান, যা বিশ্বাস করতেই তার কষ্ট হচ্ছে। তিনি ঈগলকে নিজ দপ্তরে নিয়ে বসালেন। রাহাত ও সাজ্জাদকে নিজ-নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন।

এতিমখানার পরিচালক ঈগলের কাছে ইরাকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করলেন। ঈগল তার সমুদয় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিল। এরপর তিনি তার প্রতিষ্ঠানের কিছু সমস্যা তুলে ধরলেন এবং এগুলো সমাধানে ঈগলের হস্তক্ষেপ কামনা করলেন। তিনি বললেন, 'বর্তমানে দেশ যুদ্ধাক্রান্ত থাকায় ভর্তিচ্ছু শিশুদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। এর সাথে দুটা সমস্যা

প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এক হল আবাসন সংকট। দ্বিতীয় হল খাদ্যসংকট। আবাসন সংকটের কারণে একটি কক্ষে দশজনের স্থলে পনেরো-বিশজন, ক্ষেত্রবিশেষে তারও অধিক শিশুকে থাকতে হয়, যা শিশুদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টির ঝুঁকি বাড়ায়। খাবারের বিষয়টিও একই রকম। অর্থাৎ– দুজনের খাবার পাঁচজনে ভাগ করে খায়। যদ্দরুন অধিকাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠানটিতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উৎস থেকে অনুদান আসত। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি সরকারি সাহায্য বন্ধ আছে। এখন শুধু বেসরকারি ব্যক্তিবিশেষের অনুদানেই চলতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।'

'বর্তমান সরকারের কাছে কি আপনারা কোনো আবেদন নিয়ে গিয়েছিলেন?' ঈগল প্রশ্ন করল।

'গিয়েছিলাম বৈ কি!' – পরিচালক সাহেব বললেন – 'কিন্তু তাদের সাহায্য শর্তযুক্ত ছিল বিধায় আমরা তা গ্রহণ করতে রাজি হইনি।'

'সেই শর্তগুলোতে কী-কী জটিলতা ছিল? একটু খুলে বলুন।'

'প্রথম শর্তটিই ছিল প্রতিষ্ঠানটি তাদের হাওয়ালা করে দেওয়া' – পরিচালক বললেন – 'অর্থাৎ– সরকারি সাহায্য নিতে হলে সরকারকর্তৃক নিয়োগকৃত তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে। আর উক্ত তত্ত্বাবধায়ক হবেন গির্জার কোনো বিশপ। এবার বুঝতেই পারছেন সরকারের মতলব কী। প্রথম শর্ত না মানলে দ্বিতীয় শর্ত হল, অন্তত একজন সাধারণ রাহেবকে প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা পাঠদানের সুযোগ দিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি বাইবেল শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। আর সাহায্যের পরিমাণ হল প্রথম শর্ত মানলে একশ ভাগ। দ্বিতীয় শর্ত মানলে আংশিক। আমরা দুটা শর্তই প্রত্যাখ্যান করলাম। সাহায্যও বন্ধ থাকল।'

'আপনাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সাহসিকতাপূর্ণ' – ঈগল বলল – 'সেজন্য আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে ভবিষ্যতেও আপনাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, রিযিকের মালিক আল্লাহ। বান্দা যখন তাঁর ওপর সকল কিছু সোপর্দ করে, তখন তিনিই সবকিছুর ফয়সালা করেন।'

'জনাব! এই বিশ্বাসের উপরই আমরা অটল আছি' – পরিচালক সাহেব বললেন – 'নতুবা হয় আমাদের সরকারি শর্ত মেনে সাহায্য নিতে হত অথবা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হত।'

'শুকরিয়া মুহতারাম! শুকরিয়া' – ঈগল বলল – 'শক্ত ঈমানের মানুষই আপনারা। আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য কিছু করতে পারি।'

'আল্লাহ আপনাকে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন।'

'আমীন!' ঈগল সজোরে বলে উঠল।

ঈগল প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে কথাবার্তা শেষ করে রাহাতের রুমে গেল। তার জন্য নিয়ে আসা সামগ্রীগুলো তাকে দিল। এর মধ্যে আধা প্যাকেট বিস্কুট, পনির, বোতলজাত পানি ও কিছু খেজুর ছিল। এক সেট নতুন পোশাকও ছিল। এসব একত্রে পেয়ে রাহাত খুশিতে চিৎকার দিতে লাগল। ঈগলের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল বারকয়েক। পরিবেশ-পরিস্থিতি মানবসন্তানকে কতখানি পাল্টে দিতে পারে, তার প্রমাণ এই শিশুটি। আজ যে সামান্য জিনিসে সে মহাখুশি, এমন একটি সময় গেছে, যখন এর চেয়েও অনেক বেশি সে ফেলে দিত। ওর খুশি দেখে ঈগল এ কথাগুলোই ভাবছিল।

এতিমখানা থেকে বেরিয়ে ঈগল নিজের আস্তানার দিকে রওনা দিল। সহসা তার মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। ফোন হাতে নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হাসল। কলটা রুকাইয়ার। তাকে নিজের আসন্ন বিবাহের নিউজটি দেওয়ার জন্য খুশি মনে ফোনটি রিসিভ করল। কিন্তু রুকাইয়ার কণ্ঠ শুনে তার খুশি উবে গেল। সে দ্রুত তাকে মহামুদাদের বাড়ি পৌঁছার তাগিদ দিল। ঈগল বুঝল, নিশ্চয়ই কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা ছোটখাট ব্যাপারে ফোন দেওয়ার মতো মেয়ে রুকাইয়া নয়।

অল্প সময়ের ব্যবধানে ঈগল মাহমুদাদের বাড়িতে পৌঁছল। রুকাইয়ার ছদ্মবেশী খৃষ্টান পাদ্রীর ঘটনা তাকে সবিস্তারে বলল। ঈগল তৎক্ষণাৎ ফাদার সান্দ্রা কেভিনিনের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করল। তার হাতদুটো পিছন দিকে নিয়ে বেঁধে মুখে কচটেপ এঁটে ফেলে রাখল গাড়ির গ্রেজে। কাজটা এত কৌশলে ও চুপিসারে করা হল যে, অন্য কোনো মেহমান টেরও পায়নি, বুঝতেও পারেনি। তারপর অনুষ্ঠানের কার্যক্রম স্বভাবিকভাবে শেষ করে মেহমানদের বিদায় দেওয়া হল।

অনুষ্ঠান শেষে রুকাইয়া ঈগলের কাছে তার কুশলাদি জানতে এল। তার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ নাঈমার সাথে বিবাহের কথাবার্তা কতদূর এগুল সেটা জানা। ঈগল যখন বলল, কাথাবার্তা সব সম্পন্ন হয়েছে, এখন দিন-তারিখ ঠিক করলেই হয়, রুকাইয়া তখন আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার দিল। তার চিৎকারের শব্দের বাড়ির প্রায় সবাই একত্র হল। চিৎকারের কারণ জেনে সবাই আনন্দিত হল। তবে এই আনন্দঘন পরিবেশে ঈগল বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে সে নিজ আস্তানার দিকে রওনা দিল। যাওয়ার পূর্বে বন্দির সাথে ভালো আচরণের নির্দেশ দিয়ে গেল।

সাত.

আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মুহূর্তের মধ্যে রাজাকে ফকির, ফকিরকে রাজা বানাতে পারেন। তার ইঙ্গিতে আসামী বা বন্দির রাজা হতে পারে, আবার রাজাও হয়ে যেতে পারেন আসামী। এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে

মানুষের কোনো হাত নেই। অবশ্য মানুষের কর্মফল এ ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা রাখে। কেননা, মহামহিম আল্লাহ কর্ম অনুযায়ী ফল দিতে বদ্ধপরিকর।

এক সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রেফতারির ভয়ে। কিন্তু লুকিয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়? ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তার ফেরারি জীবনের অবসান ঘটল। মার্কিন আগ্রাসনের প্রায় ৯ মাসের মাথায় গ্রেফতার হলেন তিনি।

সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতার হওয়া কোনো মামুলি ঘটনা নয়। তার গ্রেফতারিতে সারা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হল। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এ ঘটনায় বিষণ্ন ও ক্ষুব্ধ। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এর প্রতিবাদ জানাল। অবশ্য বুশ-ব্লেয়ার ও তাদের বশংবদ মিডিয়াগুলো বেজায় উল্লসিত। তাদের দৃষ্টিতে, এ এক মহাসাফল্য। আর এই সাফল্যের আনন্দে তারা এতটাই উদ্বেলিত যে, সামনে-পিছনে কিছুই ভাববার ফুরসত পাচ্ছে না। তাদের এই উল্লাসই যে তাদের মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছে, সে খবরও হয়ত তারা রাখছে না। এজন্যই বলা হয়, ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত ব্যক্তিরা সর্বদাই জনমতকে উপেক্ষা করে চলে। কিন্তু এর ফলাফল কখনোই তাদের অনুকূলে যায় না।

এতদিন বুশ-ব্লেয়ার চক্র সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছিল, তিনি একজন স্বার্থবাদী নেতা। দেশ-জাতিকে বিপদের মুখে ফেলে তিনি অন্য কোনো দেশে আত্মগোপন করেছেন। অন্য দেশ বলতে কখনো রাশিয়া, কখনো সিরিয়া, কখনো অন্য কোনো কমিউনিস্ট মুলুকের কথা বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন অক্ষশক্তি এই নির্জলা মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিল মূলত দুটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। প্রথমত, ইরাকি জনতার হৃদয়ে সাদ্দামের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, এই মিথ্যার প্রচাণায় ক্ষিপ্ত হয়ে যেন সাদ্দাম হোসেন নিজেই আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসেন। বাস্তবে তাদের দুটা উদ্দেশ্যই বিফল হল। ইরাকের মাটিতে তিনি গ্রেফতার হওয়ায় দখলদারদের এত দিনের অপপ্রচার যেমন মিথ্যা প্রতিপন্ন হল, তেমনি তিনি স্বেচ্চায় ধরা না দেওয়ায় শত্রুর ফাঁদ এড়িয়ে চলার বিচক্ষণতারও প্রমাণ মিলল।

কোনো মানুষ যতই বিচক্ষণ হোক বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখে তার সমস্ত সচেতনতা ধূলিসাৎ হতে বাধ্য। আর সেই বিশ্বাসঘাতক যদি হয় নিজ দেহরক্ষী, তাহলে তো কথাই নেই। ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মার্কিনিদের হাতে আটক হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ ছিল এ বিশ্বাসঘাতকতা। তার দেহরক্ষীদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই তাঁকে দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দি হতে হলো।

সাদ্দাম হোসেনে সেদিন বাগদাদের ঈগলের পরামর্শক্রমে চারজন রেখে বাকি সব দেহরক্ষীকে বিদায় করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, এই চারজন তার একান্ত অনুরক্ত। এদের নিয়ে তিনি অন্য এক বিশ্বস্ত পুরনো বন্ধুর বাড়িতে গমন

করলেন। উদ্দেশ্য, সেখানে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আনিয়ে নিজের শরীরটা একটু ভালোভাবে চেকআপ করানো। ইদানিং শরীরটা খুবই খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু সর্ষের ভেতরেই যে ভূত লুকিয়ে ছিল, তা ছিল তাঁর একেবারেই অজানা।

সাদ্দাম হোসেন বেশ কদিন হয় তার এই বন্ধুর বাড়িতে এসেছেন। দুজন রক্ষীকে সার্বক্ষণিক সঙ্গে রেখে অন্য দুজনকে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সন্ধানে পাঠালেন। কিন্তু তারা সেই যে গেল আর ফেরার নাম নেই। তাদের কোনো সমস্যা হল কিনা এই চিন্তায় তিনি অনেকটা বেচইন সময় অতিবাহিত করছেন।

অন্যান্য দিনের মতো সাদ্দাম হোসেন আসরের নামায পড়ে কুরআন তেলাওয়াত করে উঠলেন। ইতিমধ্যে মাগরিবের আযান হয়ে গেল। তিনি কুরআন রেখে নামাযে দাঁড়ালেন। এক রাকাত নামায পড়ে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য যখন দাঁড়ালেন, ঠিক সে সময় তিনি রুমের মধ্যে একাধিক মানুষ প্রবেশের পদধ্বনি শুনলেন। কিন্তু তিনি নামায ছাড়লেন না। সহসা মানুষরূপী এক মার্কিন পশু সৈনিক তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। নামাযরত অবস্থায়ই 'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট' বলে তার হাতে হ্যান্ডকাপ পরাল। ঘটনার আকস্মিতায় তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, তার সেই দুই দেহরক্ষী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দুই রক্ষী যারা তার সঙ্গে ছিল, তাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ফ্লোরে ফেলে রাখা হয়েছে। রুম থেকে শুরু করে বাড়ির বহিরাঙ্গন পর্যন্ত প্রায় চারশ মার্কিন সৈনিক সশস্ত্র অবস্থানে দাঁড়ানো। সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি যা বুঝবার বুঝে নিয়েছেন। তাই কোনোরূপ উচ্চবাচ্য না করে নীরবে মার্কিনিদের সাথে হেঁটে চললেন।

দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময়ের এক সফল রাষ্ট্রনায়ক সাদ্দাম হোসেনের বন্দি হওয়ার এ হল প্রকৃত ঘটনা, যাতে মার্কিনিদের কোনো কৃতিত্ব ছিল না। বরং তারা ধোঁকাবাজি করে তার একান্ত অনুগত দুজন দেহরক্ষীকে লোভ দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতক বানিয়ে এ কাজ করল। এর বিপরীতে মার্কিনিরা বিশ্ববাসীকে বোকা বানানোর জন্য এবং সাদ্দাম হোসেনের ইমেজ ক্ষুণ্ন করার নিমিত্তে একটা চিত্তাকর্ষক গল্প সাজিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালিয়ে দিল। সাদ্দাম গ্রেফতারের ঘটনা হিসেব ওটাই আজ বিশ্ববাসীকে গেলানো হচ্ছে। প্রিয় পাঠকবৃন্দের কৌতূহল নিবারণের জন্য সেই গল্পটা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরা হল–

সাদ্দাম হোসেনকে তার এক সাবেক দেহরক্ষীর মালিকানাধীন একটি গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত দেহরক্ষীর নাম বলা হয়েছে কাইসনামেক আল-দুরী। তার আস্তানাটা আয়তনে খুবই ছোট ছিল। এটা সাদ্দাম হোসেনের জন্মভূমি তিকরিতেই অবস্থিত।

"১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৬ শত সৈন্যের একটি দল তিকরিতের প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আদ-দাওয়ার গ্রামের দুটি খামারবাড়ি ঘেরাও করে। দুঘন্টা পর দখলদার বাহিনীর সৈন্যরা খামারবাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালায়। খোঁজাখুঁজি

করেও বাড়িদুটিতে দখলদার বাহিনী প্রথমে কিছুই পায়নি। হঠাৎ ছোট্ট একটি দেওয়ালঘেরা কম্পাউন্ড থেকে দুজন লোককে তারা দৌড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে। এতে তাদের সন্দেহ হয়। এরপর মার্কিন সৈন্যরা ঝুপড়িতে প্রবেশ করে কাদা ও কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি একটি কুড়েঘর দেখতে পায়। ঘরের সামনের কার্পেট তুলে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে একটা স্টিরো ফোম প্যানেল তাদের চোখে পড়ে। এর নিচেই পেল একটা গর্ত। ওই গর্তটা গেছে সাদ্দাম হোসেনের কক্ষ পর্যন্ত। সেই কক্ষেই ঘুমিয়েছিলেন ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেন।

মাটির নিচের ৫ ফিট বাই ৮ ফিট রুমটিতে একটি শয়নকক্ষ ছিল। রান্নাবান্নার জন্য ছোট একটি হেঁসেল ছিল। সেখানে সাদ্দাম হোসেন এত দিন কাটিয়েছেন। সেই গোপন কক্ষের দেওয়ালে ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর কিস্তির একটি ছবি। কাঁচা ইটের গোপন কক্ষটির ছাদ ছিল লতাপাতায় আচ্ছাদিত। বাইরে আসা-যাওয়ার জন্য একটি ধাতব দরজা ছিল। কক্ষে তাঁর জামা-কাপড় ছিল ময়লাযুক্ত। সেগুলোর মধ্যে ছিল একটি তোয়ালে, কয়েকটি পায়জামা, একটি বেডকভার ও একটি কম্বল। মেঝেতে একটি বাক্স ছিল। ছিল একটি আরবীয় আলখেল্লা। দুটো টি শার্ট, দুই জোড়া শার্ট, এক জোড়া সেন্ডেল ও এক জোড়া কালো জুতা ওই কক্ষে পাওয়া গেছে। কিছু পুরনো পুস্তকও সেখানে ছিল। খাওয়ার জন্য ছিল একটি পাত্রে কয়েকটি পাউরুটি ও আরেকটি পাত্রে কিছু ভাত। বাসন-কোসন যা ছিল তার সবই ছিল ময়লা। একটি গ্যাসের চুলা ছিল। আরো ছিল সাবান, কফির একটি ক্যান, একটি আয়না ও টুথব্রাশ। গোপন কক্ষের বাইরে ছিল একটি গর্ত। ওই গর্তটি ল্যাট্রিন হিসেবে ব্যবহার করা হলেও গোসলের জন্য কোনো ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। গর্তের উপর ছড়ানো-ছিটানো পঁচা ফলমূল ও ভাঙা একটি চেয়ার। মার্কিন বাহিনীর সদস্যরা ওই গর্তের ওপর একটি সাদা কাপড় দেখতে পায়। সেই কাপড়ের নিচে ছিল দুটি তারের হাতলযুক্ত ফোম। গর্তের পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল। তার পাশেই একটি পুরনো টিনকে অক্সিজেন তথা নিঃশ্বাস নেওয়ার পাইপ হিসেবে ব্যবহার করা হত। সেটার মাধ্যমেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেন সাদ্দাম হোসেন। অর্থাৎ ওই টিনের পাইপটি ছিল কক্ষের ভিতরে অক্সিজেন প্রবেশের একমাত্র মাধ্যম। ময়লা-আবর্জনা আর লতাপাতা দিয়ে সেই পাইপটিও ঢেকে রাখা হয়েছিল। ইরাকের রাষ্ট্রনায়ক সাদ্দাম হোসেনকে এভাবেই কষ্ট করে থাকতে হয়েছে।

মার্কিন সৈন্যরা গর্তের ভিতরে ঢুকে এলোমেলো দাড়িভর্তি ঘুমন্ত একটি লোককে দেখেই প্রথমে চিনতে পারেনি। লোকটিকে জাগিয়ে তুলে তার পরিচয় জানতে চায়। তাদের কথার প্রতিউত্তরে সঙ্গে-সঙ্গে সাদ্দাম হোসেন বললেন, আমি সাদ্দাম হোসেন। ইরাকের বৈধ প্রেসিডেন্ট। আমি আলোচনা করতে চাই। জবাবে দখলদার বাহিনীর সদস্যরা বলল, আপনি প্রেসিডেন্ট বুশের অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

এই হল সাদ্দাম গ্রেফতারে মার্কিনি প্রচারণার কাসুন্দি। আর এটা তারা এমন নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছে, যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়। এর দ্বারা আরো একবার প্রমাণ হল, বিশ্বজুড়ে মার্কিনি মাতুব্বরি সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর ভর করে চলছে। মার্কিনিদের এই মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে পরবর্তী সময়ে সাদ্দামের আইনজীবীরা আদালতেও প্রতিবাদ করেছেন। একটি মিশরীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা সাদ্দামের নিজস্ব আইনবিদদের সূত্রে এক দীর্ঘ রিপোর্টে জানিয়েছে, যেভাবে মার্কিন মিডিয়া সাদ্দামের গ্রেফতার কাহিনী প্রচার করেছে, প্রকৃতপক্ষে তাকে সেভাবে গ্রেফতার করা হয়নি। গ্রেফতারের সময় তার কাঁধে বন্দুক-পিস্তল কিছুই ছিল না। থাকলে বিনা বাধায় তিনি কখনো গ্রেফতারি বরণ করতেন না, বরং লড়াই করে শাহাদাতকেই তিনি গ্রেফতারির চেয়ে প্রধান্য দিতেন। তারা আরও বলেন, সাদ্দামকে গ্রেফতার করে চেতনানাশক ইনজেকশন দিয়ে গর্তে নিয়ে ভিডিও করে মার্কিনিরা তাদের ইচ্ছামাফিক গ্রেফতারি নাটক প্রচার করেছে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদ মোতাবেক বিবিসি, সিএনএনসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারের পর যে চেহারা দেখানো হয়েছে, তাতে জখমের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। মুখাবয়বে ছিল রক্তের দাগ। বাম ভুরুর উপর দুটি ক্ষতচিহ্ন এবং নাকের ব্রিজের ওপর ক্ষতচিহ্নগুলো সবার নজরে পড়েছে। এই সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার চোয়ালের হাড়ের আঘাতগুলো সম্পর্কেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের নামে তার উপর বিশেষ করে মুখমণ্ডলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে দৃশ্যটি বারবার পশ্চিমা টেলিভিশনসমূহে দেখানো হয়েছে, সেটি সাদ্দামের মতো পৃথিবী আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর। সমগ্র বিষয়টি জেনেভা কনভেনশনের নির্লজ্জ বরখেলাফ।

◆◆◆

সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারিতে বহির্বিশ্বের মতো ইরাকেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার গেরিলা সংগঠনগুলো এর প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। ব্যাপকভাবে তারা হানাদার বাহিনীর ওপর আঘাত হেনে চলেছে। আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে দখলদার বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনায়। ধ্বংস করে চলছে তাদের সামরিক যানসমূহ। গেরিলা বাহিনীর মুখপাত্রদের ভাষ্য থেকে জানা যায়, তাদের এই হামলা শুধু ব্যক্তি সাদ্দামের জন্য নয়; বরং একজন অসহায় ইরাকি মুসলমানের অন্যায়ভাবে গ্রেফতারির প্রতিবাদ জানাতেই মূলত তাদের হামলাগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

বাগদাদের ঈগল সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারির সংবাদ শোনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটি মার্কিন সেনা ছাউনি উড়িয়ে দেয়। এতে বিপুলসংখ্যক দখলদার ও তাঁবেদার সৈনিক হতাহত হয়। শুধু তা-ই নয়, ইতিমধ্যে সে গ্রীন জোনের অভ্যন্তরেও বারকয়েক হামলা চালায়। দখলদারদের মনে এতে মারাত্মক ভীতি

ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীনজোনে ঈগলসহ অন্য মুজাহিদরা ইতিপূর্বেও অনেকবার হামলা করেছিল। কিন্তু এবারকার ঈগলের হামলাগুলো এতটা স্পর্শকাতর ছিল যে, দখলদাররা প্রমাদ গুণতে শুরু করল, ঈগলরা না আবার তাদের হাত থেকে সাদ্দাম হোসেনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য তারা তাকে এমন স্থানে বন্দি করে রাখল, যার সম্বন্ধে ইরাকে মার্কিনিদের হাইকমান্ড ছাড়া অন্য কেউ কিছুই জানতে পারল না। শোনা যায়, সাদ্দাম হোসেনের পাহারাদারিতে কোনো মানব সৈনিকের ওপর মার্কিনিরা ভরসা রাখতে পারেনি, তাই রোবট সৈনিক দিয়ে তারা তার পাহারাদারির ব্যবস্থা করেছে।

সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারির পর গোটা ইরাকজুড়ে এমন ভয়াবহ প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হল, মার্কিনিরা যার কল্পনাও কোনো দিন করেনি। তাদের ধারণা ছিল, তাকে গ্রেফতার করলে ইরাকিরা ফুল দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানাবে। তবে হ্যাঁ, শুভেচ্ছা ইরাকিরা ঠিকই জানাচ্ছে। কিন্তু ফুল দিয়ে নয়, বোমা আর বুলেট দিয়ে।

মার্কিনিদের অংকে অবশ্য খুব একটা ভুল ছিল না। তারা মোটামুটি বাস্তবতার নিরিখেই অংশ কষছিল। কেননা, ইরাকের জনগণ কম-বেশি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। দেশের উত্তরাঞ্চলে রয়েছে কুর্দি জাতি। কুর্দিরা কোনো সময়ই সাদ্দাম হোসেনকে মেনে নেয়নি। উপরন্তু তারা স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত। দ্বিতীয়ত, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হচ্ছে শিয়া। এরাও সাদ্দামের শাসনকে কোনো দিন ভালো চোখে দেখেনি। তারা সর্বদাই সাদ্দামের শাসনের অবসান কামনা করত। বাকি রইল সুন্নী সম্প্রদায়। সাদ্দাম নিজেও সুন্নী। কিন্তু হলে কী হব? আজীবন তিনি সেক্যুরারিজম লালন-পালন করায় সুন্নীরাও তাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেন না। এই নিরিখেই মার্কিনিরা ভাবছিল, সাদ্দামের গ্রেফতারিতে বহির্বিশ্বে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ যা-ই হোক বা না হোক; ইরাকের অভ্যন্তরে কেউ টু-শব্দটি পর্যন্ত করবে না। কিন্তু বিধি বাম। হয়েছে তার উল্টোটা।

এটা হওয়ার কারণ হল, সাদ্দাম হোসেনের মতাদর্শ যা-ই হোক তিনি সব সময় হানাদারদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বিদেশি শাসন ও লুণ্ঠন থেকে ইরাকি ভূখণ্ড এবং তেলসম্পদ রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছেন। তার কারণেই তিনি ইঙ্গ-মার্কিন অক্ষশক্তির চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন। এসব কথা ইরাকি জনগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। সেজন্যই তার গ্রেফতারিতে এই সহিংস প্রতিক্রিয়া।

বাগদাদের ঈগল প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে মুক্ত করা উপায় নিয়ে ভাবতে লাগল। সেই সাথে প্রতিদিন দু-একটি করে অভিযান পরিচালনাও অব্যাহত রাখল। এমনই একটি অভিযান চালাতে গিয়ে সে ভিন্ন এক পরিস্থির মুখোমুখি হল। এ সময় ঈগল বাগদাদের পশ্চিম-উত্তর মহাসড়ক সংলগ্ন সেনাছাউনিতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সময়টা ছিল রাত দুটা ত্রিশ মিনিট। হামলা চালাতে

গিয়ে সে নিজেই হামলার শিকার হল। চারজন কমান্ডো সৈনিক তাকে আটক করে ছাউনিতে নিয়ে গেল। ছাউনি প্রধান ঈগলের কাছে আসতেই সে তাকে চিনে ফেলল। প্রধানও ঈগলকে দেখে অবাক হল। তিনি সৈনিকদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে ঈগলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কুশলবিনিময়ের পর প্রধান তাকে নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন।

সেনাছাউনির প্রধানের নাম জর্জ হেরিনসন। সৈনিক খালেদের মধ্যস্থতায় ইতিপূর্বে ঈগলের সাথে তার তিনবার বৈঠক হয়েছে। তৃতীয় বৈঠকের পর তিনি পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, যেটা ঈগল এখনও জানে না। তিনি নিজের নামটিও পাল্টে ফেলেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি অধীন সৈনিকদের মাঝে সুকৌশলে তাবলিগের কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলাফলও অত্যন্ত আশাপ্রদ। তার অধীনে মোট দুশ সৈনিক। ঐ প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে ২৫-৩০ জন সৈনিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন মোহাম্মদ আল-হোসাইন। তিনি ও নবমুসলিম সৈনিকগণ অতি গোপনে নামায পড়েন এবং কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করছেন। তাদের কুরআন শিখতে সৈনিক খালেদ সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে।

সব শুনে ঈগল যারপনাই খুশি হল। আনন্দের আতিশয্যে সে মোহাম্মদ আল-হোসাইনকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

'ঈগল! তুমি যদিও আমার জুনিয়র; তথাপি তোমার উছিলায় যেহেতু আমি আজ ইসলামের আলোকিত উদ্যানে প্রবেশ করতে পেরেছি, তাই তোমাকে অশেষ মোবারকবাদ' – মোহাম্মদ আল-হোসাইন বললেন – 'বলো ভাই! আমি তোমার কী খেদমত করব।'

'আপনি যে খেদমত ইসলামের করছেন, ওটাই আমার খেদমত' – ঈগল বলল – 'বেশি-বেশি ইসলামের তাবলিগ করতে থাকুন; ঈমান তাজা হবে। কেননা, তাজা ঈমান ছাড়া ইসলাম অচল ও অকেজো হয়ে যায়।'

'বহুত আচ্ছা ঈগল! এবার অন্য একটি বিষয়ে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি' – আল-হোসাইন বললেন – 'তোমার সহায়তা পেলে রাতের মধ্যেই বিষয়টির মীমাংসা হতে পারে।'

'আমি আপনার কোনো উপকার করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।' ঈগল বলল।

'তাহলে শোনো! আজ রাত ১২টার দিকে এক তরুণীকে আটক করা হয়েছে' – আল-হোসাইন বললেন – 'সেও তোমার মতো এই ছাউনি হামলা করতে এসেছিল। তাকে যারা গ্রেফতার করেছে, তারা আমার মুসলিম সহকর্মী। সেজন্য আমি চাচ্ছিলাম, ভোরের আলো ফোটার আগে অন্য সৈনিকরা জানার আগে মেয়েটিকে তার অভিভাবকদের হাতে পৌঁছে দিব। তাহলে বেচারী বেঁচে যাবে। নতুবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। তুমি কি মেয়েটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা করতে পারবে?'

'কেন পারব না জনাব! একশবার পারব' – ঈগল বলল – 'নারীর ইযযতের হেফাযত ইসলামে বড় ইবাদাত হিসেবে গণ্য। আমাদের ধর্মে নারীর মর্যাদা অনেক বেশি। আপনি এটা উপলব্ধি করতে পারায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে জনাব! আমাকে যে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন এজন্য কী আপনাকে কেন্দ্রের কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে না?'

'আরে ভাই! কেন্দ্র জানলে তো।' ছাউনি প্রধান বললেন।

'বহুত আচ্ছা! এবার তাহলে মেয়েটিকে নিয়ে আসুন।' ঈগল বলল।

ছাউনি প্রধান মোহাম্মদ আল-হোসাইন নিজে গেলেন মেয়েটিকে নিয় আসার জন্য। কিন্তু বেঁকে বসল তরুণী। তার সাফ কথা, রাতের বেলা সে কোথাও যাবে না। ফয়সালা যা হয় সকালবেলা হবে। জেল-ফাঁস যা হয়, সে তা মেনে নিবে অম্লান বদনে।

'শোনো মেয়ে! তুমি আমাকে ভুল বোঝ না' – মোহাম্মদ আল-হোসাইন বললেন – আমি মার্কিন বাহিনীর সৈনিক ঠিক; কিন্তু বেশকিছু দিন হয় আমি তোমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আমি তোমার মুসলিম ভাই এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি তোমার কল্যাণকামী। তোমাকে মুক্তি দিয়ে বাড়ি পৌঁছতে আমি এমন এক লোককে বাছাই করেছি, যার আমানতদারি সম্বন্ধে ইরাকের কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। আমি ইসলাম গ্রহণও করেছি এই ব্যক্তির পরামর্শে। সুতরাং তুমি আর একটুও দেরি করো না।'

'কে সেই ব্যক্তি? তার নামটা জানতে পারি কি?' কিছুটা নরম ভঙ্গিতে মেয়েটি জানতে চাইল।

'আমি অবশ্য তার আসল নাম জানি না' – মোহাম্মদ আল-হোসাইন বললেন – 'কিন্তু সকলে তাকে বাগদাদের ঈগল বলে ডাকে। তুমিও হয়ত তাকে এই নামে চিনে থাকবে।'

আমি তাকে এই নামেও চিনি, আসল নামও তার আমি জানি' – মেয়েটি বলল – 'তার আসল নাম ওমর শুজা। এই ওমর ভাইয়ের সাথে আমি সাড়া পৃথিবী ভ্রমণ করাও নিরাপদ মনে করি। তিনি কোথায়? চলুন তার কাছে।'

ছাউনি কমান্ডার মেয়েটিকে নিয়ে ঈগলের কাছে এল। ঈগল মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। রাত তিনটা চল্লিশ মিনিটের সময় মেয়েটিকে নিয়ে সে মার্কিন সেনাছাউনি ত্যাগ করল। মেয়েটির কাছে তার বাসার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে যখন সে ঠিকানা বলল, ঈগল তাজ্জব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'বহু বজ্জাত মেয়ে তো তুমি!' – ঈগল রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল – 'আমরা কী সব মরে গেছি? কোন সাহসে একা তুমি এই রাতের বেলা অভিযানে বেরিয়েছ? এর অনুমতি তোমাকে কে দিয়েছে?'

ঈগলের ধমক খেয়ে মেয়েটি ভয়ে এমনভাবে চিমটে গেল যে, তার প্রাণপাখিটা দেহপিঞ্জর ছেড়ে পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। অবশেষে মেয়েটি ঈগলের পাদুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। সেই সাথে প্রতিজ্ঞা করল, তার দ্বারা আর কখনো এমন কাজ হবে না।

'এটা তো ভবিষ্যতের কথা' – ঈগল বলল – 'কিন্তু যে কাজটা তুমি করেছ, তা কোন যুক্তিতে করলে? তোমার আব্বা-আম্মা কি এ ব্যাপারে অবগত আছেন?'

'সত্যি বলতে কি, আমি কোনো পরিণামের কথা চিন্তাই করিনি' – জান্নাতুন নাঈমা বলল – 'আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারির ঘটনা আমি বরদাশত করতে পারছিলাম না। এর প্রতিশোধ নিতে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম।'

'সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারিতে আমরাও ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত' – ঈগল বলল – 'প্রতিশোধ নিতে আমিও পিছপা হইনি। আমাদের ওপর তোমার আস্থা রাখা উচিত ছিল। তারপর একান্তই যদি তোমার সরাসরি ময়দানে নামার ইচ্ছা অবদমন করতে না পারতে, তাহলে তুমি রুকাইয়ার সাথে যোগাযোগ করতে। দেখনি তার যোগ্যতা। কিভাবে আমাকে সে মার্কিনিদের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করেছে। তুমি আমার বাগদত্তা, আমার সাথেও তো যোগাযোগ করতে পারতে।'

'সত্যিই আমি দুঃখিত, লজ্জিত এবং আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।' বলেই নাঈমা কাঁদতে লাগল।

ঈগল তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল– 'নাঈমা! সব সময় একটি কথা মনে রাখবে। এই পৃথিবীতে যেকোনো মানুষ তোমার যতই প্রিয় হোক, তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়া যাবে না। স্রষ্টাকে রাগিয়ে সৃষ্টিকে খুশি করার পরিণাম অবধারিত জাহান্নাম। এবার যাও, বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নাও।'

♦ ♦ ♦

সাদ্দাম হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন আজ কয়েক মাস হল। আজ পর্যন্ত ঈগলরা তার অবস্থানের সঠিক তথ্য অবগত হতে পারল না। অবশ্য এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানে কোনোরূপ ত্রটি করা হয়নি। বর্তমান ইরাকি প্রশাসনে যে কজন মুজাহিদ সহানুভূতিশীল ব্যক্তি আছেন – যাদের মধ্যে ইরাকি ও মার্কিনি সেনা-অফিসার, আমলা, সব শ্রেণীর কর্তারাই রয়েছেন – তাদের সকলের কাছেই এ ব্যাপারে তথ্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে সন্তোষজনক কিছু বলতে পারেননি। দু-একজন যদিও ভাসাভাসা কিছু তথ্য দিয়েছেন, বাস্তবে তারা নিজেরাই সেই তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। আর এই অনিশ্চিত তথ্যের ওপর ঈগলরাও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অবশেষে তথ্যানুসন্ধানের পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গেরিলা হামলা চালিয়ে

যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল, যে হামলাগুলো হবে তীব্র থেকে তীব্রতর, যাতে মার্কিনিরা পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়।

ইরাকে প্রতিরোধ যুদ্ধে নিয়োজিত মুজাহিদদের একাধিক গ্রুপ সক্রিয়। কোনো গ্রুপ অঞ্চলভিত্তিক, কোনো গ্রুপ জাতীয় পর্যায়ের, আবার কোনো গ্রুপ শুধু রাজধানী বাগদাদকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তবে যারা যে পর্যায়েই কাজ করুক না কেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একটিই– দেশকে হানাদারমুক্ত করা; স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা। এর সাথে সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারির ইস্যুটি একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অবশ্য মুক্তির এই সৈনিকরা এটাকে অন্যভাবে নিয়েছেন। হানাদারদের কবল থেকে একজন স্বজাতীয় মজলুমকে উদ্ধার করা হল এ ইস্যুর মূল সুর। তিনি যদি ইরাকি জনগণের সাথে কোনো অন্যায় করেও থাকেন, আমেরিকা তার বিচার করার কে? বরং আমেরিকানরা ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে যে অন্যায় করেছে, তার জন্য বুশ-ব্লেয়ার ও তাদের দোসরদের বিচার হওয়া উচিত। লাখ-লাখ ইরাকিকে হত্যার দায়ের একাধিকবার ফাঁসি হওয়া উচিত।

জরুরি ভিত্তিতে আহূত সর্বদলীয় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কাউন্সিলে ঘুরে-ফিরে উক্ত বিষয়গুলোই আলোচিত হচ্ছিল। কেউ-কেউ আবার নতুন হামলার পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এর মধ্যে বাগদাদের ঈগল দুটা হামলার পরিকল্পনা ব্যক্ত করল, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক হিসেবে সকলের মনঃপুত হল এবং মজলিসের কার্যকরী সিদ্ধান্তের তালিকায় স্থান করে নিল। প্রস্তাবদুটো হলো–

১. দখলদার বাহিনীর রসদ সরবরাহকারী যানবাহনকে হামলার সর্বোচ্চ টার্গেট নির্ধারণ করা।

২. মার্কিনিদের সহযোগী অন্যান্য দেশের সৈন্যদের বেশি-বেশি অপহরণ করা।

ঈগল তার প্রস্তাবদুটোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলল, 'আমেরিকা বর্তমানে মারাত্মক অর্থসংকটের আবর্তে নিমজ্জিত। তার অর্থনীতির থলেতে এত বড় ফুটো হয়েছে যে, তাতে জোড়া লাগানোর সাধ্য আমেরিকার নিজের তো নেইই, পৃথিবীর সমস্ত দেশ মিলেও তা পারবে না। কারণ, এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শুধু মার্কিন সরকারি ঋণের পরিমাণ ৭ ট্রিলিয়ন ১৯৩ বিলিয়ন ২৪৬ মিলিয়ন ৫০৮ কোটি ৫৯ ডলার। এর সাথে বেসরকারি ও সরকারি ভর্তুকিঋণ মিলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। ওদের ঋণের এই অংকের বিশালতা বোঝার জন্য এতটুকু ধারণাই যথেষ্ট যে, গোটা পৃথিবীর মোট সম্পদের তুলনায় এই ঋণ তিনগুণেরও বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের আনুমানিক মূল্য ২৫ ট্রিলিয়ন ডলার।'

একটু থেমে ঈগল পুনরায় বলল, 'এই প্রেক্ষিতে মার্কিনিদের আর্থিক ক্ষতির প্রতি আমাদের বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। ওরা আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে চলেছে। এই সুযোগ ওদেরকে আর দেওয়া যাবে না। ওদের রসদবহরে নিয়মিত হামলা করতে হবে। এছাড়া মার্কিনিরা আমাদের ওপর হমলা চালাতে অপরাপর যেসব দেশ থেকে সৈন্য সহায়তা নিচ্ছে, ঐসব দেশকে অবিলম্বে ইরাক ছাড়তে বাধ্য করতে হবে। এ লক্ষ্যে ঐসব দেশের সৈন্যদের অপহরণ করে জিম্মি বানাতে হবে। এককে দেশের সৈন্য জিম্মি করে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের ওপর সৈন্য প্রত্যাহারের চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আশা করি, এতে খুব কাজ হবে।'

♦ ♦ ♦

ইরাকি মুজাহিদদের যুদ্ধ এখন গণপ্রতিরোধের রূপ নিয়েছে। তাদের সাথে সাধারণ জনতার অংশগ্রহণ দিন-দিন বেড়েই চলছে, যদ্দরুন দখলদাররা খুব বেশিমাত্রায় পর্যুদস্ত হচ্ছে। মুজাহিদদের দুর্বার অভিযান-আক্রমণে তাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। অধিকাংশ সৈনিক মনোবল হারিয়ে ফেলেছে, যার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আত্মহত্যার প্রবণতা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, যা ২০০০ সালের শুরুর দিকেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোয় চলে আসে। খোদ পেন্টাগনও এ ব্যাপারে যারপরনাই বিচলিত।

বৃটিশ প্রভাবশালী পত্রিকা গার্ডিয়ান এক রিপোর্টে বলেছে, ইরাক থেকে এ যাবত যে সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাদের সংখ্যা ১৮ হাজার। তন্মধ্যে ৪ হাজার ৬শজন মানসিক রোগে আক্রান্ত। ২ হাজার আক্রান্ত হয়েছে অন্যান্য রোগে। বাদ বাকিরা ইরাকিদের হাতে আহত। এরা সবাই চিকিৎসাধীন রয়েছে। পত্রিকাটি আরো বলেছে, ইরাকে মার্কিন ও তার মিত্র সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে মুজাহদিদের প্রতিরোধ অভিযানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছর (২০০৩ সনে) ১৩ সৈন্য ইরাকে এবং ৭জন ইরাক থেকে দেশে ফিরে আত্মহত্যা করেছে। পত্রিকাটির মতে, ৫২ শতাংশ মার্কিন সৈন্যের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেছে। এদিকে পেন্টাগনের বরাতে বিবিসি জানায়, (ওদের মতে) ইরাকে যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণার পর এ পর্যন্ত ৫৩২ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। তন্মধ্যে আত্মহত্যা করেছে ২২ জন। পেন্টাগন এর জন্য ১২জন মানসিক ডাক্তারও পাঠিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

মার্কিনিরা ভাবছিল, ইরাকের চলমান গেরিলা যুদ্ধের বাগডোর সম্ভবত সাদ্দাম হোসেনের হাতে। তাকে গ্রেফতার করতে পারলেই এই প্রতিরোধ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। সেজন্য খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে, বহু তেল-খড় পুড়িয়ে তারা সাদ্দাম হোসনেকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু সাদ্দামের গ্রেফতারিতে গেরিলা যুদ্ধে কোনোরূপ ভাটা তো পড়েইনি, বরং বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। মুসলমানদের

প্রকৃত লড়াইগুলো যে কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, এটা বুঝতে মার্কিনিরা আবারও ভুল করল। তাই তারা এখন এমন প্রচণ্ড হামলার মুখোমুখি হল, যা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। ৮ এপ্রিল ২০০৪ থেকে ২৪ এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই স্বল্প সময়ে মার্কিনিরা কত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। এই সময়ে প্রায় ৩৫০জন আমেরিকান ও যৌথসেনা এবং ইরাকি পুলিশ নিহত হয়েছে। ১২০০ আহত হয়েছে। ১৪টি হেলিকপ্টার ও ২৬টি ট্যাংক ও ৫টি সাঁজোয়াযান ধ্বংস হয়েছে। ছোট গাড়ি ধ্বংস হয়েছে ১৫০টি। বন্দি হয়েছে ১২৫ জন আমেরিকান সৈন্য। ইরাকের ৭টি শহরে মুজাহিদরা ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাকুবায় মুজাহিদরা হালকা অস্ত্র দিয়ে oh-58 হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, ফালুজায় তারা একাধিক ট্যাংক জ্বলতে দেখেছে। বাগদাদের দক্ষিণে শত্রুসেনাদের উপর এক মর্টার আক্রমণে ৫জন আগ্রাসী সেনা নিহত হয়েছে। ফালুজায় মুজাহিদদের অপর এক আক্রমণে আমেরিকান চারটি জঙ্গি হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়েছে। এতে নিহত হয়েছে ত্রিশজন আমেরিকান সৈন্য। আল আম্বার শহরে এক ভয়াবহ আক্রমণে ৪০জন আমেরিকান সেনা নিহত হয়েছে। এমারায় মুজাহিদদের রকেট হামলায় তিনটি বৃটিশ জিপ ধ্বংস ও ৮ সেনা নিহত হয়েছে। বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে মুজাহিদদের এক আক্রমণে ৬ আমেরিকান নিহত হয়েছে। আলকুতে প্রতিবাদী ইরাকিদের গুলিতে এক ইউক্রেনীয় সেনা নিহত হয়েছে। বাকুবায় আমেরিকান সেনাদের জন্য কর্মরত এক ইরাকি অনুবাদক মুজাহিদদের গুলিতে নিহত হয়েছে।

এ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছিল ইরাকে নিয়োজিত মার্কিন চিফ অব কমান্ড জেনারেল জনকে নিয়ে। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে মুজাহিদরা তার অবস্থানের উপর রকেট হামলা চালায়। হামলা এত ভয়াবহ ছিল যে, মার্কিন সেনারা বেদিশা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করে। আর চিফ কমান্ডার জেনারেল জন জীবন বাঁচাতে একটি পরিত্যক্ত টয়লেটে আত্মরক্ষা করে।

মাত্র ১৫-১৬ দিনের উপরোক্ত পরিসংখ্যানমূলক সংবাদভাষ্য থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, ইরাকের ভূমিতে দখলদার বাহিনী কতটা অসহায় ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। তাদের কমান্ডারের নিরাপত্তাও আজ ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। তাদের জন্য আরও দুঃসংবাদ হয়ে দেখা দিয়েছে মুজাহিদদের নতুন রণকৌশল। বাগদাদের ঈগলের নির্দেশিত কৌশলদুটো মুজাহিদরা ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করতে শুরু করায় আগ্রাসী সেনাদের রসদ সামগ্রী পরিবহন যেমন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তেমনি দু-তিনটি দেশের সৈন্য অপহৃত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোও বেশ বেকায়দায় পড়েছে।

একটি আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিকী খবর দিয়েছে, মার্কিন ও জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে ইরাকি মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবর্তিত রণকৌশল দখলদাদের রসদ সামগ্রী পরিবহন কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছে। রসদ সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্য, তেল সরবরাহ মাসিক ব্যয় ২ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ইরাকি গেরিলারা মার্কিন জোট বাহিনীকে খাদ্য ও তেল সরবরাহকারী বহরে হামলা এবং এসব বিদেশি কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তাদের অপহরণকৌশল খুবই কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। গেরিলারা এ পর্যন্ত ১৯ জনকে অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। অপহৃদদের মধ্যে আমেরিকান ৯ জন এবং ভারত, জর্ডান, কেনিয়া, পাকিস্তান, বুলগেরিয়া, কানাডা, মিশর, সোমালিয়া, সিরিয়া ও তুরস্কের একজন করে নাগরিক রয়েছে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের কোম্পানিগুলোও অসুবিধায় পড়েছে। কারণ, তাদের কর্মকর্তাদের জন্য মোটা অংকের সিকিউরিটি এলাউন্স দিতে হচ্ছে। যদ্দরুন এসব কোম্পানির কোটি-কোটি ডলার মার্কিন বাহিনীর কাছে আটকে গেছে। কোম্পানিগুলো এখন মার্কিন বাহিনীর সাথে চুক্তি বাতিল করে দিচ্ছে। ফলে মার্কিন বাহিনীর সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। যে ক্ষেত্রে ১০০ দিনার দিতে হত, সে ক্ষেত্রে ১০০০ দিনার থেকে ২০০০ দিনার খরচ করতে হচ্ছে।

এদিকে ইরাকি মুক্তিযোদ্ধারা মার্কিনিদের সহযোগী দেশসমূহের যে কটি দেশের সৈন্য অপহরণ করে জিম্মি করেছে, সেসব দেশের সরকার প্রধানদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, জুলাই মাসের মধ্যে ইরাকে প্রেরিত সৈন্যদের সিংহভাগ তারা ফিরিয়ে নেবেন। পর্যায়ক্রমে বাকিদেরও ফিরিয়ে নেবেন। ইউক্রেন, স্পেনিশ সরকারও সৈন্য প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সামরিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মুজাহিদদের এই নবকৌশল দখলদারদের জীবনবাজির চেয়ে ক্ষতিকর প্রমাণিত হচ্ছে।

◆ ◆ ◆

ইরাকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আজ দখলদারদের হাতে বন্দি। সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করে দখলদাররা বেশ কিছু দিন লুকিয়ে রাখে। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে তাকে নিয়ে ওরা নতুন খেলায় মেতে উঠে। তার বিচারের জন্য গঠন করে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনালের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যদিও তাবেদার ইরাকি সরকারের নাম জোরেশোরে প্রচার করা হয়, কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এর সামগ্রিক ব্যয় আমেরিকাই জোগান দেয়। তাছাড়া ট্রাইব্যুনালের সব কজন বিচারক নিয়ে দেওয়া হয় শিয়া ও কুর্দি জাতির লোক, যারা সর্বদা সাদ্দামকে শত্রু জ্ঞান করে। উপরন্তু এরা তেমন দক্ষ বিচারকও নন। এদের কোনো প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। এমন একটি স্পর্শকাতর বিচারের জন্য বিচারকদের যেমন অভজ্ঞতা থাকা দরকার, এই বিচারকদের তার কিছুই নেই। আইন বিশারদরা মনে করছেন, সাবেক এই ইরাকি নেতা ঐ নাট্যমঞ্চতুল্য

আদালতে ন্যায়বিচার তো পাবেনই না, বরং যা পাবেন তাহল বিচারের নামে প্রহসন। একথা হলফ করেই বলা যায়, এই আদালতের পুরো বিচার প্রক্রিয়াটি হবে নজিরবিহীন, অস্বচ্ছ, পক্ষপাতদুষ্ট, অনিয়মতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গোটা বিশ্ববাসীকে এখন থেকেই ওরকম একটি প্রহসনিক বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আট.

যুদ্ধ একটি ঝড়ের মতো মানুষের সাজানো-গোছানো স্বপ্নকে এলোমেলো করে দেয়। জীবনের মৌলিক অধিকারগুলোকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে থাকে। সভ্য সমাজ তাই অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধকে প্রবলভাবে ঘৃণা করে। ইরাকের ভূখণ্ডে মার্কিনিরা যে যুদ্ধ বাঁধিয়েছে, তা একটা অনৈতিক যুদ্ধ। বিশ্বের সভ্য কোনো মানুষ এ যুদ্ধকে সমর্থন তো করেইনি, বরং যুদ্ধবাজ মার্কিনিদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে তীব্রভাবে। এই যুদ্ধ ইরাকি গণমানুষের জন্য এমন গজব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যে, ইরাকিরা প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর প্রহর গুণে কাটাচ্ছে। অনিশ্চয়তার সায়রে ভেসে যাচ্ছে তাদের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো। রুকাইয়াদের জীবনের সাধ-আহ্লাদগুলো থেকে যাচ্ছে সদা অপূরণীয়।

২০০৪ সালের মে মাসের মাঝামাঝি কোনো এক সন্ধ্যায় রুকাইয়া তার বাসস্থানের খাটিয়ার উপর বসে চা পান করছিল। বাড়িতে আজ সে একা। তার আব্বাজান মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব বড় একটি অপারেশনে গেছেন। আজ রাতে তার বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রুকাইয়া বাড়িতে একা খুব কমই থেকেছে। মাহমুদা ও সালমার বিবাহ হওয়ার পর তার সর্বক্ষণের সাথী হিসেবে নবমুসলিমা মারিয়াম ও জুলাইখা থেকেছে। কিন্তু আজ তারাও জরুরি এক কাজে বাগদাদের বাইরে থাকায় তাকে বাধ্য হয়েই একাকি রাত যাপন করতে হবে। একা থাকার বিষয়টি তাকে কেমন বিষণ্ন করে তুলল। চা পান শেষে কাপটা খাটের পাশের টি-টেবিলে রেখে কী এক চিন্তায় ডুবে গেল সে।

যে সকল মানুষের জীবনে বড় কোনো দুর্ঘটনার স্মৃতি বিরাজমান থাকে, তাদের একা থাকা ভীষণ পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। একাকিত্ব তাদের স্মৃতির জানালার কপাটকে উন্মুক্ত করে দেয়। এর দ্বারা পিছনের সেই দুঃসহ ঘটনাবলি তার সম্মুখে দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উক্ত দৃশ্য তার বিবেকের ওপর আবেগের একটা মোটা আবরণ ফেলে দেয়। ফলে সে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। রুকাইয়ার অবস্থা আজ হুবহু ওই রকম। একাকিত্ব তার স্মৃতির জানালাকে এমনভবে খুলে দিয়েছে যে, সেখানে প্রবেশ করে তার দিশা হারানোর মত অবস্থা। সে দেখছে, তার মাহারানো সময়কার দৃশ্য। দেখছে ২০শে মার্চের কালো রাতে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তার দেশের ওপর মার্কিনি হানাদারদের

ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্মম চিত্র। তার মধুর বাসরে বর্বর মার্কিনিদের সেই লোমহর্ষক মিসাইল হামলার ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাকে ব্যাকুল করে তুলল।

রুকাইয়ার সম্মুখে সহসা তার স্বামীর স্মৃতি জাগরূক হওয়ায় হৃদয়ের মাঝে ছাই চাপা দেওয়া আগ্নেয়গিরিটি মুহূর্তেই লাভা উদগীরণ করতে শুরু করল, যার জন্য সে নিজেও প্রস্তুত ছিল না। বরং এই আগ্নেয়গিরিকে চাপা দিয়ে রাখতে সে সর্বদা বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকত। তার মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় করত দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কাজে। কিন্তু সম্প্রতি সালমা, মাহমুদাসহ বেশ কজন মুজাহিদা বোনের বিবাহ উপলক্ষ্যে রুকাইয়ার পুরো বাহিনী কয়েক দিনের ছুটি উপভোগ করছে। এজন্য রুকাইয়া নিজেও বাধ্য হয়ে অবসর সময় কাটাচ্ছে।

রুকাইয়া অবসরে অলস সময় কাটানোর মেয়ে নয়। এ সময়ে সে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্রিটিশ তরুণী মারিয়াম ও জুলায়খাকে (সাবেক নাম মারিয়া ও জুলিয়া) নিয়ে একটি সেবামূলক সংস্থা গড়ে তুলল, যা যুদ্ধোত্তর ইরাকে অসহায় মুসলমানদের পুনর্বাসন ও দ্বীন-ঈমান হেফাযতে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা দিয়ে যাবে। পাশাপাশি যে সকল মুসলমান ইতিপূর্বে খৃষ্টানদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে।

নবগঠিত এই সংস্থার উদ্যোক্তা জুলাইখা ও মারিয়াম। বাস্তবায়নকারী রুকাইয়া। আর সঞ্চালক বা পরিচালকের দায়িত্বে আছেন নওমুসলিম সোলায়মান ওরফে ফাদার সান্দ্রা কেভিনিন। ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি রুকাইয়াদের হাতে বন্দি ছিলেন। বন্দিত্বকালীন সময়ে তিনি রুকাইয়াদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে একপর্যায়ে ইসলামের পবিত্র ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার ও জুলাইখাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, তারা ইতিপূর্বে ইসলামের যে ক্ষতি করেছে, বাকি জীবন ইসলামের খেদমত করে তা পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। সেই লক্ষ্যে তারা দিন-রাত অবিরাম গতিতে কাজ করে চলছেন। অবসরের সময়টুকু রুকাইয়াও তাদের সাথে কাজ করছিল। আজ তারা এক বিশেষ প্রয়োজনে বসরা গমন করেছেন বিধায় রুকাইয়া একা হয়ে বসেছে।

রুকাইয়া খুব করে চেষ্টা করছে স্বামীর স্মৃতি ভুলে থাকতে। কিন্তু যতই চেষ্টা করছে সফল হচ্ছে না। এত দিন তো ঠিকই ভুলে থাকতে পেরেছিল। আজ কী হল? মনটা কোনো বাধা-ই যে মানছে না। মনকে যতই আজ শাসন করছে, সে ততই যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। আসলে মনকে এত দোষ দিয়ে লাভ কী? তার নিজেরই যে আজ খুব ইচ্ছা করছে প্রাণপ্রিয়কে বুকে জড়িয়ে একটু আদর করতে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি সব ইচ্ছা পূরণ হয়? বিশেষ করে মানবাকৃতির পশু মার্কিনিদের দখলীকৃত এই দেশে। এই নরপশুদের নখরাঘাতে রুকাইয়ার মতো আরো কত রুকাইয়ার স্বপ্নসাধ যে ক্ষতবিক্ষত, তার হিসাব কে রেখেছে।

রুকাইয়া মনকে কোনো প্রকারেই নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অবশেষে যুদ্ধের পোশাক পরে, অস্ত্র-গোলাবারুদ সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটা কালো রঙের জীপ নিল সাথে। তার আজকের বেরুনো আর অন্যান্য দিনের মধ্যে বেশ ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যান্য দিন নির্দিষ্ট হামলার ছক নিয়ে দ্রুত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে অভিযান শেষে আবার যথাসময়ে গন্তব্যে ফিরে আসত। কিন্তু আজ সে উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে লাগল। তার না আছে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য, না আছে গন্তব্যে ফেরার তাড়া। গাড়িটা নিয়ে এখন সে কোথায় যাচ্ছে, তাও তার অজানা।

♦ ♦ ♦

সালমান ইরাক যাওয়ার পথে দুদিনের জন্য যে সিরিয়ায় যাত্রাবিরতি দিয়েছিল, তা ছিল তার ইচ্ছার পরীপন্থী সিদ্ধান্ত। মূলত বন্ধু হাসনাইনের আবদার রক্ষার্থেই এ সিদ্ধান্ত নিতে সে বাধ্য হয়। কিন্তু সে ঐতিহাসিক এই দেশটিতে প্রথম দিনের সফরেই যে সকল বিষয়াবলি অবলোকন করল, তাতে বন্ধুর প্রতি সে অতিশয় কৃতজ্ঞ। পুরোটা দিন ও রাতের কিছু অংশ ভ্রমণে কাটিয়ে সে দারুণ এক পুলক অনুভব করল। হোটেলে ফিরে যখন সে দিনের ডায়রি লিখতে বসল, তখন উপলব্ধি করল, সিরিয়ায় এই কয়েক ঘণ্টার সফর তার অভিজ্ঞতার থলেতে অনেক নতুন প্রাপ্তি সংযোজন করেছে। স্বচক্ষে সে এমনসব বিষয় প্রত্যক্ষ করেছে, ইতিপূর্বে যা কেবল বই-কিতাবে অধ্যায়ন করেছিল। সেজন্য মনে-মনে সে বন্ধুকে সাধুবাদ দিতে লাগল। আগামী দিনের সফরও যেন আজকের মতো ফলপ্রসূ হয় এ মুহূর্তে সেটাই তার কামনা। সর্বনিয়ন্তার কাছে এই দরখাস্তই সে পেশ করে রাখল।

'বন্ধু' আর 'বন্ধুত্ব' জীবনের একটি গুরুত্বূর্ণ অনুষঙ্গ। একজন মানুষের জীবন ধারণের জন্য অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান যেমন জরুরি, তেমনি ভালো বন্ধুও তার জন্য একান্ত আবশ্যক। তবে বন্ধু হতে হবে বন্ধুর মতো। সে হবে একান্ত গোপনীয়তার, সুখ ও দুঃখের ভাগীদার। সেই সময়ে নিজের ভাই পর্যন্ত একজন বন্ধুর কাজ করতে পারবে না। কারণ, কেউই চায় না, তার কোনো আত্মীয় তার কোনো গোপন বিষয় জানুক। সেজন্যই বলা হয়, একজন বন্ধু ছাড়া এই পৃথিবী মরুভূমি, নিরানন্দ ও হাহাকারে পূর্ণ।

অবশ্য এ কথাও চিরন্তন সত্য যে, কেবল গোপন কথা জানে বলেই একজন বন্ধু হতে পারে না। এটা বন্ধত্বের মানদণ্ডও হতে পারে না। যেমন– শেখ সাদী বলেন, 'একজন বন্ধু তা সে যত প্রিয়ই হোক-না কেন, তাকে তোমার গোপন কথা বলা যাবে না। কারণ, হয়তবা তোমার সাথে ঝগড়ার সময় তোমার গোপন কথা ফাঁস করে তোমাকে লাঞ্ছিত করে দেবে।' বরং বন্ধু সে-ই হবে, যে জীবনের প্রতিটি বাঁকে থাকবে অটল ও অবিচল। তাই যদি কেউ নিজে একজন

সত্যিকার আন্তরিক বন্ধু হিসেবে একজনের সামনে দাঁড়াতে পারে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সেও এমন একজন বন্ধু পাবে, যে তার প্রতি হবে অবিচলিত।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহ.) বন্ধুত্ব করার জন্য পাঁচটি গুণ নির্দেশ করেছেন।

১. বুদ্ধিমত্তা যার মধ্যে বুদ্ধিজ্ঞানের অভাব রয়েছে, তার সাথে বন্ধুত্ব করা অনুচিত। কথায় বলে– বোকা বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রুও উত্তম।

২. সদ্ব্যবহার যার ব্যবহার সুন্দর নয়, তার সাথে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়। চাই সে যত উচ্চ বংশ আর চেহারা-সুরতওয়ালাই হোক-না কেন।

৩. পাপাচারী না হওয়া পাপ কাজ মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের অনুসারী বা বন্ধুতে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তির সাথে কোনো অবস্থাতেই বন্ধুত্ব করা সমীচীন নয়।

৪. বিদআতী না হওয়া আল্লাহর রাসূর (সা.) সকল প্রকার বিদআতকে গোমরাহী আখ্যা দিয়েছেন। সেই সাথে সকল গোমরাহীর পরিণাম যে জাহান্নাম, সেই সতর্কবাণীও হাদীসে স্পষ্ট। সুতরাং বিদআতকারীর সাথে বন্ধুত্ব করা মানে নিজেকে পথভ্রষ্টদের দলে ঠেলে দেওয়া।

৫. দুনিয়াপ্রেমী না হওয়া সমস্ত প্রকার গুনাহ ও নাফরমানির মূল উৎস হল দুনিয়ার আসক্তি। তাই দুনিয়ার মহব্বতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব কাম্য নয়।

বন্ধুত্বের উপরোক্ত মানদণ্ডে পরিপূর্ণরূপে উত্তীর্ণ সালমানের বন্ধু হাসনাইন। সে যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সদ্ব্যবহারে তার জুড়ি মেলা ভার। এর প্রমাণ হল, একবার যে তার হোটেলে উঠেছে, সে অন্য হোটেলে খুব কমই গেছে। নেককার হিসেবে সে অনন্য। বিদআতে তার আজন্ম ঘৃণা। দুনিয়া আসক্তি নেই মোটেই। পাঠক হয়ত ভাবছেন, আমার শেষের দাবিটি পুরোপুরি সঠিক নয়। তার যদি দুনিয়া আসক্তি না-ই থাকবে, তাহলে বিদেশে কেন চাকরি করতে আসা? এর উত্তর সহজ। সে বিদেশে এসেছে মূলত তার ভ্রমণনেশাকে চরিতার্থ করার জন্য। আর তাকে এ নেশা ধরিয়ছেন পবিত্র কুরআনের ঐ নির্দেশনা, যেখানে আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য সম্প্রদায়সমূহের পরিণতি অবলোকন করতে মুমিনদের উৎসাহিত দিয়েছেন। চাকরির সুবাদে সিরিয়া অবস্থান করে ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের পায় আধা ডজন দেশ সে ভ্রমণ করেছে। এখানকার অন্যান্য দেশসহ সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করা তার পরিকল্পনার অংশ। এর জন্য সে তার উপার্জিত সমুদয় অর্থ বিলিয়ে দিতেও তৈরী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা নেক লোকদের জন্য নেককার বন্ধুই নির্বাচন করে থাকেন।

সালমান তার এই নেককার বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিরিয়ায় দুটা দিন কাটিয়ে দিল। প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনটিও তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে

ব্যাপক সমৃদ্ধ করে তুলল। দ্বিতীয় দিনের সফরে সে এমন কতিপয় মহা-মানবের কবর জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করল, যারা ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব। যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রখ্যাত সাহাবী ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন হযরত বেলাল হাবশি (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.), প্রখ্যাত অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.), হযরত আবু ছা'লাবা আল খুশানী (রা.), হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রা.) প্রমুখ। এদের মধ্যে শেষোক্তজন হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়া মুজিযায়ে ইবরাহীম (আ.)কে টেনে এনেছিলেন। অর্থাৎ– আল্লাহপাক হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যেমন নমরুদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে নিরাপদে বের করে এনেছিলেন, ঠিক তেমনি আবু মুসলিম খাওলানী (রা.)কে তৎকালীন ভণ্ড নবী আসওয়াদে আনাসীর ভয়ংকর অগ্নিকুণ্ড থেকে সহীহ-সালামতে বের করে আনেন। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত এ সকল মহামানবের বিদেহী আত্মার সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে দরুদ ও সালাম পেশ করে সালমান আপন হৃদয়ে পুলক অনুভব করতে লাগল। এখন তার ইচ্ছা হলো সিরিয়ায় আরও কটা দিন থেকে যাবে। কিন্তু ইরাকে দ্রুত পৌঁছার স্বার্থে সে তার এই ইচ্ছাকে অবদমন করে রাখতে বাধ্য হল।

তৃতীয় দিন দুপুরের পর সালমান ইরাক যাওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বন্ধু হাসনাইনও তার সাথে চলল। সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। বন্ধু চলে যাওয়ায় তার কেমন একাকিত্ব অনুভূত হল। অবশ্য এই শূন্যতা পূরণ করল বন্ধুর দেওয়া উপহার। বিদায়বেলা বন্ধু তাকে একটি স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন হাদিয়া দিয়ে গেল। অতি প্রয়োজনীয় এই ফোনটি পেয়ে সালমান যারপরনাই খুশি হল। ফোনটি হাতে নিয়ে অপশনগুলো দেখতে লাগল। অন্যান্য ফোনের চেয়ে এ ফোনটিতে বেশ কয়েকটি অতিরিক্ত ফাংশনের দেখা মিলল। এর মধ্যে থ্রিজি প্রযুক্তি ও স্যাটেলাইট সংযোগই হল ফোনটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক।

♦ ♦ ♦

সালমান কোনো বাধা ছাড়াই সীমান্তটা পার হল। ইমিগ্রেশনেও তেমন কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি। এবার তার একটি বাহন প্রয়োজন হল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে একটি ট্যাক্সি ক্যাবের দেখা পেল। গাড়ির চালককে ভাড়া জিজ্ঞেস করল। সরাসরি বাগদাদ যেতে ড্রাইভার ভাড়া চাইল মূল ভাড়ার প্রায় তিন গুণ। এ ব্যাপারে সালমানের যদিও সঠিক ধারণা নেই, তথাপি ভাড়ার আধিক্য বোঝাতে কষ্ট হল না। সামান্য দরকষাকষির পর মোটামুটি দ্বিগুণ ভাড়ায় সে গাড়িটা ঠিক করল। গাড়ি তাকে নিয়ে আনুমানিক দশ মিনিট চলার পর দেখা দিল বিপত্তি। হঠাৎ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভার নেমে ইঞ্জিন

কাবার খুলে চেক করতে গেল। সহসা একটি মার্কিন টহলযান তাদের গাড়ির পার্শ্বে এসে থামল। উক্ত গাড়ি থেকে একজন সৈনিক এসে সালমানের পরিচয় জানতে চাইল। সালমান তার কাগজপত্র দেখাল। কিন্তু তাতে মার্কিন সৈনিক সন্তুষ্ট হল না। সে বিশেষ একটি সাউন্ড করল। তৎক্ষণাৎ আরো দুজন সৈনিক গাড়ি থেকে নেমে এল। তারা সালমানের দেহ তল্লাশি করল। কিন্তু সাংবাদিকতার কাগজপত্র ছাড়া আর কোনো কিছু না পাওয়ায় তাকে ছেড়ে দিল। তবে সাংবাদিকতার কলম তাদের পক্ষে চালানোর পরামর্শ দিয়ে গেল।

মার্কিন সৈনিকরা চলে যাবার সময় সালমানের গাড়ির চালককে বলল, তার গাড়ির ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হয়নি। এখন স্টার্ট দিলেই ইঞ্জিন চালু হবে। ড্রাইভার তাদের কথামতোই কাজ করল। ইঞ্জিনও চালু হল। সালমান ও ড্রাইভার দুজনেই অবাক হল। অবশ্য অবাক হওয়ারই কথা। কেননা, গাড়ির ইঞ্জিনে সমস্যা আছে কি নেই, সেটা মার্কিন সৈনিকদের জানার কথা নয়। তথাপি তারা বলে দিল, যেন তারা জাদুকর। আর হ্যাঁ, মার্কিনিরা এখানে একটি জাদুকরী প্রযুক্তিই ব্যবহার করেছিল, যে সম্বন্ধে সালমানদের ধারণা ছিল না। সেটা হল, কোনো গাড়িকে যদি তাদের তল্লাশি করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেই গাড়ির অন্তত ১ হাজার গজের মধ্যে থেকে বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি একটি রিমোর্ট চাপলেই টার্গেটকৃত গাড়ির ইঞ্জিন সাময়িক সময়ের জন্য বিকল হয়ে যাবে। তারপর তাদের কাজ শেষ হলে পুনরায় উক্ত রিমোর্ট চাপলেই বিকল ইঞ্জিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। এটা অবাক করার মতো বিষয়ই বটে। তবে এর চেয়েও বিস্ময়কর বস্তুর দেখা আমেরিকা ইরাকে পেয়েছে, যার কথা সে মুখ ফুটিয়ে বলতেও পারছে না।

কী সেই বস্তু, যা ইরাকে আছে, আমেরিকার আধুনিক প্রযুক্তিওয়ালারাও যা দেখে বিস্মিত হচ্ছে। হ্যাঁ, ইরাকের বিস্ময় হল, বাগদাদের ঈগলরা অর্থাৎ ইরাকের মুক্তিসেনারা আমেরিকার জন্য এমন যমদূত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, তাদের মোকাবেলায় দখলদাররা এসব উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করেও কোনো কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। সম্প্রতি তারা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইরাকে অধিক পরিমাণে সৈন্য হারানো থেকে বাঁচার জন্য রোবট যোদ্ধা পাঠাবে। প্রাথমিকভাবে তারা ১৮টি বোরট ইরাকের এই স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের পরিদর্শনে পাঠাবে। প্রতিটি রোবটে চারটা করে ক্যামেরা সেট করা থাকবে, যেগুলো দূরনিয়ন্ত্রিত। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'সোর্ড'। এর সাথে অটোমেটিক রাইফেলও থাকবে, যা সময়মতো শত্রুর মোকাবেলা করে যাবে। অবশ্য এটি এই প্রথম সরাসরি কোনো যুদ্ধে প্রেরণ করা হচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমেরিকার নীতি-নির্ধারকরা এই ভেবে হয়রান যে, এ সকল অত্যাধুনিক আবিষ্কার যদি ইরাকিদের হাতে পড়ে আর তারা যদি এগুলো ব্যবহার করে,

তবে এর প্রতিকার তারা কী করে করবে। অর্থাৎ– সেই পুরনো কথা, কুইনিন তো জ্বর সারাবে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে?

আসরের নামাযের সময় সালমান বাগদাদে পৌঁছল। গাড়ি থেকে নেমে সে কোনো মসজিদের খোঁজ করল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর মসজিদ একটি পেল; কিন্তু মার্কিনিদের ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটি। ওযুর জন্য সেখানে কোনো পানির সন্ধান পেল না। বাধ্য হয়ে তায়াম্মুম করে ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে নামাযটা পড়ে নিল। নামায শেষে সে মসজিদের ধ্বংসযজ্ঞের বেশ কয়েকটি চিত্র মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ধারণ করল। তারপর সেখান থেকে বের হয়ে এল।

মসজিদ এলাকা থেকে বেরিয়ে সালমান একটি হোটেলে ঢুকল। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। সারাদিনে কেবল সকালের নাস্তাটাই করা হয়েছিল। তাও সেই সিরিয়া বসে। তাই সে পেটভরে খেয়ে নিল। ভাবল, রাতে আর না খেলেও চলবে। হোটেল থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন বের হল, তখন সন্ধ্যা হতে মাত্র ত্রিশ মিনিট বাকি। বহুদিন পর বাগদাদ শরহটাকে দিনের আলোতে আর একটু দেখতে সে পায়ে হেঁটে চলল। সে দেখল, রাস্তায় এই বিকাল বেলাতেই যানবাহন চলাচল সীমিত হয়ে এসেছে। যাও চলছে তার মধ্যে গণপরিবহনের চেয়ে মার্কিনিদের গাড়িই বেশি চোখে পড়ছে। বেশিরভাগ তেলবাহী ট্যাঙ্ক লরি; সেই সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে সেনাভর্তি টহলযানগুলো। খানিক পরেই দেখল, বিপদ সংকেত বাজিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের বেশ কটি গাড়ি গ্রিন জোনের দিকে যাচ্ছে। সে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে সেদিকে ছুটল। কিছুদূর গিয়েই দেখল, আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ ছুঁই-ছুঁই করছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, স্বাধীনতাকামী মুজাহিদরা গ্রিনজোনে রকেট হামলা করেছিল। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গ্রিনজোনের পার্শ্বে দাঁড়ানো তিনটি জ্বালানি বোঝাই গাড়িতে আঘাত হানে এবং আগুন ধরে যায়। আগুনের এই শিখা উক্ত গাড়ির।

সালমান গ্রিনজোনসমতে উক্ত অগ্নিকুণ্ডলির বেশকিছু ছবি ক্যামেরায় ধারণ করল। দেখতে ভালোই লাগছে। এ যেন মার্কিনিদের দাম্ভিকতার ভস্মরূপ। কেননা, এই গ্রিনজোন হচ্ছে বাগদাদে তাদের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। এখানকার অবস্থাই যখন এই, তখন সারা দেশের অবস্থা কেমন তা সহজেই অনুমেয়। এ স্থানে বেশিক্ষণ থাকা সমীচীন নয় বিধায় সে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করল। কিছুদূর অগ্রসব হতেই মাগরিবের নামাযের আযান শোনা গেল। নামায পড়ার জন্য সে একটি মসজিদে প্রবেশ করল। নামায শেষে মসজিদের বারান্দায় বসে সে ভাবতে লাগল, রাতে কোথায় থাকবে, কোন হোটেলে উঠবে, নাকি রুকাইয়াদের তালাশে তাদের এলাকায় যাবে। আবার ভাবে, রাতের বেলা তাদের খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। তদুপরি যদি তাদের দজলা তীরের বাড়িতেও মার্কিনিরা হামলা চালিয়ে থাকে, তবে রাতের বেলায় সেখানে গিয়ে বিপদেই পড়তে হবে।

সালমান মসজিদের বারান্দায় বসে যখন এসব সাত-পাঁচ ভাবছিল, তখন মসজিদে অন্য কোনো লোক ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে একজন লোক সেখানে এল। তাকে ফ্লোরে দেখে লোকটি ক্ষেপে গেল। সে টান দিয়ে তাকে মসজিদের ভিতরে এনে গেটে তালা লাগিয়ে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সালমান হতবিহ্বল হয়ে গেল।

'জনাব! ভয় পাবেন না' – আগন্তুক লোকটি বলল – 'আমি এই মসজিদের ইমাম। নামাযের পর বের হওয়ার সময় আপনাকে এখানে বসা দেখেছিলাম। এখনও এখানে বসে আছেন কোন সাহসে? আপনি কি সান্ধ্য আইনের কথা ভুলে গেছেন!'

'সান্ধ্য আইন কী হযরত?' – সালমান জানতে চাইল – 'মসজিদে বসাটা কি অপরাধ?'

'আচ্ছা, আপনি কি ইরাকের বাসিন্দা? সেটা আগে বলুন।' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ইমাম সাহেব।

'হযরত! আমি একজন ভিনদেশি মুসাফির' – সালমান বলল – 'আমার নিবাস পাকিস্তান। পেশায় সাংবাদিক।'

সালমানের উত্তর শুনে ইমাম সাহেব তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কাঁদলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, 'জনাব! আমি না বুঝেই আপনার উপর রাগ হয়েছিলাম। মাফ করে দিবেন। আপনি জানেন না, দখলদাররা আইন করেছে সন্ধ্যার মধ্যে সকল নাগরিককে গৃহে ফিরতে হবে। রাতের বেলা মসজিদগুলোতে কেউ অবস্থান করতে পারবে না। এই মসজিদটি যেহেতু রাস্তার পাশে আর আপনি এর বারান্দায় বসেছিলেন; দখলদারদের কোনো টহলযান এদিক দিয়ে গেলে নির্ঘাত আপনি গ্রেফতার হতেন। সেজন্যই আপনাকে দ্রুত টেনে ভিতরে নিয়ে এসেছি। তা আপনি ইরাকে এসেছেন কখন? যাবেন কোথায়?' আবেগের আতিশয্যে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন ইমাম সাহেব।

'হযরত! আপনার কোনো কসুর হয়নি' – সালমান বলল – 'আপনি মুরুব্বি হয়ে ক্ষমা চেয়ে আমাকে অপরাধীর কাতারে ফেলবেন না। আপনি তো নিজের কর্তব্য পালন করেছেন। এজন্য আমি বরং আপনার প্রতি অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আর আপনি জানতে চেয়েছেন, আমি ইরাকে কখন এসেছি? কোথায় থাকব? আমি আজ দুপুরে সীমান্ত পেরিয়েছি। বাগদাদে এসেছি ঘণ্টাতিনেক হবে হয়ত। রাতটা কোনো হোটেলে কাটাব। আল্লাহ চাহেন তো আগামীকাল এক পরিচিতের কাছে যাব।'

'জনাব! কালকে আপনি যেথায় যাবার যাবেন আমি বাধা দেব না' – ইমাম সাহেব বললেন – 'কিন্তু এই রাতের বেলা আপনি কিছুতেই হোটেলে যাওয়ার কোশেশ করবেন না। দয়া করে রাতটা আমার গরিবালয়ে কাটিয়ে যান। একজন বিদেশি মুসলিম ভাইয়ের সামান্য খেদমত করার সুযোগ দিন।'

'হযরত! আপনি যখন চাচ্ছেন, আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করে নিলাম।' সালমান বলল।

'শুকরিয়া জনাব! বহুত শুকরিয়া! আমাদের এই দুর্ভাগ্যের সময় আপনার মতো একজন বিদেশি মেহমানের খেদমত করতে পারব বলে আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জানাচ্ছি।' ইমাম বললেন। তার কণ্ঠ ধরে এল।

'হযরত! আপনি মন খারাপ করবেন না' – সালমান বলল – 'আপনাদের এই দুর্ভাগ্য প্রকৃতপক্ষে গোটা উম্মাহর দুর্ভাগ্য। তবে মনে রাখতে হবে, দুর্ভাগ্যের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে সৌভাগ্যের রাজটিকা। যেমন মেঘের আড়ালে হাসে সূর্য। আর সেজন্য উদ্ভুত পরিস্থিতিকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে।'

◆◆◆

রুকাইয়া সন্ধ্যার অল্প পরেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে অনেকক্ষণ যাবত ঘুরল। কিছুতেই সে মনে শান্তি পাচ্ছে না। অভিযানের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা না থাকায় এবং সঙ্গে অন্য সাথী না থাকায় কোথাও হামলার ঝুঁকি নিল না। আজ কেন যেন কোনো ঝামেলায় জড়াতে মনে সায় দিচ্ছে না। প্রিয়তমর জন্য মনটা শুধুই আকুপাকু করছে। মনের জানালায় বারবার কেবল প্রিয় মানুষটির মুখচ্ছবিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। কল্পনার স্রোতে ভেসে ছুটে যাচ্ছেন মনের মানুষের সান্নিধ্যে। কখনো আবার তার সাথে অভিমান করছে। আবার কখনো আদার-সোহাগে ভরে দিচ্ছে তার বুক। মনের এমন উদাসী গতিময়তা তাকে এ মুহূর্তে সকল কাজ থেকে বিরত থাকার তাগিদ দিচ্ছে। এমনকি এই গাড়িচালনাও। তাহলে এখন কী করবে সে, কী তার করা উচিত। কে দেবে এর পরমার্শ। অবশেষে উপায় একটা বের হল। সালমা অথবা মাহমুদার কাছে যাওয়া। যেই ভাবা সেই কাজ। এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটল সালমাদের বাড়ির পানে।

রুকাইয়া যখন সালমাদের বাড়িতে এল, তখন মসজিদে ঈশার নামাযের আযান হচ্ছে। সালমা বান্ধবীকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হল। কিন্তু রুকাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার খুশি উবে গেল। তাকে নিয়ে বসল নিজের কামরায়।

'রুকাইয়া! কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?' সালমা জিজ্ঞেস করল।

'নতুন করে আর কী দুর্ঘটনাইবা ঘটবে!' – রুকাইয়া বলল – 'হানাদার-কবলিত এ দেশে দুর্ঘটনা তো আমাদের নিত্যসঙ্গী রে সালমা।'

'সে তো অস্বীকার করার কোনো জো নেই।' – সালমা বলল – 'কিন্তু তোমার চেহারার অবস্থায়ই বলে দিচ্ছে কিছু একটা হয়েছে।'

'যা হয়েছে, তার জন্য দায়ী তোমরা।' রুকাইয়া বলল।

'আ-আ-আমরা!' আমাদের জন্য তোমার সমস্যা হয়েছে।' সালমা ভয় পাওয়া কণ্ঠে বলল।

'তাই তো দেখছি' – রুকাইয়া বলল – 'তুমি আর মাহমুদা কাছে না থাকলে আমার চলে, বলো? তোমরাই তো আমার শান্ত্বনা। আমার নিরানন্দ জীবনে প্রেরণাদায়িনী। তোমাদের ছাড়া একা আমি কী করে থাকি বলো সালমা?'

'কেন, মারিয়াম-জুলাইখা ওরা কোথায়' – রুকাইয়ার এবারের কথায় সালমা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল – 'আমরা তো আমাদের স্থানে ওদের বসিয়ে এসেছি। ওরা কি চলে গেছে?'

'ওরা আজ বিশেষ কাজে বসরা গেছে' – রুকাইয়া বলল – 'আব্বিজান এক নতুন মিশন নিয়ে বেরিয়েছেন; দুদিনেও ফিরতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। এই একটি দিনের একাকিত্ব আমাকে এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিল যে, ওই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে এই রাতের বেলায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

'এসেছ তো ভালোই হয়েছে' – সালমা বলল – 'দুজনে গল্পে-গল্পে রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এবার চলো, রাতের খাবারটা আগে খেয়ে নেই।'

রুকাইয়াকে আহ্বান জনিয়ে সালমা খাবার ঘরের দিকে যেতে উদ্যত হল। রুকাইয়া তাকে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল এবং বলল, 'সালমা! খাবারের চিন্তা আপাতত বাদ দে। এখন খাবারের কোনো রুচি আমার নেই, তুমি আমার কাছে বসো। আমার এমন লাগবে কেন বলত বোন?'

'রুকাইয়া! তোমার কি শারীরিক কোনো সমস্যা আছে? তাহল বলো আমাদের। পাশের বাড়িতে একজন ডাক্তার আছেন, তাকে ডেকে নিয়ে আসি।' সালমা বলল।

রুকাইয়া সালমার মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে তার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বলল, 'সালমা! তোমার বিয়ে হয়েছে; অথচ তুমি কিনা সেই ছোট খুকীটিই রয়ে গেছ। তুমি কি জান না, মানুষের একাকিত্বে শারীরিক নয়, মানসিক রোগ দেখা দেয়।'

'তাহলে তো সাংঘাতিক! মানসিক রোগের চিকিৎসক এখন কোথায় পাব!' চিন্তিত হয়ে পড়ল সালমা।

'আরে পাগলী! তুমি তো কিছুই বুঝছ না' – রুকাইয়া খানিক রাগের স্বরে বলল – 'এ রোগের জন্য সব সময় ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। যেই জিনিসের অভাবে এ রোগ দেখা দেয়, সেই অভাবটি পূরণ করতে পারলেই এ রোগ পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। নচেৎ ডাক্তার দিয়ে, ঔষধ খাইয়ে এ রোগ সারানো যায় না বলাই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া...'

রুকাইয়া আরো কিছু বলতে যাবে এরই মধ্যে ঘরের দরজায় কড়া নড়ার শব্দ হল। সালমা চট করে উঠে বসল এবং বলল, 'সম্ভবত আব্বাজান এসেছেন। তুমি বসো। আমি দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।' বলেই সে দরজার দিকে

এগুলো। দরজার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল– 'কে দরজায়?' ওপাশ থেকে উত্তর এল, 'আম্মিজান! দরজা খুলে ভিতরে যাও, আমার সাথে মেহমান আছে।'

সালমা পিতার উত্তর শুনে দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে চলে গেল। তার পিতা মেহমানের কথা বললেন। সালমা মেহমানের কথা শুনে কৌতূহলবশত পর্দার ফাঁক দিয়ে মেহমানকে এক নজর দেখল। মেহমানকে দেখে সে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল। এ যে রুকাইয়ার স্বামী সালমান। সে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে-মনে ভাবল, সে ভুল দেখল না তো। আবার ভাবল, মানুষের চেহারার সাদৃশ্য মানুষও তো হতে পারে। সালমান তো পাকিস্তানে চলে গেছে সেই কবে। তার বিরহে রুকাইয়া যে আজ পাগলপারা। পরক্ষণেই ভাবল, সালমান হয়ত হঠাৎ চলে এসেছে পাকিস্তান থেকে। রুকাইয়া তার সাথে মজাক করার জন্য সালমানকে তার বাবার মসজিদে রেখে সে আগে চলে এসেছে তাকে বোকা বানানোর জন্য, যেহেতু আমরা সবাই জানি, সালমান পাকিস্তানে।

সালমা যখন পর্দার কাছটিতে দাঁড়িয়ে এসব নানান চিন্তা করছিল, তখন রুকাইয়া সেখানে এসে তার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কি হে সালমা! একেবারে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল যে। দরজায় কে এল? দরজা খুলেছিল?'

'আব্বু এসেছেন আর তার সাথে একটা ভূত এসেছে!' রুকাইয়ার সাথে যেতে-যেতে সালমা বলল – 'ভুতটা দেখে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না।'

'বলিস কী! চাচাজান ভূত কেন নিয়ে এলেন?' রুকাইয়া সত্যি-সত্যিই সালমার কথা বিশ্বাস করল।

'আচ্ছা রুকাইয়া! সত্যি করে বলো তো, তোমরা আমার সাথে মজাক করছ না তো!' সালমা রুকাইয়ার ভূতের কৌতূহল পাশ কাটিয়ে অভিযোগের সুরে বলল– 'আমি তোমাদের চেয়ে একটু কম বুঝি এটা ঠিক; তাই বলে আমাকে এতটা বোকা ভাবা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।'

সালমার কথায় রুকাইয়া ততোধিক বিস্মিত হয়ে বলল– 'এ তুমি কী বলছ সালমা! কিসের কৌতুক? কে তোমাকে বোকা ভাবছে?' আমি তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, তুমি শপথ করে বলো তো, এ ব্যাপারে তুমি কিছুই জান না এবং আমার সাথে কোনোরূপ দুষ্টুমি করা হচ্ছে না' – সালমা বলল – 'আসলে সে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে, মেহমান সম্বন্ধে সে যা কিছু ভেবেছে, তা সত্য কিনা। সুতরাং রুকাইয়া যখন আল্লাহর নামেও শপথ করে একই উত্তর দিল, তখন সে আশ্বস্ত হল, যদি মেহমান সত্য-সত্য সালমান হয়ে থাকে, তাহলেও রুকাইয়া এ ব্যাপারে অনবহিত। বোধ হয় একটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। যার

উভয় দিক সম্বন্ধে অবহিত কেবল সে একাই। তাই সে মনে-মনে ভাবল, প্রথমে আব্বাজানের নিকট থেকে মেহমানের পরিচয়টা জেনে নেওয়া যাক।'

সালমা কৌতূহলী রুকাইয়াকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে, 'তোমার সাথে সামান্য রসিকতা করলাম। তবে এর রহস্যটা তুমি অল্প পরেই জানতে পারবে। তুমি একটু বসো। আমি রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করে আসছি।' একথা বলেই সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। রুকাইয়া অবুঝ শিশুর মতো তার গমনপথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সালমা সামনের রুমের দরজার নিকট এসে তার পিতাকে ডাকল। ডাক শুনে তিনি ভিতরে এলেন। বললেন, কিছু বলবে মা-মণি? তার পিতা ইমাম আবদুল মজিদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি মেহমান নিয়ে এসেছেন কতক্ষণ হল; এখনও তার সাথে শুধু কথাই বলে যাচ্ছেন' – সালমা বলল – 'তার মেহমানদারী করানোর ব্যাপারটা কি ভুলেই গেছেন?'

'তা ভুলিনি আম্মিজান!' – ইমাম আবদুল মজিদ বললেন – 'তবে এই বিদেশি মেহমান একজন সাংবাদিক বিধায় তার কাছ থেকে অনেক জরুরি বিষয় অবগত হচ্ছিলাম। সে জন্য মেহমানদারিতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার তাহলে জলদি করো।'

'দেরি যখন হয়েছে, আরো খানিক হোক' – সালমা বলল – 'আপনি আগে আপনার মেহমানের পরিচয়টা আমাকে দিন।'

'সে একজন পাকিস্তানী সাংবাদিক' – ইমাম সাহেব বললেন – 'তার পরিচয় সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি আমি জানি না।'

'পাকিস্তানী সাংবাদিক!' – সালমা আশান্বিত হয়ে বলল – 'তার নামটা কী আব্বাজান?' যেন তার ধারণা নব্বই ভাগ মিলে গেছে। বাকি দশ ভাগ মিলানোর জন্য চটজলদি সে তার নাম জিজ্ঞেস করল।

অপরিচিত বিদেশি মেহমানকে নিয়ে মেয়ের উৎসাহ দেখে আবদুল মজিদ সাহেব অবাক হলেন। তার মেয়ে তো এমন নয় যে, সব ব্যাপারে সে খোদকারী করে। বরং বাড়িতে কে এল, কে গেল এসব ব্যাপার সর্বদাই সে নির্লিপ্ত থাকতে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু আজ তার কী হল? মেহমানের পরিচয় জানতে সে এত উদগ্রীব কেন? তিনি মনে-মনে এসব চিন্তা করলেও মেয়েকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। শুধু তার জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন, 'মা-মণি! আমি তার সাথে এতক্ষণ কথাবার্তা ঠিকই বলেছি, কিন্তু তার নাম জানা হয়নি। তার নাম দিয়ে তুমি কী করবে?'

নাম দিয়ে যা করব কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জানতে পারবেন' – সালমা বলল – 'দয়া করে আপনি তার নামটা একটু জানুন আব্বাজান।'

ইমাম সাহেব কৌতূহলী হলেও মেয়ের এই আব্দারটি না রেখে পারলেন না। তিনি পুনরায় সামনের রুমে এলেন। কিন্তু মেহমানের কাছে নাম জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তিনি সমস্যায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, মসজিদে বসে পরিচয়পর্ব গেল; তারপর এতক্ষণ ধরে তার সাথে কত কথা বললাম; অথচ তখনই নাম জিজ্ঞেস করিনি। এখন ঘর থেকে এসে হঠাৎ করে তার নিকট নাম জানতে চাইলে সে কী ভাববে? এজন্য মেহমানের কাছে নামটা জিজ্ঞেস করতে তিনি খুবই সংকোচ বোধ করছেন। সহসা তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ ও একটা কলম বের করে মেহমানের হাতে দিয়ে বললেন, 'জনাব! যাওয়ার সময় হয়ত মনে নাও থাকতে পারে, তাই আপনার নাম-ঠিকানাটা লিখে দিন; আপনার নিজের দেশেরটা এবং ইরাকে যেখানে অবস্থান করবেন সেটাও।'

ইমাম সাহেবের হাত থেকে কাগজ-কলম নিয়ে সালমান নিজের নাম, দেশের বাড়ির ঠিকানা লিখল। কিন্তু ইরাক অবস্থানের ঠিকানা লিখতে গিয়ে সে দোটানায় পড়ে গেল। কোন ঠিকানাটা সে লিখবে? ইরাকে তার ঠিকানা বলতে আছে এক শ্বশুরালয়। তাও শ্বশুরের মূল বাড়িটা হানাদাররা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন তারা কোথায় থাকে, সেটা যে তার অজানা। দজলা তীরের বাড়িটা অক্ষত আছে কিনা, রুকাইয়ারা সেখানে থাকে কিনা; সে সংবাদ বা তাকে কে দিবে? ইতিপূর্বে এই চিন্তা করেই তো সে রাতে হোটেলে থাকতে চেয়েছিল। এ সবকিছু চিন্তা করে সে ইরাকে অবস্থানের ঠিকানা না লিখেই কাগজটি ইমাম সাহেবকে ফেরত দিল এবং বলল, 'হযরত! ইরাকে অবস্থানের ঠিকানাটা এখনই দিতে পারছি না। আমার সেই পরিচিত মানুষকে আদৌ খুঁজে পাব কিনা বলা যাচ্ছে না। তাকে না পেলে হোটেলেই অবস্থান করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোন হোটেলে থাকব তাও অগ্রিম বলা যাচ্ছে না। অবশ্য ঠিকানার সাথে আমার মোবাইল ফোন নাম্বারটা লিখে দিয়েছি, কখনো প্রয়োজন হলে ফোন দিবেন।'

'শুকরিয়া! এবার আপনি বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার নিয়ে আসছি।' ইমাম সাহেব সালমানকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে বললেন।

'হযরত! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সন্ধ্যার অল্প আগে পেট পুরে খাবার খেয়ে নিয়েছি' – সালমান বলল – 'এখন আর আমি খাবার খেতে পারব না।'

'জনাব! আপনি মেহমান আর আমি মেজবান। মেহমানের কর্তব্য হল মেজবানকে মেহমানদারি করার সুযোগ প্রদান করা; যেহেতু ব্যাপারটি সুন্নত। আশা করি বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি। সুতরাং এ নিয়ে আমি আর একটি কথাও শুনতে চাই না।' একথা বলেই ইমাম সাহেব ঘরের ভিতরে চলে গেলে। সালমান এই মহৎ আলেমে দ্বীনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল এবং মনে-

মনে ভাবতে লাগল, বাস্তবিকই আরবদের অতিথিপরায়ণতার গুণ পৃথিবীর কোনো অপশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেনি; আর কোনো দিন পারবেও না।

ইমাম সাহেব সালমানের ঠিকানা সম্বলিত কাগজটি কন্যার হাতে দিলেন। কাগজে লেখা সালমানের নামসমেত ঠিকানাটি পেয়ে সালমা এবার নিশ্চিত হল, তার ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক। এখন রুকাইয়ার সাথে সালমানের সাক্ষাতের প্রক্রিয়াটি নিয়ে সে ভাবনায় পরে গেল।

'মা-মণি! তুমি মেহমানের নাম জানতে চেয়েছিলে, তা সংগ্রহ করে দিয়েছি। এবার তাড়াতাড়ি মেহমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো।"

'আব্বাজান! এই নাম-ঠিকানা পেয়ে আমি নিশ্চিত হলাম, এতক্ষণ যাবত মেহমান সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তা একেবারে সঠিক।' – সালমা বলল – ' সেজন্য এখনই আর তাকে আপ্যায়ন করা যাচ্ছে না।'

'এ তুমি কী বলছ মা-মণি!' – মেয়ের কথায় ইমাম সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন – 'তোমার কথাবার্তা ও আচরণে তো আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমি মেহমানকে হাত-মুখ ধুয়ে বসতে বলেছি। এখন খাবার দিতে দেরি করলে বেচারা কি ভাববে বলো তো?'

'আব্বাজান! সে কিছুই ভাববে না' – সালমা বলল – 'আপনি তাকে গিয়ে বলুন, আরও একজন মেহমান আছে; তাদের দুজনকে একত্রে খাবার দেব। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন।'

'আরেকজন মেহমান!' সে কে মা-মণি! কোথায় কে?' ইমাম সাহেব কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'এ ব্যাপারে এখন আর কিছু বলব না' – সালমা বলল – 'আপনি মেহমানের কাছে যান, তাকে খানিক অপেক্ষা করতে বলুন।'

♦ ♦ ♦

'সালমা! তুমি কীসের যেন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে, তাতে সফল হয়েছ কি?' রুমে ফিরে আসার পর রুকাইয়া জিজ্ঞেস করল।

'শুধু রহস্য উদ্‌ঘাটনই করিনি, সেই সাথে তোমার জন্য একটি খোশখবরও নিয়ে এসেছি।' সালমা বলল।

'আমার জন্য খোশখবর!'

'হ্যাঁ, তোমার জন্যই।' সালমার মুখে রহস্যময় হাসি।

'আরে পাগলী! এই দুনিয়াতে আমার জন্য কোনো খোশখবর নেই রে' – রুকাইয়া বলল – 'তবে একটি বিষয়েই আমি কেবল আনন্দ পাই। সেটা হল বেশিসংখ্যক দখলদার সৈন্য হত্যার সংবাদ।'

'রুকাইয়া! বেঈমান-দখলবাজ হত্যার সংবাদে শুধু তুমি কেন, সকল স্বাধীনচেতা মানুষই খুশি হয়' – সালমা বলল – 'কিন্তু তোমার কথায় কেমন

হতাশার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। তুমি কি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেলে?'

'দুঃখিত বোন! আল্লাহর রহমত থেকে তো নিরাশ হওয়ার সুযোগ নেই।'

'তাহলে তুমি ওই কথাটা প্রত্যাহার করে নাও যে, তোমার জন্য কোনো সুসংবাদ নেই।' আবদার জানাল সালমা।

'আচ্ছা! প্রত্যাহার করে নিলাম' – রুকাইয়া বলল – 'এবার তাহলে বলো, আমার জন্য কী খোশখবর তুমি নিয়ে এলে?'

'আব্বাজানের সাথে যে ভূতটা এসেছে বলে তোমাকে বলেছিলাম, সেটা আসলে খুব ভালো প্রকৃতির ভূত।' সালমা বিষয়টিকে একটি নাটকীয় রূপ দিয়ে রুকাইয়ার সম্মুখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করল। আর এভাবেই সে তাকে সালমানের সামনে উপস্থিত করার পরিকল্পনা তৈরি করেছে। তাই সে বলল, 'এই ভূতটার কাছে মানসিক রোগের এমন অব্যর্থ ঔষধ আছে, যা এক ডোজ নিলেই রোগী পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। আমি তোমার কথা উত্থাপন করেছিলাম। সে বলল, যার রোগ তাকে সরাসরি এসে বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, সালমা! তুমি অভিযোগ করছ, তোমাকে আমরা বোকা বলি। কিন্তু বোকা কি আর এমনি বলি বলো?' – রুকাইয়া বলল – 'এই যে তুমি কত বোকামিসুলভ কথা বলছ। তোমাকে আমি বললাম, তোমরা কেউ কাছে না থাকায় একাকিত্বের কারণে আমার মানসিকভাবে খারাপ লাগছে আর তুমি কিনা আমাকে একেবারে মানসিক রোগী বানিয়ে ফেললে। আবার জ্বিন-ভূতের কাছেও এ সত্যটি পরিবেশন করে দিলে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ বোন! আমি একটা চরম বোকা মেয়েই' – সালমা হেসে-হেসেই বলল – 'তবে তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও যে, তোমার শুধু আমাদের অনুপস্থিতির কারণেই মানসিক পীড়া হচ্ছে না, অন্য কারও জন্যও মনটা ছটফট করছে, সে তথ্য আমি না বলতেই 'ভূত' বলে দিল। সে আমাকে স্পষ্ট করে বলল, তোমার বান্ধবী তার প্রিয় মানুষের বিরহে মানসিক কষ্ট পাচ্ছে। সে চাইলে তার মনের মানুষকে এক মুহূর্তের মধ্যে এনে তার সম্মুখে হাজির করে দেব। তবে শর্ত হল, সে নিজে এসে তার সমস্যা আমার কাছে বলে যাবে।'

'এটা কীভাবে সম্ভব?' – রুকাইয়া বলল – 'তোমার দুলাভাই মি. সালমান কোরেশী রয়েছেন সুদূর পাকিস্তানে। হাজার-হাজার মাইল দূরে। সেখান থেকে মুহূর্তের মধ্যে তাকে এনে হাজির করার দাবি বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'রুকাইয়া! এত দিন বহু শুনেছি ভূতেরা অনেক কিছু পারে' – সালমা বলল – 'আজকে তার একটি প্রমাণ হয়ে যাক। তুমি তার কাছে গিয়ে সব খুলে বলো।'

'আমি পারব না ভাই' – রুকাইয়া বলল – 'ভূতটুতের কাছে যেতে আমার ভীষণ ভয় লাগে।'

এভাবে অনেকক্ষণ ধরে সালমা রুকাইয়াকে বুঝ দেওয়ার পর অবশেষে সে ভূতের কাছে যেতে রাজি হল। এবার সালমা শর্ত দিল, খালি হাতে ভূতের কাছে যাওয়া যায় না; অনেকগুলো খাবার নিয়ে যেতে হয়।

এদিকে বেচারা সালমান এক অস্বস্তিকর অবস্থা পার করছে। সে প্রথমেই রাতের খাবারে অনীহা প্রকাশ করেছিল। ইমাম সাহেব তার সেকথা মানতে একদম রাজি হলেন না। তার কথামতো সে হাত-মুখ ধুয়ে বসে রইল। কিন্তু তিনি খানা না এনে বললেন, আরো একজন মেহমান আছে। এখন পর্যন্ত সে মেহমানও এল না আর তিনিও সেই সে গেলেন, প্রায় মিনিটবিশেক হল ফিরেও আসছেন না। এভাবে বসে থাকতে তার একটুও ভালো লাগছে না। তাই সে মোবাইল ফোনটি বের করে বিকালের তোলা ছবিগুলো এডিট করতে লাগল।

সালমান যখন মোবাইল ফোনে ছবিগুলো রিনেইম করায় ব্যস্ত, তখন রুমের মধ্যে কারো প্রবেশধ্বনি টের পেল। সহসা সে আগন্তুকের দিকে তাকাল। দেখল, একজন মেয়ে মানুষ স্টিলের একটা খাঞ্চা হাতে এগিয়ে আসছে। মেয়ে লোকটি যদিও ওড়না দ্বারা মুখমণ্ডলের ওপর ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, তথাপি সে দ্বিতীয়বার চোখ তুলে তার দিকে তাকায়নি। আগন্তুক খাঞ্চাটা টেবিলের উপর রেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলছেও না, চলেও যাচ্ছে না। তার এই আচরণে সালমান অবাক না হয়ে পারল না।

'আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছেন?' মেয়েটি বেশ সময় দাঁড়ানোর পর কোনো কথাবার্তা না বলায় সালমানই মুখ খুলল। জানতে চাইল তার দাঁড়ানোর কারণ। কিন্তু সে তার প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিল না। যে কারণে সালমান ভাবল, মেয়েটি বোবা-বধির নয়ত। আবার ভাবল, বোবা-বধির যা-ই হোক সে এখান থেকে যাচ্ছে না কেন?

তারপরই ঘটল বিপত্তি...।

প্রকৃতপক্ষে সালমানের সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি বোবাও নয়, বধিরও নয়। সে হল তার প্রিয়তমা রুকাইয়া। বান্ধবী সালমা তাকে এই রুমে অবস্থানকারী 'ভূত' সম্পর্কে এমন ধারণাই পুশ করেছে যে, সত্যি-সত্যিই সে এখানে বসা তার স্বপ্নের পুরুষকে 'ভূত' হিসেবেই গণ্য করেছে। তদুপরিও সে খাঞ্চা হাতে সে এ রুমে এসেছে তা একান্তই তার দুরন্ত সাহসের পরিচায়ক। অবশ্য তাকে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে তার বান্ধবীর ঐ আশ্বাস যে, এ ভূত তাকে তার প্রিয়তমের সাথে মিলনের ব্যবস্থা করে দিবে।

রুকাইয়া রুমে ঢুকে খাঞ্চাটা টেবিলের উপর রাখার সময় ওড়নার ফাঁক দিয়ে 'ভূতে'র প্রতি এক নজর তাকিয়েছিল। তাতেই সে ভয়ে জমিনের সাথে আটকে গেল। ভূত যে স্বয়ং তার স্বামীর আকৃতি ধারণ করেছে। হায় আল্লাহ! এই ভয়ানক ভূতের হাত থেকে আমায় কে উদ্ধার করবে? সালমা আমার সাথে এই বেঈমানি কাজটা কেন করল। আমি তার এমন কী ক্ষতিটা করেছিলাম!

রুকাইয়া মনে-মনে এমনতর বিভিন্ন স্বগোতক্তি করতে লাগল। কিন্তু সে এখান থেকে নড়ার মতো কোনো শক্তি পাচ্ছে না। তার ইচ্ছা করছে চিৎকার দিয়ে সালমাকে ডাকতে। কিন্তু জিহ্বাটা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা করছে দৌড়ে পালিয়ে যেতে। মনে হচ্ছে পাদুটো জমিনে এঁটে আছে। এমন কেন হচ্ছে তা সে নিজেও জানে না। সালমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল। এমন করছে কেন মেয়েটা। দেখা যাচ্ছে, সে কাঁপছে। এরই মধ্যে সালমান যখন জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছেন?' এর ঠিক চল্লিশ সেকেন্ডের মাথায় সে দাঁড়ানো থেকে পড়ে গেল।

অনাকাঙ্ক্ষিত এই বিপত্তির জন্য সালমান মোটেও প্রস্তুত ছিল না। 'হায় আল্লাহ!' বলে সে হাল্কা আওয়াজে চিৎকার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে কী করবে ভেবে কূল পেল না। বেগানা মেয়ে মানুষ ধরবেই বা কেমন করে। এরই মধ্যে ভিতর থেকে কেউ বলল, 'সালমান ভাই! রুকাইয়া হটাৎ আপনাকে দেখে ভয় পেয়ে সংজ্ঞা হারিয়েছে। আপনি ওকে তুলে খাটে শুইয়ে দিন।'

ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে কণ্ঠের এ আহ্বান শুনে সালমানের হয়রানির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। তার কাছে সবকিছু ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে হল। রুকাইয়া এখানে এল কিভাবে? সত্যিই যদি সে রুকাইয়া হয়ে থাকে, তাহলে এখানে এসেই সে পরিচয় দিল না কেন?

'আপনি কে বলছেন? ইমাম সাহেব কোথায়?' সামান্য ইতস্তত করে পরে বেশ উচ্চস্বরেই সালমান জিজ্ঞেস করল– 'রুকাইয়া এখানে এল কী করে?'

'সালমান ভাই! আমি রুকাইয়ার বান্ধবী ও ইমাম সাহেবের কন্যা' – সালমা ঘরের মধ্যে থেকেই উত্তর দিল – 'আমার নাম সালমা। রুকাইয়ার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের একজন। আব্বাজান অর্থাৎ ইমাম সাহেব ওপাশের রুমে খাবার খাচ্ছেন। রুকাইয়া অল্প আগে আমাদের বাড়িতে এসেছে। এটা কুদরতেরই অপার দয়া যে, তিনি আপনাদের যেমন আকস্মিক বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি অভাবিত মিলন ঘটালেন। সুতরাং আর এক মুহূর্তও দেরি না করে আপন স্ত্রীকে ফ্লোর থেকে তুলে খাটে শুইয়ে দিন। খানিক পরিচর্যা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। পর্দার খেলাফ না হলে আমিও আপনাকে সহায়ত করতে পারতাম।'

সালমার এবারের কথায় সালমান অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। সে রুকাইয়াকে তুলে খাটে শোওয়াল। দেখা গেল তার কপালের ডান দিক থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তবে ক্ষত সামান্য। সালমান দ্রুত নিজের ব্যাগ থেকে প্রাইমারি এইডের বক্সটা বের করল। তুলা দিয়ে রক্তটুকু মুছে ফেলল। অন্য একটু তুলায় প্রতিষেধক ঔষধ লাগিয়ে ছোট্ট একটা পট্টি বেঁধে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তার হুঁশ ফিরে এল। কিন্তু চোখ খুলে সে সালমানকে পাশে বসা দেখে জোরে একটা চিৎকার দিয়ে আবার জ্ঞান হারাল।

'হ্যাঁ বোন সালমা! আপনাকে বলছি। আপনার বান্ধবী আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে কিনা জানি' – সালমান ভিতরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল – 'সে বারবার হুঁশ হারাচ্ছে। আপনি একটু তার কাছে আসুন। আমি সে সময়টুকু বাইরে কাটাচ্ছি।'

'দুলাভাই! দোষটা মূলত আমারই। আপনার আগমন সম্বন্ধে প্রথমে আমিই ধারণা লাভ করি। আব্বাজান যখন বললেন, মেহমান একজন বিদেশি সাংবাদিক, তখন জানতে চাইলাম আপনার দেশ। এরপর লিখিয়ে নিলাম আপনার পুরো নাম-ঠিকানা। কিন্তু বিষয়টি আমি রুকাইয়াকে জানাইনি।' – সালমা বলল – 'আমি চেয়েছিলাম তাকে একটা নাটকীয় পদ্ধতিতে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করতে। তাতে সে এমনভাবে ভড়কে যাবে ভাবিনি। ঠিক আছে, আমিই ওর খেদমতে আসছি। আপনাকে বাইরে যেতে হবে না, আপনি পাশের রুমে আব্বাজানের কাছে চলে যান। তার সাথে গল্প করুন। আমি ডাকলেই চলে আসবেন।'

♦ ♦ ♦

অনেক সেবা-যত্নের পর রুকাইয়া দ্বিতীয়বার চোখ খুলল। এবার তার পায়ের কাছে সালমাকে বসা দেখল। শোওয়া থেকে উঠেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিল। কান্না শেষে সে সালমার বিরুদ্ধে অভিযোগের বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল, 'সালমা! এই তোমার সুসংবাদ? তুমি আমার সাথে এ ধরনের ধোঁকাবাজিটা কেন করলে? তোমার বাড়িতে এসেছি বলে? আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছিলাম, বলো, উত্তর দাও? কী কারণে তুমি এরকম একটা ভয়ঙ্কর ভূতের নাগালে আমাকে একাকি পাঠালে?' বলে রুকাইয়া মুখ ভার করে বসে রইল।

'আমি তো জানতাম, ভূতটা একেবারেই ভদ্র ও নিরীহ' – সালমা বলল – 'তা তোমার সাথে সে কি কোনো ভয়ঙ্কর আচরণ করেছিল?'

'ভদ্র না ছাই!' – রুকাইয়া রাগতস্বরে বলল – 'তুমি বলেছিলে সে আমার মুখে সমস্যাগুলোর কথা শুনে তা সমাধানের চেষ্টা করবে। কিন্তু হল তার উল্টো। আমার কাছে কিছু না শুনেই সে তোমার দুলা ভাইয়ের রূপ ধারণ করে বসে রইল। সেই সাথে তার কণ্ঠও নকল করল। শুধু কি তাই; আমি খাবারের খাঞ্চা নিয়ে তার কাছাকাছি যেতেই সে আমাকে নজরবন্দি করে ফেলল। আমি এখান থেকে দৌড়ে পালাতে চেয়েছিলাম; মনে হল পাদুটো জমিনে আটকে গেছে। তোমাকে ডাক দিতে চাইলাম; দেখি জিহ্বা শক্ত হয়ে গেছে। মোটকথা, সে আমাকে পুরোপুরি তার কব্জায় নিয়ে নিয়েছিল। সর্বোপরি যখন সে তোমার দুলা ভাইয়ের কণ্ঠে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল, তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলাম।'

'রুকাইয়া বোন আমার! তুমি আমার ওপর রাগ করো না। আমি ভীষণভাবে লজ্জিত' – সালমা বলল – 'তোমাকে কোনোরূপ কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও বোন।'

'তা না হয় ক্ষমা করে দিলাম' – রুকাইয়া কতকটা শান্ত হয়ে বলল – 'কিন্তু তুমি আমার সাথে এ রকম আচরণটা কেন করলে তা কি জানতে পারি?'

'রুকাইয়া, আমাকে আগে কথা দাও, কারণটা শুনলে তুমি পুনরায় আমার ওপর রাগ করবে না।' সালমা প্রতিশ্রুতি চাইল।

'আচ্ছা ভাই, সে কথাও দিলাম। তুমি প্রকৃত কারণটা আমাকে বলে ফেলো।' রুকাইয়া এবার হেসেই বলল।

রুকাইয়ার মুখে হাসি দেখে সালমার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। এতক্ষণ সে তার সাথে কথাবার্তা ঠিকই বলেছে, কিন্তু মনটা আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। এখন আনন্দিত চিত্তে কথা বলতে শুরু করল, 'আমি এতক্ষণ যাবত তোমার সাথে নাটক করেছিলাম। অবশ্য এটা করতে আমি বাধ্য ছিলাম।'

এরপর সালমা সব ঘটনা রুকাইয়াকে খুলে বলল। কিভাবে সে প্রথমে সালমানকে দেখল। কিভাবে পরিচয় নিশ্চিত হল। কিভাবে তাকে সালমানের সম্মুখে পাঠানোর নাটকটি সাজাল সব বিস্তারিত বলল। সর্বশেষ এও বলল, সালমান এখন ভিতরের রুমে ইমাম সাহেবের সাথে বসে গল্প করছে। ডাক পেলেই সে চলে আসবে, দেরি হবে না এক মুহূর্তও।

সব শুনে রুকাইয়া আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে সে সালমাকে জড়িয়ে ধরে গালে-মুখে চুমো দিতে লাগল।

'আরে থামো থামো! এতগুলো চুমো আমাকে দিয়ে দিলে; দুলাভাইকে কী দেবে? তার জন্যও কিছু রাখো।' সালমা নিজেকে রুকাইয়ার বাহুবন্ধন থেকে আলাদা করতে-করতে বলল, 'আমাকে যেতে দাও; তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'যাও দুষ্ট! ইদানিং তুমি বড় বেহায়া হয়ে গেছ।' রুকাইয়া সালমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল।

সালমা রুম থেকে বেরিয়ে গেল। এর খানিক বাদেই সালমান রুমে প্রবেশ করল। এদিকে রুকাইয়া বেহুঁশের ভান করে খাটের উপরই শুয়ে রইল। সালমান তার শিরায়-মাথায় হাত বুলাল, কিন্তু সে এতটুকুও নড়াচড়া করছে না। সে তার শিয়রে বসে চিন্তা করতে লাগল, সালমা বলল, সে এখন পূর্ণ সুস্থ; অথচ দেখছি সেই একই রকম আছে। এরই মধ্যে রোগী 'পানি-পানি' বলে কুঁকিয়ে উঠল।

সালমান দ্রুত এক গ্লাস পানি ডান হাতে নিয়ে বাম হাত দিয়ে রুকাইয়ার মাথাটা তুলে পানি পানের ব্যবস্থা করল। সালমানকে অবাক করে দিয়ে সে নিজেই পানি গ্লাস পান করল। শুধু তা-ই নয়, পানির গ্লাসটা পাশে রেখে সে তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং কেঁদে ফেলল।

রুকাইয়ার আজকের এ কান্না বেদনার নয়; এটা খুশির কান্না, পাওয়ার আনন্দ। প্রিয় হারানোয় হৃদয়ের আকাশে জমা হওয়া কালো মেঘ আজ সাক্ষাতের উষ্ণ ঝড়োহাওয়ায় বারিবর্ষণ শুরু করেছে। এর দ্বারা দিলরাজ্যে সব ব্যথা-বেদনার আবর্জনা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। সে আজ সত্যিই অভিভূত। সন্ধ্যায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় এমনটা তার কল্পনায়ও আসেনি। সালমানের অবস্থাও ঠিক একই। পাকিস্তান থেকে রওনার সময় থেকে সে আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছিল। রুকাইয়াকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না এমনটাই সে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এই মিলনে সেও বিস্ময়ে বিমোহিত, খুশিতে আত্মহারা। সর্বোপরি মহান স্রষ্টর দরবারে কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত।

জীবনের চির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নীল বাসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দুটি হৃদয়ের আজ পুনর্মিলন ঘটেছে। এর মধ্যে চলে গেছে কয়েক মাস। এ দীর্ঘ সময় দুজনের মনেই জমা হয়েছে বহু কথা, অজস্র কৌতূহল, যা একে-একে বর্ণনা করতে গেলে কয়েক রাত কেটে যাবে। সালমান বলল, আগে খাওয়ার আয়োজন সেরে তারপর কুশলবিনিময় করা যাক। রুকাইয়াও তার কথায় সায় দিল।

আহারপর্ব শেষ করে সালমান-রুকাইয়া বিশ্রামের জন্য তৈরি হল। বিছানায় যাওয়ার পূর্বে সালমান একটা প্যাকেট রুকাইয়ার হাতে দিল। সে আগ্রহভরে সেটা খুলল। ভিতরে দেখা গেল এক জোড়া কানের দুল, এক জোড়া চুরি ও একটা চেইন। সাথে সাদা একটা কাগজের খাম। সাদা খামটা খুলে দেখল, তার মধ্যে কতিপয় কবিতা লেখা কাগজ।

স্বর্ণালংকারগুলো এক পাশে রেখে রুকাইয়া কবিতার কাগজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে 'ইরাক আগ্রাসন' শিরোনামের কবিতাটি তার কাছে বেশি পছন্দ হল। সে আবৃত্তি করেই কবিতাটি পড়তে শুরু করল–

২০শে মার্চের সেই কালো রাতে
সম্পূর্ণ মিথ্যা-ভুয়া অজুহাতে
ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারি অস্ত্র হাতে
দানব ঐ বুশের ইচ্ছেমতো।

নিরস্ত্রপ্রায় ইরাকি সৈন্য
দেশপ্রেমের সেই নিয়ে চৈতন্য
প্রতিরোধ যুদ্ধে হল অগ্রগণ্য
এজন্য জানাই তাদেরকে ধন্য।

কামান, বিমান যদি না পাওয়া যায়
খালি হাতে আর কতক্ষণ লড়া যায়
শক্তিশালী হাইটেকের মোকাবেলায়
নো-টেক দিয়ে আর কিইবা করা যায়।

তবুও ইরাকি সেনাদের দেখে মনোবল
ভয় পেয়ে গেল ঐ হানাদারের দল
প্রয়োগ করল তাই নতুন এক চাল
কতিপয় সৈন্য ছাড়ল তাই হাল।

কতিপয় আবার করল গাদ্দারি
হানাদারদের থেকে নিল অবৈধ কড়ি
অফাদার সৈমন্যরা ভাবল কী করি
এভাবে লড়াই করলে যাব সবে মরি।

তাই তারা কৌশলের নিয়ে আশ্রয়
হানাদার সৈন্যদের দিল প্রশ্রয়
সময়ের হের-ফেরে হোক তাদের জয়
মার দিব ওদেরকে ফেলে বেকায়দায়।

অবশেষে ২০ দিনের যুদ্ধের মাথায়
ইরাককে হানাদার দখল করে নেয়
প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম না দেখে উপায়
ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে অজানায় পালায়।

মার্কিন সেনাদল ঢুকে বাগদাদ
পরিচয় দিল তারা কেমন কুজাত
লুটপাট চালাল হয়ে উন্মাদ
দোকানঘর-হাসপাতাল রাখল না বাদ।

তর মোটে সইল না করল না দেরি
দেখে এখানের বিশাল সম্পদ সারি
তাই, বাগদাদ যাদুঘরও হইল চুরি
পাশ্চাত্যের বাজারে আজ হচ্ছে তা ফেরি।

ঐতিহাসিক শত-সহস্র নিদর্শন
শতাব্দীর কোল থেকে যা করেছিল অর্জন
নিমিষেই হায়েনা কেড়ে নিল সে ধন
সভ্যতার জননীর ভেঙে দিল সে মন।

কুমারী মাতাদের জারজ সন্তানের দলে
শকুনের বেশে এল ইরাকে চলে
সভ্যতার মুখোশ তাদের গিয়েছে খুলে
পাশবিক আচরণে তারই প্রমাণ মিলে।

বোমা মেরে ঘর-বাড়ি করল বিনাশ
ইরাকি জনতার হল মহাসর্বনাশ
কোথায় এখন তারা করবে বসবাস
বালুর মরুতে যে নেই দুর্বাঘাস।

হাহাকার তাই গোটা ইরাক জুড়ে
হৃদয় গিয়েছে তাদের ভেঙে-চুরে
আসবে কি সুখের দিন কভু ফিরে
অভাগা ইরাকিদের ভাঙা এ ঘরে?

বসরাই গোলাপের সেই সুমিষ্ট সৌরভ
জগৎ জোড়া যার ছিল গৌরব
ছিন্নভিন্ন আজ গাছ-ফুল সব
মিলবে না কভু আর সেই গোলাপ!

সুবাসে মাতাবে না মন-প্রাণ আর
দুঃখ পেয়েছে সে যে মনের ভিতর
লাল-সাদা পাঁপড়িগুলো চুপসে গেছে তার
আহা মরি কী দশাটা হইল বেচারার!

বেবিলনের সেই যে শূন্য উদ্যান
মেসোপটেমীয় সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ অবদান
সপ্তাশ্চর্যের এক জাজ্বল্য প্রমাণ
রুদ্ধ করেছে তার দ্বার জালিম শয়তান

আগ্রাসন চালাল ওরা বায়তুল হিকমায়
আগুন লাগিয়ে দিল কিতাবের গায়
সভ্যতার দলিলগুলো পুড়ে খাক হয়
অসহায় সন্তানরা নির্বাক চেয়ে রয়।

আগুন জ্বলছে আজ ইরাক জুড়ে
মানবতা কাঁদছে দেখ তারই সুরে
যেন সেই হালাকুরা এসেছে ফিরে
ইতিহাস স্মরে যাদের ঘৃণা ভরে।

পরিচয় জান কি ভাই সেই হালাকুর
দজলারে যে করেছিল রক্তের পুকুর
মানুষ তো নয় ছিল পাগলা কুকুর
আচরণ ঠিক যেন বন্য শূকর।

এ যুগের হালাকু এই বুশ দুরাচার
প্রতিটি ইরাকি শহর প্রমাণ তার
মানুষ মারার স্বপ্ন সে দেখে রাতভর
পিচাশের হিংস্রতাকেও করেছে ওভার।

নব্য ক্রুসেডার ঐ দানব বুশ
ক্ষমতার দাপটে ওর নেই কোনো হুঁশ
যেমনটি ছিল ওর বাবাও বেহুঁশ
খেতে চায় সদা ওরা রক্তের জুস।

মারছে তাই শত-শত নারী-শিশু
মানুষ তো নয় যেন ওরা সাক্ষাত পশু
অসহায়দের চোখে ঝরায় বেদনার আঁসু
এই কি শিক্ষা দিলেন ওদের যিশু!

যিশু নাকি বলেছেন, 'সবাই মিলে
রবে প্রেম-প্রীতি আর উদার দিলে
বিবাদ করবে না কেউ কোনো কালে
যদিও অন্যরা থাপ্পড় দেয় তব গালে।'

কোথায় গেল সেই খৃষ্টানি শিক্ষা
যিশুর ভক্তদের ঐশ্বরিক দীক্ষা,
কেন আজ তারা করছে সমীক্ষা
মানুষ মারার বোমা, অস্ত্রের পরীক্ষা?

ইরাক জনতা জেগেছে এবার
চলবে লড়াই এখন দ্রুত দুর্বার
শহীদি চেতনা বুকে নিয়ে কারবালার
শুনে রেখে ওহে পিচাশ নব্য সীমার।

মানববোমা হয়ে আজ লড়ছে তারা
ফোয়ারার মতো বইছে রক্তধারা
দিকে-দিকে তাই দেখ পড়েছে সাড়া
জেগেছে ঐ তারুণ্যের ঘুমের পাড়া।

ফোরাতের বুকে ফের উঠেছে জোয়ার
নব্য ক্রুসেডারের দল হও হুঁশিয়ার
ভাসিয়ে নিবে তোদের রণহাতিয়ার
শহীদী কাফেলা সেই নিয়েছে তৈয়ার।

যতই থাকুক তোদের অস্ত্রের বল
সংখ্যায় যত বেশি থাকুক সেনাদল
শহীদী কাফেলা তাতে হবে না দুর্বল
ব্যর্থ করিবে তোদের সকল কৌশল।

যুদ্ধটা তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে
এখনই তোর সেনাদল কেটে উঠেছে
কতক আবার মানসিক ভার হারিয়েছে
মূল যুদ্ধ যে সামনে রয়েই গেছে।
শান্ত ইরাকে তুমি আগুন জ্বেলে
অভাগা জাতিরে দিলে যুদ্ধে ঠেলে
প্রতিশোধ নিতে তাই উঠেছে জ্বলে
জাত-পাত ভুলে গিয়ে সবাই মিলে।

রচিলে যে ইতিহাস আবু গারিবে
শিহরিত হবে যে তা পাঠ করিবে
যুগে যুগে মানুষেরা ধিক্কার দিবে
তখন কোথায় তোর মুখ লুকাবে।

যেভাবে বন্দীদের তোরা করলি দলিত
মানবতা এভাবে আর হয়নি মথিত
বিশ্ব বিবেক আজ খুবই ব্যথিত
মর্গে দেখে অসংখ্য লাশ গলিত।

অসহায় হাত বাঁধা বন্দিদের উপর
নির্যাতন চালালি জালিম, নিষ্ঠুর-ইতর
কুকুর লেলিয়ে দিয়ে সেলের ভিতর
আরও দিলি ভারি বোঝা মাথার উপর।

আমেরিকা এ্যাটাক হল ১১ সেপ্টেম্বর
দোষ দিলি ওসামা আর সাদ্দামের উপর
জেনে-বুঝে করলি তুই শুধু মিথ্যাচার
তেলচোর ওহে ও লোভী হানাদার।

আবার তুললি আণবিক অস্ত্রের ধোঁয়া
প্রমাণিত হল শেষে সবকিছু ভুয়া
মিথ্যার চাদর ফেলে খেলছ জুয়া
আসল লক্ষ্য ইরাকের তেলের কুয়া।

সামরিক শক্তি তোর হয়ে যাবে ক্ষয়
সেই দিন-ক্ষণটি খুব বেশি দূরে নয়
খয়রাতেও মিলবে না তোর যুদ্ধের ব্যয়
ময়দান ছেড়ে দেখবি সেনারা পালায়।

অপেক্ষা কররে তুই কটা দিন আর
বীর ইরাকিরা তোর মটকাবে ঘাড়
ডজনে-ডজনে সৈন্য করিবে সাবাড়
ভিয়েতনাম রচিবে ইরাকে আবার।

এই বিশাল অথচ ছন্দোবদ্ধ কবিতাটি পড়ে রুকাইয়া তার স্বামীর প্রতি যেমন আরও বেশি শ্রদ্ধাবনত হল, তেমনি কবিতা পাঠের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেল। অবশ্য কবিতার প্রতি আসক্তি তার সেই স্কুলজীবন থেকে। আবৃত্তিটাও শিখেছিল ঐ সময়ই। কবিতার প্রতি এত ভালোবাসা সত্ত্বেও সে অদ্য পর্যন্ত নিজে কোনো কবিতা লিখতে পারেনি। শুধু সে কেন, পৃথিবীর বহু কবিকতাপ্রেমীই নিজেরা কবিতা লিখতে পারেন না। এটা দোষের কিছ নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সব যোগ্যতা দেন না। যাহোক, সে তার স্বামীর কবিতা পড়ে অনেক

তৃপ্তি পেল। সাথের অন্য কবিতাগুলোও তার পড়তে ইচ্ছা করছে। একে-একে তাই সব কটা কবিতাই সে পড়ল। এর মধ্যে 'ইরাকি শিশু' নামক কবিতাটি তার ভালো লাগার দ্বিতীয় স্তরে ঠাঁই নিল। সেজন্য এটাকে দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করতে লাগল–

'ইরাকি সেই শিশুটি
মায়ায় ভরা মুখ
ব্যথাতুর ওর হৃদয়টি
নেই জীবনের সুখ।
হাত দুখানি উড়ে গেছে
ঝলসে গেছে দেহ
বাবা-মা সব মরে গেছে
কোথায় পাবে স্নেহ।
স্ট্রেচারে ভরা দেহখানি
হচ্ছে কত কষ্ট
ভাই-বোনও গেছে মরে
জীবনটাই ওর নষ্ট।
একটুখানি অবোধ শিশু
রাখবে কোথায় এত দুঃখ
দুচোখ বেয়ে ঝরতে অশ্রু
ভেঙেছে ওই ছোট্ট বুক।
মার্কিনিদের বোমার আঘাত
ওর সব নিল কেড়ে
নড়াচড়ার মতো নেই যে তাকত
কেমনে উঠবে ও বেড়ে?
স্বপ্ন ছিল ওর দুচোখ জুড়ে
বড় হয়ে হবে ডাক্তার
যখন দেখে ও চতুর্দিকে
আপন বলে কেউ নেই যে তার।
তবে কি এই বিশ্বভূমে
ওর নেই কোনো অধিকার?
জাতিসংঘের ইউনিসেফরা আজ
রইলে কেন নির্বিকার।
শিশু আব্বাসের নিথর দেহ
পরে রয়েছে ঐ বিছানায়
কে দিবে তার হাত ফিরিয়ে
ঘুম পাড়াবে শান্তনায়?

এভাবে কেবল আব্বাসই নয়
ইরাকের প্রতি ঘরে
লক্ষ আব্বাস দুঃখসাগরে
ধুঁকে-ধুঁকে আজ মরে।
দশ লক্ষ শিশু মরল
নব্বইয়ের দশক জুড়ে
তাতেও দানবের মেটেনি খায়েশ
ইরাকি শিশুদের উপরে।
আজকে তারা সাত বছরের
ছোট্ট শিশুও করছে বন্দি
যেন তারা বড় হয়ে ফেরে
না হয় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী!
অক্টোবরের তিন তারিখ খন
শিশু অধিকার হয় পালিত
ইরাকি শিশুর সব অধিকার তখন
আমেরিকার হাতে হয় লুণ্ঠিত।
বিষাক্ত বোমার তেজস্ক্রিয়তা আর
ভিটামিন-পুষ্টির অভাবে
এসব শিশু বেঁচেও মরা আজ
পঙ্গুত্ব ঘুচাবে কিভাবে?
বিশ্ববিবেক সবকিছু দেখেও
থাকছে কেন নির্বিকার
ইরাকি শিশু আদালতে একদিন
হতেই হবে তোমার বিচার।

কবিতা পাঠ শেষে রুকাইয়া স্বর্ণালংকারগুলো সম্বন্ধে তার স্বামীকে প্রশ্ন করল। তার প্রশ্নের ধরনে সালমান অবাক না হয়ে পারল না। কারণ, স্বর্ণালংকার তথা গহনায় খুশি হয় না, আনন্দ প্রকাশ করে না এমন মেয়েও আছে তাহলে। তাও এই আধুনিক যুগে। তবে রুকাইয়ার ধারণা বুঝতে তার বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি। সে নিজেও এ রকমটিই ভাবে। এখনকার মেয়েরা অলংকারকে যেন তাদের দ্বিতীয় খোদা বানিয়ে নিয়েছে। বনী ইসরাইরের লোকেরা যেমন স্বর্ণ দিয়ে বাছুর বানিয়ে পূজা করেছিল; তেমনি বর্তমানের মেয়েরাও স্বর্ণের গহনার এক ধরনের পূজা করে চলছেন। অবশ্য এই প্রবণতা অমুসলিম মেয়েদের থেকে মুসলিম জায়া-কন্যা-জননীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এজন্য মুসলিম সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে সালমান অভিমত ব্যক্ত করল। সেই সাথে তার স্ত্রীর এই সচেতনতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল।

নয়.

পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্র বা জাতিসমূহ দুর্বল রাষ্ট্র বা জাতিসমূহের উপর অতীতে যেমন আগ্রাসনের খড়গ চালিয়েছিল, তেমনি বর্তমানেও এই ধারা রীতিমতো অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতে এর ব্যতিক্রম হবে এমনটা ভাববার অবকাশ নেই। এই আগ্রাসী মনোভাবের মূল কারণ হল 'সভ্যতা'র অভাব। যখনই কোনো জাতি কোনো একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফেলে, তখনই তারা অপরাপর জাতিসমূহকে তাদের চেয়ে হীন, ইতর, অভদ্র, ছোটলোক, অসভ্য ইত্যাদি ভাবতে শুরু করে। এই ভাবনা তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, নিজেদেরকে তারা খোদার আসনে বসিয়ে নেয়। আর অন্য জাতিগুলোকে তাদের আরাধনা করার হুকুম জারি করে। এ পথ ধরেই শুরু হয় জাতিবৈষম্য। শয়তান তখন এই বৈষম্যের শিকড়ে পানিসিঞ্চন শুরু করে। বৈষম্য শিকড় থেকে শিখরে পৌঁছে যায়। অসভ্যতার আগুনের এই লেলিহান শিখা উক্ত জাতিকেই তখন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ হুবহু এমনই অবস্থা। প্রযুক্তিবিদ্যায় তারা অন্যান্য সকল রাষ্ট্র বা জাতিসমূহকে পিছনে ফেলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। এই একটি কারণে সে নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে ভদ্র, মার্জিত, উন্নত ও গণতান্ত্রিক সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে জাহির করছে। মোড়লিপনা করছে বিশ্বের তাবৎ জাতিসমূহের উপর। বিশেষত মুসলিম বিশ্বের উপর তার মোড়লিপনার কাজটা অতি বেশি পরিমাণে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তারা বিশ্বের সর্বকালের সেরা সুসভ্য জাতি মুসলিম জাতিকে চিহ্নিত করছে অসভ্য, নীচু, পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ জাতি হিসেবে। এই সূত্রেই তারা মুসলিম জাতির সাথে চরম বিদ্বেষী ভাব পোষণ করে থাকে। নতুবা মুসলমানরা তো কখনো আমেরিকার বাড়া ভাতে ছাই ছিটাতে যায় না। তারা বলছে, ৯/১১-এ ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে বিমান হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা তথা মুসলিমরা। কিন্তু অদ্যাবধি কি তারা এর বিশ্বাসযোগ্য একটা প্রমাণও দেখাতে পেরেছে? পারেনি। সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভুয়া ও অগ্রহণযোগ্য দাবি তুলে তারা মুসলিম বিশ্বের একটির পর একটি দেশে আগ্রাসনের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বে কেউ একটা 'কাশি' বা 'হাসি' দিলেও তা আমেরিকার অনুমতি সাপেক্ষে দিতে হবে। কাশিটা আস্তে দিবে নাকি জোরে, প্রকাশ্যে দিবে নাকি অপ্রকাশ্যে, মুখে হাত দিয়ে দিবে নাকি স্বাধীনভাবে দিবে; সেটাও তারা নির্ধারণ করে দিবে।

এমতাবস্থায় নিপীড়িত মুসলিমরা যদি আমেরিকার এই অযাচিত মাতুব্বরি ও অন্যায় আগ্রাসনের মোকাবেলায় শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু দস্যু-তস্করররা যদি ঘরওয়ালাকে চোখ

রাঙিয়ে দেয়, বাড়িওয়ালা কি তাতে নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারে? তেমনি ইরাকি মুজাহিদীন গ্রুপগুলোও দখলদার ডাকাত বাহিনী হুমকি-ধমিক উপেক্ষা করে প্রতিরোধ লড়াইয়ে দুর্বার গতি এনেছে। যদিও এজন্য তাদেরকে বহু ত্যাগ ও সীমাহীন কুরবানি পেশ করতে হয়েছে, তবুও দেখা যাচ্ছে লড়াইয়ের ফলাফল বিজয়ের দিকেই গড়াচ্ছে। অবশ্য এটা আক্ষরিক অর্থের বিজয় নয়; বরং দু-পক্ষের শক্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণে মুজাহিদদের যে সফলতা এই স্বল্প সময়ে অর্জিত হয়েছে, তাকে বিজয় না বলে অন্য কোনো শব্দে প্রকাশ করলে সুবিচার রক্ষিত হয় না। ইতিমধ্যে তারা সাতটি জেলা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এর মধ্যে ফালুজায় তারা পূর্ণ ইসলামী আইন বাস্তবায়নের চেষ্টায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে তারা দখলদার ও তাদের দোসরদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে, যা মার্কিনিদের জন্য এক কঠিন চপেটাঘাত বৈ নয়।

মুজাহিদীনকর্তৃক ফালুজায় ইসলামি শাসন কায়েমের সংবাদটি বিদ্যুতের মতো গোটা ইরাকে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত অন্যান্য মুজাহিদগণ এতে দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বাগদাদের ঈগল এই ঘটনায় এত বেশি খুশি হল যে, সংবাদটি শোনামাত্র ফালুজার মুজাহিদদের অভিনন্দন জানাতে নিজেই ফালুজা চলে এল। তাকে কাছে পেয়ে সেখানকার মুজাহিদগণও আনন্দিত হল।

ফালুজার মুজাহিদ নেতৃত্বের সুপ্রিম কাউন্সিল বাগদাদের ঈগলকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে বসল। বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য হল 'ইঙ্গ-মার্কিন বিদায় করো – খেলাফত রাষ্ট্র কায়েম করো'। বৈঠক সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ফালুজাকে একটি মডেল ইসলামি শহরে পরিণত করা হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শহরগুলোকেও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এনে সমগ্র ইরাককে একটি পূর্ণ সালতানাতে ইসলামিয়ায় রূপ দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত সকল মুজাহিদীন গ্রুপকে একতাবদ্ধ ও ঐকমত্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব পড়ে ঈগলের উপর। কেননা, এ কাজ যতটা ক্ষিপ্রতার সাথে করতে হবে, তাতে সে ছাড়া অন্যরা অপরগতা প্রকাশ করবে। দায়িত্বটা সেও সাদরে গ্রহণ করে নেয় এবং দায়িত্ব পালনের জন্য তৎক্ষণাৎ ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

♦ ♦ ♦

ঈগল তার নতুন মিশনের প্রথম কর্মস্থল হিসেবে রাজধানী বাগদাদকেই নির্ধারণ করল। কেননা, রাজধানী হল দেশের প্রাণকেন্দ্র। এখানকার গেরিলা গ্রুপগুলোকে ঐকমত্যে আনতে পারলে অন্যদেরকে এক পতাকাতলে আনা অধিকতর সহজ হবে। তাই ফালুজা থেকে বিদায় নিয়ে সে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হল। কিছুদূর যেতেই তার ফোন বেজে উঠল। সেট হাতে নিয়ে দেখল,

আগত কলের নম্বরটা অপরিচিত। সে খানিক চিন্তিত হল। ফোন রিসিভ করবে কিনা ভাবতে লাগল। ইতিমধ্যে ফোনের লাইন কেটে গেল। সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অপরিচিত নম্বর রিসিভ না করাই ভালো হয়েছে। কিন্তু-না, ফোন আবারও বেজে উঠল। এবার আর সে কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ফোন রিসিভ করল। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর। এতে ঈগলের সব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠ দূর হল।

'রুকাইয়া! তুমি কেমন আছ বোন!' ঈগল জিজ্ঞেস করল।

'ঈগল ভাইয়া! আজ অনেক দিন যাবত তোমাকে ফোন দিয়ে পাচ্ছি না। এখন পেলাম। সেজন্য আমি কেমন আছি তা জানতে হলে আজই তোমাকে আমাদের বাড়িতে আসতে হবে' – রুকাইয়া বলল – 'আমার সুখ হরণকারী পাখিটাকে বহু দিন পরে ধরতে পেরেছি। তুমি এসে একটুখানি তাকে দেখে যাও। তোমাকেও সে একটা পাখি এনে দেওয়ার ওয়াদা করেছে। জলদি এসো। দেরি করো না যেন।'

'রুকাইয়া! একা থাকতে-থাকতে তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি' – ঈগল হেসে হেসে বলল – 'তোমার কথা আমার কিছুই বুঝে আসছে না, কীসের সুখপাখি? কে সুখ হরণকারী? নাকি আবার যোদ্ধার জীবন ত্যাগ করে কবি-দার্শনিকের পাঠ গ্রহণ করছ?'

'ভাইয়া! আমি পাগল-কবি যা-ই হই, তুমি এসে দেখে যাও' – রুকাইয়া বলল – 'মোবাইলে আমি আর কিছুই বলব না।'

'ঠিক আছে বোনটি আমার! আজ রাতের মধ্যেই তোমাদের বাসায় আসব। জোর চেষ্টা করছি, বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা।' ঈগল কতকটা সান্ত্বনার সুরে বলল। সেই সাথে ফোনের লাইনটাও কেটে দিল।

ঈগল আজ সত্যিই তার কথা রাখতে পারল। সন্ধ্যা ৭টানাগাদ সে রুকাইয়াদের বাড়িতে এসে পৌঁছল। রুকাইয়া তখন রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সে এসে দরজা খুলে দিল।

'ঈগল ভাইয়া! তুমি, এসে গেছ? এস, এস; ভিতরে এস।' অত্যন্ত আনন্দের সাথে রুকাইয়া ঈগলকে স্বাগত জানাল। তার আনন্দ দেখে ঈগল অবাক হল। সে খানিকটা ভাবের দোলনায় দোল খেল; মোবাইলে রুকাইয়া বলেছিল সুখ হরণকারী পাখিকে ধরতে পেরেছে, আবার এখন বাস্তবিকভাবেও তাকে অত্যন্ত খুশী দেখা যাচ্ছে; ব্যাপার তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। আচ্ছা তার কাছেই জানা যাক বিষয়টা।

'এই যে পাগলী বোন আমার! তুমি সুখপাখি ধরলে কোত্থেকে?' ঘরে উঠে বসতে-বসতে ঈগল জানতে চাইল রুকাইয়ার কাছে – 'পাখিটা রেখেছ কোথায়? খাঁচা ভেঙে পালাবে না তো আবার? পোষ মানাতে পেরেছ কি?'

'ঈগলের বোন শিকার ধরলে তা পালায় কী করে বলো তো' – রুকাইয়া মৃদু হেসে বলল – 'পোষ না মেনে উপায় থাকে সেই শিকারের? থাকে না। তা এমনভাবে পোষ মানে যে, খাচার দুয়ার খুলে দিলেও উড়ে আবার ফিরে আসে। বিশ্বাস হয় না আমার কথা? ঐ যে দেখো আমার ছেড়ে দেওয়া পাখি ফিরে এসেছে।'

রুকাইয়া যখন ঈগলের সাথে কথা বলছিল, সে সময়ই সালমান বাইরে থেকে ঘরে ফিরে আসছিল। তাকে আসতে দেখেই রুকাইয়া শেষের কথাটি বলল। ঈগল বাইরে তাকিয়ে সালমানকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হল। আরে এ যে তাদের দুলাভাই সালমান কোরেশী। তাহলে সেই ফোন করা থেকে নিয়ে এতক্ষণ যাবত রুকাইয়া নাটকীয়তা করে এর কথাই বলেছে!

'রুকাইয়া! এবার বুঝতে পারলাম, তোমার এত পাগলামি কথাবার্তার মর্ম কী ছিল' – ঈগলও মুচকি হেসে বলল – 'তা দুলাভাই আগমনের সংবাদ দিতে এত নাটকীয়তার দরকার কী ছিল? ফোনে তার কথা বললে আমি কি আসতাম না? বরং তখন এ সংবাদ শোনালে আমি দুপুরের মধ্যেই চলে আসতাম।'

ইতিমধ্যে সালমান দরজার কাছে চলে এল। ঈগল দরজার কাছে এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। সালমান ঈগলকে দেখেই সালাম দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'সালমান ভাই, তুমি কেমন আছ? তোমাদের দেশের সবাই কেমন আছে?' ঘরে প্রবেশ করতে-করতে ঈগল জিজ্ঞেস করল।

'মহান আল্লাহ অশেষ মেহেরবানিতে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ' – সালমান বলল – 'আর বাড়ির সকলেও ভালোই আছে। তুমি কেমন আছ? তোমার কার্যক্রম কেমন চলছে?'

'আলহামদুলিল্লাহ; খুব ভালো আছি। আমাদের কার্যক্রম বর্তমানে অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুক্ষণ পরে বলছি। তার আগে তুমি আমার একটি কৌতূহল নিবৃত্ত করো তো' – ঈগল বলল – 'তোমার বাম পাটা-না অকেজো হয়ে গিয়েছিল? এখন দেখলাম, তুমি সুন্দরভাবেই হেঁটে এলে। অকেজো পা ঠিক হল কিভাবে?'

'ঈগল ভাই! এটা আমার প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ এক অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।' তারপর সালমান তার চিকিৎসার ঘটনা বিস্তারিত বিবৃত করল। সব শুনে ঈগল আল্লাহর প্রশংসা করল। সেই সাথে পাকিস্তানি জনগণের এহেন বদান্যতায় তাদের জন্য দু'আ করল এবং এই বলে অভিমত ব্যক্ত করল, 'এভাবে সকল বিষয়ে যদি মুসলিমরা একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসত, তবে মুসলিম বিশ্ব আজ এত সমস্যায় জর্জরিত থাকত না।...'

'মুসলমানরা আজ অন্ধ, বোবা ও বধিরের চেয়েও অধম হয়ে গেছে ভাইয়া! ঈগলের কথার রেশ ধরে রুমে প্রবেশ করতে-করতে রুকাইয়া বলল। তার হাতে

নাস্তার ট্রে। সেটি টেবিলের উপর রেখে সে পুনরায় বলল, 'নতুবা বোন ফাতেমার সেই করুণ পত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাওয়ার পরও তারা কীভাবে নির্জীব বসে থাকতে পারে? ইরাকি মুজাহিদগণ তাদের বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঐ চিঠি প্রাপ্ত হয়ে প্রায় একশজন মুজাহিদ আবু গারিব কারাগারে হামলা চালিয়েছিল।'

'কেন, বোন ফাতেমার চিঠিতে কী ছিল?' সালমান জানতে চাইল।

'আপনি ইন্টারনেটে ফাতেমার চিঠি দেখননি, যা তিনি আবু গারিব কারাগার থেকে ইরাকি মুজাহিদ, সেই সাথে গোটা উম্মাহর উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছিল?' রুকাইয়া জিজ্ঞেস করল।

'আসলে কী; আমি ইরাক থেকে যাওয়ার পর সিংহভাগ সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম' – সালমান বলল – 'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বই লেখার কাজে লেগে যাই, যে সম্বন্ধে গতকাল তোমাকে বলেছি। ইরাক যুদ্ধ সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ বই ছিল সেটি। লেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপিটা আমার শ্রদ্ধেয় প্রকাশক সমীপে জমা দিয়েই ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে চলে আসি। এজন্য ইন্টারনেটে প্রকাশিত কোনো বিষয়ের ব্যাপারে আমি অনবহিত ছিলাম। আমাকে বোন ফাতেমার চিঠি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দিবে কি?'

রুকাইয়া সালমানের আবদারের উত্তরে কোনো কথা বলল না। সে তার কাছে এসে তার মোবাইল ফোনটি চেয়ে নিল। তারপর ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে হতভাগা ইরাকি কন্যা ফাতেমার সেই হৃদয়বিদারক চিঠিখানা ডাউনলোড করে তার হাতে মোবাইলটি ফিরিয়ে দিল। আরবী হরফে ফাতেমার নিজহাতে লেখা চিঠিখানাই এখানে পোস্ট করা হয়েছে। চিঠির পাশাপাশি ছোট্ট করে ফাতেমার পরিচিতিও দেওয়া আছে নেটে।

ফাতেমা একজন ইরাকি মুক্তিযোদ্ধার বোন। মার্কিন সৈন্যরা ঐ মুজাহিদ ভাইকে আটক করার জন্য তাদের বাড়ি ঘেরাও করে। কিন্তু তাকে না পেয়ে শয়তানরা তার বোন ফাতেমাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তার উপর তারা ভয়াবহ পাশবিক নির্যাতন চালায়। তার চিঠির অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হল–

"মহান করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। বলুন! আল্লাহ এক। তিনি সবকিছুর একমাত্র মালিক। তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি, কাউকে জন্মও দেননি। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় কেউ নেই, কিছুই নেহ এবং কখনো কেউ তার সমকক্ষ হবে না। –সূরা আল ইখলাস।

প্রিয় ইরাকি মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা!

আমি শুরুতে সূরা ইখলাসের উদ্ধৃতি দিলাম। কারণ, এই সূরাটি আমার কাছে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরতে সবেচেয়ে ভালো বলে মনে হয়। মুমিনের অন্তরে এই সূরাটি দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে। হে আল্লাহর পথের

লড়াইকারী প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনাদের বলার আর কী আছে আমার। শুধু এতটুকু বলি, আমার মতো অসংখ্য ইরাকি বোনকে আটকে রাখা হয়েছে এবং মার্কিন সৈন্যরা তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আমাদের পেটে এখন মার্কিন সৈন্যরূপী পশুদের সন্তান।

প্রিয় ভাইয়েরা!

আমি আপনাদের ধর্ম সম্পর্কের বোন! আমাকে এক দিনে ৯বার শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়েছে। ধারণা করতে পারেন! আচ্ছা কল্পনা করুন তো, আপনার আপন বোনকে যদি এভাবে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হত, কেমন লাগত আপনার! আমার মতো ১৩টি মেয়ে রয়েছে কারাগারের এই প্রকোষ্ঠে। সকলেই অবিবাহিতা। মার্কিন পশুরা আমাদের শরীর থেকে পোশাক কেড়ে নিয়ে গেছে। তারা আমাদের পোশাক পরতে দেয় না। সকলের সামনেই তারা আমাদের শ্লীলতাহানি করে। এই হচ্ছে আমাদের এখনকার দিনলিপি।

এভাবে বেঁচে থাকা কারো কাম্য হতে পারে কি? আমাদের এখানকার একটি মেয়ে নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এক মার্কিন সৈন্য তাকে শ্লীলতাহানির পর তার বুক ও উরুতে প্রচণ্ড আঘাত করে। তাকে এমন অত্যাচার করা হয়, যা কল্পনাও করতে পারবেন না। এরপর মেয়েটি দেওয়ালের সাথে মাথা ঠুকে-ঠুকে আত্মহত্যা করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ্ও তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করি। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

আমরা ইরাকি মেয়েরা যা কখনো কল্পনা করতে পারিনি, অথচ আমরা সেই রকম ভয়াবহ নিষ্ঠুর নিপীড়ন, অপমান আর লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হয়েছি। এর চেয়ে মর্মান্তিক কিছু হতে পারে না। আর এই যন্ত্রণা কেউ কখনো ভাষায় প্রকাশ করতেও পারে না। কারাগারে প্রতি রাতেই আমাদের ওপর নির্মম নিপীড়ন চালানো হয়। মার্কিন সৈন্য নামধারী পশুগুলো এসেই আমাদের শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিঁড়ে-খাবলে খেতে চায় আমাদের। আমরা একটা রাতও পশুগুলোর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাই না। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আবু গারিব কারাগারে হামলা করুন! আমাদেরসহ তাদের ধ্বংস করুন! হত্যা করুন! আমাদের এখানে ফেলে রাখবেন না। অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরসহ তাদের ধুলোয় মিশিয়ে দিন। ট্যাংক আর জঙ্গী বিমানকে পরোয়া না করে ছুটে আসুন আবু গারিব কারাগারে! আমাদের প্রতি মায়া রাখবেন না প্লিজ! আমাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদেরসহ তাদের মেরে ফেলুন।

আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে আমাদের যে সতিত্ব রক্ষা করে চলি চিরদিন, সেই সতিত্ব আমরা এই মার্কিনি পশুদের হাতে খুইয়ে ফেলেছি। এখন

আর আমাদের বেঁচে থাকার কোনো সাধ নেই। আমরা যে কুরআনকে গলায় ঝুলিয়ে রাখি, সেই কুরআন তারা ছিঁড়ে ফেলছে। আমাদের চারপাশে তারা পবিত্র কুরআনের পাতা ছিঁড়ে রাখছে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

আমি আবারও অনুরোধ করছি, বারবার অনুরোধ করছি, তাদের হত্যা করুন! তাদের ধ্বংস করুন! আর আপনাদের হামলার ফলে আমরাও যদি নিহত হই, তাতেও শান্তি পাব। আমরা জাহান্নামের এই বিভীষিকা থেকে মৃত্যুর মাধ্যমে হলেও মুক্তি পেতে চাই। সাহায্য করুন! সাহায্য করুন!! সাহায্য করুন!!!'

চিঠিখানা পড়া শেষ হলে সালমান নিজেকে যেন অন্য কোনো জগতে আবিষ্কার করল। যেখানে সে প্রচণ্ড এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে আবু গারিবের জাহান্নামসম বন্দিশালায় হামলে পড়ছে। মার্কিনি সৈন্যদের আছড়িয়ে হত্যা করছি এবং দুঃখিনী ফাতেমাসহ অন্যান্য বন্দিনীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসছে। এদিকে তার চোখের পানিতে দাড়ি, বুক জামা সব ভিজে একাকার। এতক্ষণ সে তা খেয়ালই করেনি। নিজের অজান্তেই চোখের পানিতে বন্যা বয়ে গেছে।

'কেঁদে লাভ নেই সালমান ভাই!' – ঈগল বলল – 'আর এখন কাঁদার সময়ও নয়। এখন হলো প্রতিরোধ-প্রতিশোধের পালা। নাস্তাটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। জরুরি কাজ আছে। আমার সাথে তোমার যেতে হবে।

♦ ♦ ♦

মুজাহিদ নেতা ঈগল ঐক্যের কাজ জোরেশোরে চালিয়ে যেতে লাগল। সাথে সহযোগী হিসেবে নিল সালমানকে। তিন দিন তিন রাতের মধ্যে বাগদাদের সমস্ত মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে ঐক্যর পতাকাতলে নিয়ে আসতে পেরে তারা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। এবার অন্যান্য শহরে ঐক্যের এই সুবাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার পালা।

ঈগল সালমানকে নিয়ে পরবর্তী প্রোগ্রাম তৈরি করছিল। এরই মধ্যে রুকাইয়া এসে বাধ সাধল। সে বলল, 'আমি গতকাল সন্ধ্যায় নাঈমার আম্মিজানের সাথে কথা পাকাপাকি করে এসেছি। আজ রাতে ঈগল ভাইয়ের সাতে নাঈমার বিয়ের ক্ষণ ধার্য করা হয়েছে।'

'এ তুমি কী বলছ রুকাইয়া! এ রকম হঠাৎ করে বিয়ে হয় নাকি' – ঈগল বলল – 'আমার কাঁধে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব; তা তুমিও জান। সুতরাং তোমাদের এই সিদ্ধান্ত কিছু দিনের জন্যে স্থগিত রাখো।'

'ঈগল ভাই! সিদ্ধান্ত স্থগিত করার কোনো সুযোগ নাই' – সালমান বলল – 'রুকাইয়া যা করেছে, আমার অনুমতি নিয়েই করেছে। আমিই তাকে তোমার হবু শ্বশুরালয়ে পাঠিয়েছিলাম। কারণ, তোমার জীবনে একটির পর একটি

গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসতেই থাকবে। তাছাড়া বিবাহের কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে এই শুভ কাজটি আজকেই সম্পন্ন করা হবে। তুমি প্রস্তুতি নাও!'

'তাহলে ঘটনা এই! স্বামী-স্ত্রী মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছ।' ঈগল হাসতে-হাসতে বলল।

'আরে ভাই! ঈগলের পায়ে ফাঁদ লাগাতে জালটা কাউকে না কাউকে বুনতে তো হবেই' – সালমানও রসিকতা করে বলল – 'সেই বোনাটা না হয় আমরাই বুনলাম! সেজন্যে আমাদের দোষারোপ করে লাভ কী? বরং আমাদেরকে তোমার পুরস্কৃত করা উচিত।'

'ঠিক আছে ভাই তোমরা যথাসময়ে তোমাদের পুরস্কার পেয়ে যাবে।' ঈগল তাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে বলল।

আরো কিছু আলোচনা-পর্যালোচনার পর ঈগল বিবাহের প্রস্তাব মেনে নিল। তারা যখন সিদ্ধান্তে পৌছল, তখন বেলা ১২টা বাজে। রমজানের দিন তাই এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। অবশ্য বিবাহের আসল প্রস্তুতির কাজ কেনাকাটা করা রুকাইয়া তার বান্ধবী সালমার সহায়তায় আগে-ভাগেই করে রেখেছিল। তাই স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে খুব একটা বেগ পেতে হল না।

সন্ধ্যার প্রায় আধা ঘন্টা আগে বরপক্ষ কণের বাড়িতে পৌছল। মেজর আসাদুল্লাহ, সালমান ও ঈগলের একান্ত ঘনিষ্ঠ দুজন বন্ধুসহ পাঁচজন লোক বরের সাথে আগমন করল। কনের পিতা জাফর মূসা সাহেব মেহমানদের খোশ আমদেদ জানালেন। সেই সাথে ইফতারের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় তাদেরকে ইফতারের দস্তারখানে বসে যাওয়ার আহবান জানালেন। মেহমানরা নির্দেশনা অনুযায়ী দস্তখানে বসে গেলেন। দস্তরখান সাজানো হয়েছে ইরাকি নানান পদের ঐতিহ্যবাহী ইফতারসামগ্রী দিয়ে। যেমন– কুব্বা বুরগাল, কুব্বা হালেব, দোলমা, ভেড়ার কাবাব, বিরিয়ানি, নাওয়াশিফ, থারিড, হালাওয়াত শারিয়াহ, ক্লেইচা, আপেল, আঙুর, কমলা, ডালিম, খেজুর-খুরমা, নাশপতি, পটেটো চপ, ডিমের চপ, ফালুদা ইত্যাদি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার।

খাবার-দাবারে বাগদাদের সুনাম দুনিয়াজোড়া। যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে যদিও জৌলুস এখন আর বিদ্যমান নেই, তবু পবিত্র রমজান কিছুটা ঐতিহ্য ঠিকই ফিরিয়ে এনেছে। তার উপর বিয়ে বলে কথা! জনাব জাফর মূসা সাহেব তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে দেশের বেশকটি শহরের বাজার ঘেটে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো ক্রয় করেছেন।

পবিত্র রমজানে ইরাকিদের খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা বৈচিত্র থাকে। মূলত ভারী খাবারটা তারা ইফতারেই খায়। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই আজকের বরপক্ষের মেহমানদের ইফতারি পরিবেশন করা হয়েছে। ময়দা, চাল ও আলু দিয়ে

বানানো কুব্বা বুরগাল, কুব্বা হালেব ও পটেটো চপ শারীরিক অনাহারের কষ্টকে লাঘব করে থাকে। কয়েক পদের সবজি দিয়ে বানানো 'দোলমা' ও গোশত ও বেগুন দিয়ে বানানো 'শেখ মাহসি' দৈনন্দিন খাবার হিসেবে বেশ উপাদেয় খাবার। মুরগির গোশত দিয়ে বানানো 'নাওয়াশিফ' ও 'থারিড' সেই সাথে ভেড়ার কাবাব ও বিরিয়ানি ইফতারির খাবারকে বাস্তবিকই খুব ভারী করে তুলেছে। তবে বাগদাদের মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ইফতারির পদ হচ্ছে 'হালাওয়াত শারিয়াহ'। মিষ্টি ও নুডলস দিয়ে বানানো সুস্বাদু এই খাবার যে কাউকে বশ করে ফেলতে পারবে মুহূর্তের মধ্যে। ইরাকের বাইরে এ খাবারটি 'সুইট অ্যান্ড গোল্ডেন ভার্মিসেলি নুডলস' নামে পরিচিত। এর সাথে আরও উপস্থিত আছে ইরাকের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি 'ক্লেইচা'। এটা কেবল ইফতারির খাবার হিসেবে নয়, যেকোন উৎসব উপলক্ষ্যে ক্লেইচা প্রধান খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। আজকের দস্তরখানেও এর স্বগৌরব পরিবেশনা মেহমানদের নজর কেড়েছে। বিশেষ করে সালমান কোরেশীর। সে খাবার শেষে মন্তব্য করল, 'হালাওয়াত শারিয়াহ আর ক্লেইচা'র মতো সুস্বাদু মিষ্টান্ন আমি আর কোথাও কখনও খাইনি।'

ইফতারপর্ব শেষ করে সবাই ঘরেই জামাতের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করে নিল। নামায শেষে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হল। মহরে ফাতেমিকে দেনমোহর ধার্য করে ইজাব-কবুলের কাজ শেষ করা হল। উপস্থিত সবাই বর-কনের জন্যে প্রাণ খুলে দু'আ করলেন। এবার বিদায়ের পালা। এ নিয়ে হাল্কা মতভেদ দেখা দিল। বরপক্ষ চাচ্ছে রাতেই বিদায় নিতে আর কনেপক্ষ চাচ্ছে পরের দিন সকালে বিদায় দিতে, যাতে সাহরির আপ্যায়নটা করাতে পারে। অবশেষে সবাই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, পরদিন সকালবেলাই বউ নিয়ে যাওয়া হবে। সালমান ফোন করে রুকাইয়াকে বিষয়টি জানিয়ে দিল। এরপর সবাই তারাবীহ নামাযের প্রস্তুতি শুরু করল।

♦ ♦ ♦

পৃথিবীর প্রতিজন মানুষই সুখী হতে চায়। কিন্তু সুখ-সারথী সবার হাতে ধরা দেয় না। তার মধ্যে যারা ঈমান নিয়ে চলে; ঈমানের উপর মরতে চায়, দুনিয়ার জীবনে সুখপাখি তাদের থেকে যোজন-যোজন দূরে অবস্থান করে। এটাই বিধাতার নিয়ম। এজন্যেই প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা আর বেঈমানদের জন্য জান্নাত।' সেজন্যেই দেখা যায়, দুনিয়াতে যার ঈমান যত পোক্ত, তার উপর মুছিবত-কষ্ট বেশি আসে।

কোরআন-হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এ জগতে সবচেয়ে বেশি পাকাপোক্ত ঈমানের অধিকারী হলেন আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ। সুতরাং তাদের ওপর বালা-মুছিবত বেশি আসবে, ঈমানের পরীক্ষা বেশি হবে এটা বিচিত্র কিছু নয়।

বাগদাদের ঈগলরাও আল্লাহর পথের সৈনিক বিধায় বিপদ-মুছিবত-দুঃসংবাদ তাদের নিত্য সাথী হয়েই থাকছে।

এতদিন ধরে ঈগল নিজের বিবাহের জন্যে সময়ই বের করতে পারেনি। আজ সালমান-রুকাইয়ার পীড়াপীড়িতে সময় না থাকা সত্ত্বেও রাজি হলো এবং বিবাহ করল। কিন্তু বিবাহের বাসর পরিপূর্ণ করা মনে হয় আল্লাহ তার ভাগ্যে লিখেননি। মনের সুখে সে যখন নববধূর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমাচ্ছিল, তখন তার মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। ফোন দিয়েছেন ফালুজা শহরের মুজাহিদ নেতা। সে বুঝে ফেলল, তাজুল ফজল আনসারী রাত তিনটায় জরুরি না হলে কল দেননি। তাই নববধূর নিকট থেকে উঠে সে রুমের বাইরে চলে এল। ফোন রিসিভ করতেই ভেসে এল আনসারীর কণ্ঠ– ঈগল ভাই! তুমি কোথায়? পারলে এখনই ফালুজায় চলে এসো। মার্কিনিরা আমাদের উপর চতুর্মুখী হামলা শুরু করেছে। এমতাবস্থায় তোমার পরামর্শ ও সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।'

'আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের ওখানে পৌঁছার চেষ্টা করছি। আপনারা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে লড়াই চালিয়ে যান। আল্লাহই উত্তম সহায়তাকারী!' এই বলে ঈগলে ফোন রেখে দিল।

তাজুল ফজল আনসারীর ফোন কেটে দিয়ে ঈগল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল, এই অবস্থায় সে কী করবে। একদিকে নববধূ, অন্য দিকে রণাঙ্গনের ডাক। সহসা তার শহীদকুল শিরোমণি হানযালা (রা.)-এর কথা মনে পড়ে গেল। ব্যস! দিল থেকে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা দূর করে ফেলল। রুমে প্রবেশ করে সে তার বিশেষ যুদ্ধ পোশাকটি পড়ে নিল, যা খুলে রেখে সে বিবাহের পোশাক পরেছিল। পূর্ণ তৈরী হয়ে সে রুম থেকে বের হবার মুহূর্তেই পিছন থেকে কেমন একটা টান অনুভব করল। এটা কিসের টান? এমন তো পূর্বে কখনও হয়নি! আজ এমন হচ্ছে কেন?

ঈগল ফালুজার দুঃসংবাদ শোনার পর থেকে কেমন আনমনা হয়ে গেল। কারণ, ফালুজাকে ঘিরে তারা নতুন ইরাক গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। তা বুঝি আর সম্ভব হয়ে উঠবে না!। ভারাক্রান্ত মনে সে প্রথমে কাউকে না জানিয়েই ফালুজার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চেয়েছিল। এমনকি তার নববধূকেও কিছু না বলার চিন্তা করেছিল। বলতে চেয়েছিল শুধু সালমানকে। সেজন্য ফোন করে তাকে নিচ তলায় গেটের কাছে আসতেও বলেছে। কিন্তু বের হবার সময় অনুভব করল, এক অদৃশ্য মায়ার সুতোয় বেঁধে বধূ তাকে পিছনের দিকে টানছে। তার কাছে না বলে যাওয়া ঠিক হবে না। এই ভেবে সে বিছানার দিকে এগুলো। মশারিটা তুলে সে চমকে উঠল। বধূ বিছানায় নেই! কোথায় গেল সে?

ঈগল প্রথম যখন ফোন নিয়ে বেরিয়েছিল, নাঈমা তখনই জেগে গিয়েছিল এবং ঈগলের পিছনে-পিছনে রুমের দরজা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যেখান

থেকে ঈগলের সব কথা শোনা যায়। অবশ্য সে তার কথা শোনার জন্য আসেনি। সে এসেছে তার স্বামীর কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যা হলো কিনা সেটা দেখার জন্যে। কিন্তু মোবাইলের কথোপকথন শুনে সেও চিন্তায় পড়ে গেল। ইতিমধ্যে ঈগল রুমে প্রবেশ করতে গেলে সে দরজার আড়ালে লুকাল। তার ভাবনা, সেও ঈগলের সাথে ময়দানে যাবে। তবে সে ভালোভাবেই জানে, ঈগল তার এই আব্দার কিছুতেই রাখবে না। অন্য সময় হলে হয়ত জোর করে রাজি করানো যেত। আজ বাসর রাত, আজ তা হবে না। কী করা যায়, সে ভাবতে লাগল। অবশেষে উপায় একটা পেল। তাহলো, ঈগল বেরুনোর আগে গিয়ে তার গাড়িতে লুকিয়ে থাকা। যেই ভাবা সেই কাজ।

ঈগল যখন যুদ্ধ পোশাক পড়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, নাঈমা সেই ফাঁকে নিচতলায় চলে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে পড়ল মুছিবতে। সালমান গেটের কাছে দাঁড়ানো। যদিও সে তাকে চিনে না, কিন্তু ঈগল ফোনে কাউকে গেটে থাকতে বলেছিল, সেটা সে শুনেছিল। বেচারীর এখন হয়েছে উভয় সংকট। উপরে ফিরে গেলে ঈগলের হাতে ধরা পড়বে আর গাড়ির গ্যারেজে গেলে সালমান দেখে ফেলবে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে অন্য কোনো উপায় চিন্তা করতে লাগল। সহসা পিছন থেকে এসে কে যেন তার হাতটা চেপে ধরল। ভয় পেলেও সে কোনো শব্দ করল না। হাত ধরা ব্যক্তিকে দেখে সে একেবারে চুপসে গেল।

'তুমি এখানে কেন নাঈমা?' – ঈগল জিজ্ঞেস করল – 'যাচ্ছিলে কোথায়?'

আপনি যেখানে যাচ্ছেন, আমিও সেখানে যাচ্ছিলাম!' নাঈমা মাথাটা অবনত রেখে আস্তে করে বলল। উল্লেখ্য, নাঈমা বিবাহের পূর্বে ঈগলকে 'তুমি' সম্বোধন করত। এখন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধ দেখাতে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছে।

'তার মানে! তোমার কথা আমি ঠিক বুঝলাম না' – বধূর কথায় ঈগল বেশ অবাক হয়ে বলল – 'আমি কোথাও যাচ্ছি সেটা তোমায় কে বলেছে? জানলে কী করে তুমি?'

'মনের খবর না জানলে কি আর মনের মানুষ হওয়া যায়!' মৃদু হেসে নাঈমা অবনত মস্তকেই বলল।

বধূর এবারের কথায় ঈগলের সমস্ত রাগ ঝরে গেল। তাকে বুকের সাথে আগলিয়ে খানিকটা আদর করে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলল সে কোথায় যাচ্ছে, কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, সেখানকার পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, নারীদের সেখানে নেওয়া কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।

ঈগলের সব কথা শুনে নাঈমা তার সাথে যাওয়ার আব্দার প্রত্যাহার করল। তবে সাহরি না খেয়ে সে যেতে পারবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল।

'ঠিক আছে প্রিয়া! তুমি খাবার তৈরি করো। আমি নিচতলা থেকে আসছি' – ঈগল বলল – 'তোমাকে খুব দ্রুত করতে হবে।'

নাঈমাকে খাবার রেডী করতে বলে ঈগল নিচতলায় সালমানের কাছে এল এবং তাকে সবকিছু খুলে বলল। ফালুজার বর্তমান পরিস্থিতির কথা শুনে সেও যাওয়ার জিদ ধরল। সালমানকে সে আর না করতে পারল না। তাই তাকেও সাহরি খেতে উপরে নিয়ে এল। নাঈমাকে বলল পাশের রুমে চলে যেতে।

ঈগল সালমানকে নিয়ে সাহরি খেতে বসল। ইরাকিরা সাধারণত সাহরিতে অল্প খায়। কিন্তু নাঈমা একা ঈগলের জন্যে যে পরিমাণ খাবার দিয়েছে, তাতে সালমানের মতো মেহমান আরো তিনজন হলেও পরিবেশিত খাবারই তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। রুটি আর মাখনের সাথে তিন-চার পদের শরবত। আরো দিয়েছে শেখ মাহসী, নাওয়াশিফ, বিরিয়ানি ও পুডিং। ঈগল মাখন দিয়ে দুটা রুটি খেল। সেই সাথে কয়েক টুকরা শশা খেল। তবে শরবত আর পানি পান করল প্রচুর পরিমাণ। সালমান মাখন দিয়ে একটা রুটি, একটা শেখ মাহসী, একটু বেশি পরিমাণ পুডিং খেল। শরবত-পানিও পান করল। তবে ঈগলের চেয়ে কম।

♦ ♦ ♦

ইরাকি মুক্তিসেনা বীর মুজাহিদগণ ফালুজা নগরীকে ঘিরে এক নতুন ইরাক গঠনের মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। অবশ্য তাদের এই পরিকল্পনাকে 'নতুন' বললে ভুলই বলা হবে। কেননা, তাঁরা চাচ্ছেন খেলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে, যা ছিল ইরাকের আদি ঐতিহ্য। ঐতিহাসিকদের বিচারালয়ে প্রশ্ন তোলা হোক, সভ্যতার আদিমাতা মেনোটেমীয় সভ্যতা তার শুরুলগ্ন থেকে আজ অবধি 'খেলাফত ব্যবস্থার' চেয়ে উন্নত, সুসভ্য কোনো শাসনব্যবস্থা সে প্রত্যক্ষ করেছে কিনা! একশ ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, এর উত্তর আসবে নেতিবাচক। সুতরাং ব্যাপার যদি তা-ই হয়, তাহলে মুজাহিদদের এই উদ্যোগ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে কেন?

হ্যাঁ; বর্তমান আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারী, বাস্তবিকভাবে চরম অসভ্য সম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মুজাহিদদের এই শ্বাশত উদ্যোগ অপরাধ হিসেবে গণ্য। এজন্য তারা মুজাহিদদের এ উদ্যেগ নস্যাৎ করার লক্ষ্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। প্রাথমিকভাবে তারা গোয়েন্দা ও গাদ্দার চক্রের সহায়তায় মুজাহিদদের বিভিন্ন রকম লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি ও হুমকি-ধমকি দিয়ে দেখেছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই যখন কার্যোদ্ধার হচ্ছে না, উপরন্তু মুজাহিদগণ একদিন তাদের পরীক্ষিত প্রায় দুই ডজন গাদ্দারকে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তখন তারা ফালুজায় সামরিক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এখানে এই ভেবে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না যে, মুজাহিদরা গাদ্দারদের শাস্তি না দিলে মার্কিনিরা ফালুজায় হয়তবা সর্বাত্মক হামলা করত না। এটা ভুল ধারণা হবে। কেননা, গাদ্দারদের শাস্তি সব দেশে সব সময় এ ধরনেরই হয়ে

থাকে। এটা আন্তর্জাতিক আইনেও অনুমোদিত। মার্কিনিরা মূলত একটা সুযোগের সন্ধান করছিল। তাদের দখলদারিত্বের এই পৌনে দুই বছরে তারা মুজাহিদদের হাতে যে পরিমাণ পর্যুদস্ত হয়ে চলছিল, তাতে তারা ভীষণ বেকায়দায় পড়েছিল। তাই একটা সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা ছিল সময়ের ব্যাপার। এজন্যে ফালুজার গাদ্দার হত্যার ব্যাপারটিকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে, প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে পুরো নগরটি অবরুদ্ধ রেখে তারা হামলা পরিকল্পনা করে চলছে।

এএফপি/এপি-র সূত্রে পাওয়া সংবাদ থেকে জানা যায়, ইরাকে দখলদারবিরোধী লড়াইয়ের প্রতীক ফালুজায় সর্বাত্মক লড়াইয়ের সূচনা করে (প্রায় দুই সপ্তাহ পর) মার্কিন সৈন্যরা শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে একটি হাসপাতাল দখল করে নিলেও তারা সামনে এগুনোর সাহাস পাচ্ছে না। তারা আশঙ্কা করছে, ফালুজায় এমন ভয়ংকর নগরযুদ্ধ হবে, যা ভিয়েতনাম ও কোরীয় যুদ্ধের ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। দখলদার সৈন্যরা উভচর যানে করে ফোরাত নদী অতিক্রম করতে চাইছে। কিন্তু ফোরাত অতিক্রমে তাদের প্রতিটি চেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। শহরের অভ্যন্তর থেকে মুজাহিদদের মেশিনগান গর্জে ওঠার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কালো মুখোশপরিহিত ও সারা শরীর কালো পোশাকে আবৃত মুজাহিদরা মার্কিন অবস্থান লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করছে। প্রতিটি গোলা নিক্ষেপের সময় মুজাহিদরা তাকবিরধ্বনি দিচ্ছে। শহরে মার্কিন বিমান হামলা শুরু হলেই মসজিদের শহর ফালুজার মসজিদে-মসজিদে আযান শুরু হচ্ছে।

মার্কিন গোয়েন্দাসূত্রের খবরে বলা হয়, ফালুজায় ১ থেকে ৬ হাজার মুজাহিদ শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। অথচ সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বিরাট সরবরাহ লাইনের সমর্থনপুষ্ট বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ২০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী এই মুষ্টিমেয় মুজাহিদদের ভয়ে আড়ষ্ট। তারা বলছে, শহর দখল করবে। কিন্তু তারা শহরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। তারা চাইছে নিজেদের জান বাঁচিয়ে হুমকি দিয়ে বাজিমাৎ করবে। তবে তাদের এই কৌশল ব্যর্থ হচ্ছে। ফালুজা দখলে সর্বাত্মক লড়াই ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মুখরক্ষার জন্য লড়াইয়ের সূচনা হয়েছে মাত্র। কিন্তু ফালুজা দখলে মার্কিনিদের যে মূল্য দিতে হবে, তা হবে অবিশ্বাস্য। ইতিমধ্যে মার্কিন কমান্ডাররা সৈন্যদের সতর্ক করে দিয়েছে, লড়াই এখনো শুরু হয়নি। শহরের কেন্দ্রস্থলে হবে মূল লড়াই। মার্কিন সার্জেন্ট মেজর কার্লটন ডব্লিউ কেন্ট সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছে, আসন্ন লড়াই কোরিয়ার ইনচোন, আয়োজিমা অথবা উত্তর ভিয়েতনামের হিউসিটির লড়াইয়ের চেয়ে ভিন্নতর কোনো লড়াই হবে না।

এদিকে তাঁবেদার ইরাকি প্রধানমন্ত্রী ইয়াদ আলাভী দেশে ৬০ দিনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পর সূর্যাস্ত যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফালুজা অপারেশন শুরু হয়। জরুরি অবস্থার আওতায় ফালুজায় সকল যানবাহন ও ১৫ থেকে ৫৫ বছর বয়স্ক সকল লোকজনের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে ফালুজায় হানা দিতে না দিতেই ২ মেরিন সৈন্য নিহত হয়েছে। ফালুজা অপারেশনে এটাই প্রথম মার্কিন সৈন্য হতাহতের ঘটনা। মুজাহিদদের পাশাপাশি শহরের জনগণও প্রতিরক্ষায় যোগ দিয়েছে। তারা মার্কিন হামলা প্রতিহত করার লক্ষ্যে রাস্তায়-রাস্তায় বালির বস্তা ফেলছে এবং সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ৩ লাখ লোকের শহর থেকে ইতিমধ্যেই দুই-তৃতিয়াংশ লোক যে দিকে পারে, সে দিকে চলে গেছে। তবে এখনো শহরে ১ লাখ ৬ হাজারের মতো লোক নিজেদের ঘর-বাড়িতে অবস্থান করছে। মুজাহিদরা এদেরও শহর থেকে চলে যাবার অনুরোধ জানিয়েছে।

ঈগল ও সালমান যখন ফালুজার উপকণ্ঠে পৌছল, তখন বহুদূর থেকেই গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেল। শহরে প্রবেশের সব কটি পথেই দেখতে পেল মার্কিনিদের কড়া প্রহরা। শহরে প্রবেশের উপায় নিয়ে তাই তারা চিন্তায় পড়ে গেল। তারা মার্কিন বাহিনী থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নগরীর বিভিন্ন অংশের প্রবেশপথগুলিতে সুযোগের সন্ধান করল। এদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। অবশেষে একটা সুযোগ মিলে গেল। এক সংকীর্ণ গলি পথ দিয়ে তিনজন লোক দৌড়ে আসছে। একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। তাদের পিছনে দুজন মার্কিন সৈন্য তাড়া করছে। ঈগল সালমানকে নিয়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকাল। লোক তিনজন ও সৈনিক দুজন যখন তাদেরকে অতিক্রম করে গেল, ঈগল তখন পিছন থেকে পরপর দুটি গুলি করল। দুটি গুলিই লক্ষ্যভেদ করল। সৈনিক দুজন লুটিয়ে পড়ল। পলায়মান লোক তিনজন তা টেরও পেল না। কারণ, ঈগলের অস্ত্র ছিল শব্দবিহীন। তারা প্রাণপণে দৌড়াতেই থাকল।

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম আকাশে লালিমা ছড়িয়ে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করল। প্রকৃতি জুড়ে নেমে এল রাতের নিস্তব্ধতা। ঈগল-সালমান পাথরের আড়ালে বসে সাথে থাকা পানি ও আহার্য দিয়ে ঈফতার করে নিল। ইফতারের পর সেখানেই একটা রুমাল বিছিয়ে মাগরিবের নামায পড়ে নিল। নামায শেষে সেই সংকীর্ণ গলিপথে ফালুজা নগরীতে প্রবেশ করল।

ফালুজায় প্রবেশ করে ঈগল ও সালমান সরাসরি মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলে গেল। তারা দেখল, হামলা চালিয়ে কার্যালয়টি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা মুজাহিদদের বর্তমান কার্যালয়ের তালাশে ছুটল। পুরো শহরজুড়ে গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ আর জঙ্গি বিমানের বিকট শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। সারা শহরে মুজাহিদদের টহল,

এ্যাম্বুলেন্স, রেডক্রিসেন্টের গাড়ি টহল দিয়ে ফিরছে। মুজাহিদগণ বিভিন্ন পয়েন্টে লড়াই অব্যাহত রেখেছেন। ঈগল একটি মুজাহিদ টহলযান থামিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে মুজাহিদ কার্যালয়ের ঠিকানা চাইল। পরিচয় পেয়ে টহলরত মুজাহিদরা তাদেরকে গাড়িতে তুলে নিল। তারপর সোজা নিয়ে মুজাহিদদের বর্তমান কার্যালয়ের সম্মুখে থামিয়ে দিল।

মুজাহিদ কার্যালয়ে প্রবেশ করে ঈগল তাজুল ফজল আনসারীর সাথে সাক্ষাত করল। তিনি ঈগলকে এই বিপদ মুহূর্তে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরে আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। ঈগল তার সাথে সালমানের পরিচয় করিয়ে দিল। তাকেও তিনি বুকে জড়িয়ে নিলেন। তারপর অন্যান্য মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে ডেকে তাৎক্ষণিক এক মতবিনিময় সভায় বসলেন। যুদ্ধের কৌশল, শহর প্রতিরক্ষা ও বাহিরের সহায়তার বিষয়গুলো নিয়ে বৈঠকে চুলচেরা বিশ্লেষণ হল। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে বৈঠক এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিল, যা যুদ্ধের গতিধারা সম্পর্ণরূপে পাল্টে দিতে পারে।

'ঈগল ভাই! এজন্যই আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আল্লাহ তোমাকে যুদ্ধবিষয়ক যে জ্ঞান দান করেছেন, তাতে তোমাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ফখর করতে পারবে। আর এই আমাদের বিদেশি মেহমান সালমান ভাইয়ের পরামর্শ দ্বারাও আজ আমরা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তাকেও আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে তার কাছে আবেদন রাখছি, যেহেতু তিনি সাংবাদিক তাই যতক্ষণ তিনি আমাদের সাথে আছেন, ততক্ষণ আমাদের মিডিয়া কভারেজ সাইটটি তিনি পরিচালনা করবেন। কারণ, এই দায়িত্বে যিনি ছিলেন, তিনি গতকাল শহীদ হয়েছেন।'

সভা শেষে ঈগল ও সালমানকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত কথাগুলো বললেন ফালুজার মুজাহিদ প্রধান। তাঁর আহ্বানে সালমান সানন্দে সাড়া দিল। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করল। সেজন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। এমন একটি কঠিন দায়িত্বে অবলীলায় রাজি হয়ে যাওয়ায় ঈগলও তাকে সাধুবাদ জানাল।

ইরাকে প্রতিরোধ লড়াইয়ের দুর্গ পশ্চিমাঞ্চলীয় ফালুজা শহরে বিগত ১১ দিনব্যাপী মার্কিন অভিযানে দখলদারদের ক্ষয়ক্ষতির একটি বিবরণ পাওয়া গেছে। এ বিররণ প্রকাশ করেছে ফালুজার মুজাহিদীন শূরাকর্তৃক নিয়োজিত মিডিয়া কভারেজ ম্যান পাকিস্তানি সাংবাদিক সালমান কোরেশী। রয়টার্স, এএফপি, এপিসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় সরবরাহকৃত উক্ত বিবরণীতে বলা হয়েছে, এ শহরে মুজাহিদরা দুটি মার্কিন এফ-১৬ জঙ্গী বিমান, ১১টি হেলিকপ্টার, ৫টি গোয়েন্দা বিমান ও ৬০ জন মার্কিন সৈন্যসহ একটি চিনুক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছে। বিবরণীতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে,

মুজাহিদরা ১১টি এ্যাবরামস ট্যাংক, ৯টি সাঁজোয়াযান ও ১৩টি হামভি সামরিকযান ধ্বংস করেছে। মুজাহিদদের সঙ্গে লড়াইয়ে ৪শ মার্কিন ও তাদের দোসর ১৪০ ইরাকি সৈন্যও নিহত হয়। এছাড়া ১২৬ মার্কিন, ১২৩ তাঁবেদার ইরাকি ও ১৫ জন বৃটিশ সৈন্যকে বন্দি করা হয়। ১৮-১১-২০০৪ ফালুজা মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে মার্কিন বাহিনী তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুব নগণ্য বলে দাবি করেছে। ইরাকে মার্কিন মেরিন সৈন্যদের শীর্ষ কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জন স্যাটলার দাবি করেছেন, উল্লেখিত সময়ে ফালুজায় ৫১ জন সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে ৪শ ২৫ জন সৈন্য। বস্তুত জনের এ দাবি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা বৈ কিছু নয়।

♦ ♦ ♦

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কারণে অন্যান্য দেশ তাকে ভয় পায়। যে কারণে তাকে সবাই সমীহ করে চলে। কিন্তু বাস্তবে সবাই তাকে ঘৃণা করে। মার্কিনিরা প্রযুক্তি বিদ্যায় যে পরিমাণ সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে, তার সিকি পরিমাণও যদি তারা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করত, তাহলে বিশ্ববাসীর আন্তরিক ভালোবাসা সে এমনিতেই পেয়ে যেত। কিন্তু সেদিকে তারা বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে নিত্যনতুন মারণাস্ত্র তৈরি করছে মানুষ হত্যার জন্য। এই যে তার সাম্প্রতিককালের সর্বশেষ আবিষ্কৃত মানুষ মারার অস্ত্র 'হিটবোমা', যার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য ইরাকের নিরাপরাধ মানুষকে ভিকটিম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

আমেরিকা যখন দেখল, ফালুজার গুটিকতক মুজাহিদকে দমন করার জন্য তার ২০ হাজারের অধিক সৈন্য এবং অত্যাধুনিক সব টেকনোলজি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, তখন সে প্রমাদ গুণতে শুরু করল। অভিযান পরিচালনাকারী চিফ কমান্ডারের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। কোনো ক্যালকুলেশনেই সে হিসাব মিলাতে পারছে না। অভিযানের ফলাফল নিয়ে সে যতই ভাবে, ততই তার মাথা খারাপ হয়। সে ভেবে কূল পায় না, সবকিছু তাদের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও এমনটা কেন হল।

অবশেষে সব ভাবাভাবি বাদ দিয়ে অভিযান পরিচালক সকল নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-ভদ্রতা এবং আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে ফালুজায় পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করল। আর ইরাকে নিযুক্ত মার্টিন প্রশাসন আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধকে দুপায়ে দলে এই অমানবিক নীতিটাকে অনুমোদন দিয়ে দিল।

আচ্ছা এবার জানা যাক, এই কুৎসিত নীতিটার ফলে ফালুজার ভাগ্যে কী ঘটল। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী, 'যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায়

পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়েই প্রেসিডেন্ট বুশের চরম আস্ফালন চলছে এখন ইরাকের ফালুজা নগরীতে। পুরো ইরাক হাতের মুঠোয় ভরে সেখানে স্বাধীনচেতা মানুষের প্রতিরোধ-সংগ্রাম ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করে ফালুজার নিরীহ লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতনের ফল কতটুকু কাজে আসবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। মার্কিন বাহিনী বর্তমানে ইরাকি যোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করতে ফালুজা নগরীকে অবরুদ্ধ করে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত। মরণপণ লড়াইয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধারাও মার্কিন সামরিক বাহিনীকে পাল্টা আঘাতে পর্যুদস্ত করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। আকাশ ও স্থলপথের যৌথ আগ্রাসী হামলায় ফালুজার রাস্তা এখন জনশূন্য হয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আগ্রাসনের সময় কাবুল নগরীকে যেভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবার ফালুজাকেও তেমনভাবে বিধ্বস্ত করা হচ্ছে। এমনকি সাংবাদিকরাও মার্কিন বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাচ্ছে না।

নয়া বুশ প্রশাসনের নির্দেশে মার্কিন সৈন্যদের চোখে এখন শুধু হত্যার নেশা। এমন এক ভয়াবহ দানবীয় পরিস্থিতিতে বিবিসির পক্ষ থেকে ফালুজার সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ আতঙ্কের দিন যাপন এবং সেখানে কী ঘটছে, তা জানতে চাওয়া হয়। হামিদ ফ্লেওয়া ফালুজার একজন আইনজীবী। তিনি জানান, শহরের সবচেয়ে গণহত্যা-কবলিত এলাকায় সারারাত ভয়াবহ গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এবং তা সকাল পর্যন্ত চলে। রাস্তাগুলোতে অসংখ্য লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিহতদের অধিকাংশ পরিবারকে জোরপূর্বক তাদের বাড়ির উঠোনে কিংবা বাগানে লাশ পুঁতে ফেলতে বাধ্য করা হয়।

হামিদ ফ্লেওয়া বলেন, তিনি অনেক বাড়ির আঙিনায় সারিবদ্ধ লাশ দেখতে পান। বিবিসিকে তিনি জানান, তাদের এলাকাটিতে এখন কারবালার হাহাকার। তাদের পরিবারে এখন এক বিন্দু পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই। যে পরিমাণ খাদ্য ছিল, তাও প্রায় শেষ। নগরে এখন আর কোনো খাদ্য সরবরাহ আসার উপায় নেই। ফালুজা অবরুদ্ধ। বাঁচার কোনো আশা নেই...।

যুদ্ধবিষয়ক আইনকে সরাসরি পদদলিত করে ফালুজায় আমেরিকা সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করেছে। অন্যান্য অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পাশাপাশি তারা নাপাম বোমাও ব্যবহার করেছে। আমেরিকা স্বীকার না করলেও এই অভিযোগ সত্য ও প্রমাণিত। নাপাম বোমার শিকার ফালুজার জনগণ আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে তাদের জখম দেখিয়েছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমেরিকার এই বে-আইনি কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফালুজা যুদ্ধে নাপাম বোমা ব্যবহারের সংবাদ যখন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন আমেরিকা সেই ওয়েবসাইটগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যেগুলো এসব সংবাদ ও তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। শেষ পর্যন্ত মধ্যম মানের গুটিকতক আরব মিডিয়া ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে এই সংবাদ প্রচারিত হতে পারেনি।

ফালুজায় অবস্থানকারী সালমান মুজাহিদদের মিডিয়া মুখপাত্র হিসেবে নগরীর সর্বত্র বিচরণ করছে সব রকম ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি ফুলে-ফেঁপে খুবই স্ফীত হয়ে উঠেছে। সে বিভিন্ন মিডিয়ায় সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। তাতে আমেরিকার নিষিদ্ধ বোমা ব্যবহারের চিত্রটি পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। উক্ত প্রতিবেদনে সালমান একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়েছে এবং সে নিজেও দেখেছে, মার্কিনিরা যুদ্ধবিমান থেকে এমন এক ধরনের বোমা নিক্ষেপ করে, যেগুলো মাটিতে এসে পড়ার পর খুঁটির রূপ ধারণ করে উপরের দিকে উঠে যায়। তারপর তার মধ্যে থেকে ধূলি ও ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে আসে। সেই মেঘের ভেতর থেকে হঠাৎ করে এমন সব তারকা বেরিয়ে আসে, যার পেছনে লম্বা লেজের মত ধোঁয়া ও শিখা বের হতে থাকে। এই তারকা যেখানেই গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, সেখানে আগুন ধরে যায়। বিস্ময়কর ও ভিন্ন ধরনের এই আগুন নেভানোর বাহ্যত কোনো উপায় সাধারণ জনগণের জানা নেই। তারা এ ধরনের আগুনে প্রজ্বলমান ব্যক্তির গায়ে প্রচুর পানি ঢেলেও আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে আক্রান্ত লোকগুলো মোমের মত গলে-গলে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে ভিনিস হয়েছে।'

'মার্কিনিদের আরেকটি ভয়ংকর অস্ত্র হল হিটবোমা। এ সম্বন্ধে সালমানের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এটি এক্সরে রশ্মির মতো আলো বিকিরণকারী এক ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক মারণাস্ত্র। এর আলোকরশ্মি মানুষের শরীর ভেদ করে ভেতরের মাংসপেশীগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু বাহির থেকে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না। বিষাক্ত এ গ্যাসের যন্ত্রণায় মানুষ ছটফট করতে-করতে প্রাণ ত্যাগ করে। মার্কিন সংবাদসংস্থা ব্লুয়েমবার্গ নিউজ জানায়, পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম মিসাইল প্রস্তুতকারী কোম্পানি 'গভর্নমেন্ট ডিফেন্স জয়েন্ট রিথন' ইরাকে নিয়োজিত মার্কিন সেনাদের নিকট উক্ত বোমা পরীক্ষার জন্য হস্তান্তর করেছে। কোম্পানি ডিরেক্টর কর্নেল ডেভিট কার্ডার জানান, আগামী বছরের জুন (২০০5 সালের) নাগাদ এই হাতিয়ারের পরিপূর্ণ সংস্করণ সম্ভব হবে। অপরদিকে পেন্টাগনের এক শীর্ষ আমলা হোস্টন বিজনিস জার্মানকে জানায়, সত্যিকার অর্থেই আমরা এমন একটি হাতিয়ার বানিয়েছি, যা সহজেই মানুষকে হত্যা করতে সক্ষম।'

ফালুজা অভিযানে মার্কিনিরা সত্যি-সত্যিই এই ভয়াবহ অস্ত্রটির পরীক্ষা চালিয়েছে। কারণ, এর বৈশিষ্ট্যে যে বলা হয়েছে আলোক রশ্মির মতো, তা মানুষের সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অসহায়-অস্থির হয়ে ছটফট করতে-করতে মারা যায়। রাস্তা-ঘাটে বহু মানুষকে হুবহু ওই রকম মরতে দেখা গেছে। সুতরাং একথা জোর দিয়েই বলা যায়, আমেরিকা ফালুজায় নিষিদ্ধ ওইসব ভয়ংকর গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করে সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে।

◆◆◆

শেষ। সব শেষ। আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই শেষ। স্বপ্ন-স্বাদ শেষ। মার্কিনি হায়েনার হিংস্র-দানবীয় থাবায় ফালুজার সবকিছু শেষ। নগরীর যেদিকে যতদূর চোখ যায় ধ্বংস আর ধ্বংসই দেখা যায়। লাশ আর লাশ। বর্তমান ফালুজা লাশের নগরীতে পরিণত হয়েছে। গোটা ফালুজাই আজ এক গোরস্তান। উন্মুক্ত লাশের গোরস্তান। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গোরস্তান। কারণ, লাশ কবরস্থ করার মতো কেউ আর এখানে অবশিষ্ট নেই। ফালুজায় যেন কেয়ামত ঘটে গেছে। বর্বর মার্কিন হল এই ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক। এই নারকীয় তাণ্ডবলীলা ইতিহাসে এক মহাকলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে থাকবে। এর জন্য আবহমান কাল ধরে মানুষ আমেরিকার ললাটে ঘৃণাভরে থুতু ছিটাবে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঈগল ও সালমান দুজনই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছে। এখন আহতাবস্থায় পড়ে আছে লাশের মতো। সালমানের চেয়ে ঈগলের অবস্থা আরও শোচনীয়। তারা উভয়েই জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য তাদের কোনো আফসোস নেই। তারা শহীদ হতে পারছে এটাই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

রুকাইয়া ও নাঈমাও ফালুজা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ঈগল ও সালমান যে দিন ফালুজায় এসেছিল, তার দুদিন পরেই তারা দুজন ফালুজায় চলে এসেছে। কিন্তু তুমুল যুদ্ধের কারণে শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই পাশের উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে তারা অবস্থান নিল। সেখানে থেকে প্রতিদিন তারা মার্কিন বাহিনীর পেছন অংশে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে থাকে। দুবার মার্কিনিদের সেনাছাউনিতে আগুনও দিয়েছে তারা।

মার্কিন বাহিনী যখন ফালুজা নগরীতে চূড়ান্ত হামলা করে সবকিছু নাস্তানাবুদ করছিল, তখন উদ্বাস্তু শিবিরের কান্নাকাটি আর বিলাপ-আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গেল। রুকাইয়া-নাঈমাও আজ এই বিলাপে অংশ নিল। তাদের ধারণা, অন্যান্যের সাথে তাদের স্বামীরাও বুঝি শহীদ হয়েছে। ধীরে-ধীরে বিমান-কামানের শব্দ কমে এলে তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই লাশের সন্ধানে নগরীতে গেল।

ফালুজার নগরসীমায় প্রবেশ করে রুকাইয়া-নাঈমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে জন্মগ্রহণ করায় তারা এতটুকু জীবনেই বহু ধ্বংস, বহু লাশ দেখেছে। কিন্তু আজকের ফালুজা নগরীর ধ্বংস আর লাশের মিছিল দেখে তারা এতটা বিহ্বল হয়ে গেল যে, কান্নার কথাও ভুলে গেল। তারা একদিক থেকে লাশগুলো পরখ করতে শুরু করল। সহসা তাদের থেকে দু-তিনশ গজ দূরে একটা হাত উঁচু হল। বিষয়টি রুকাইয়ার নজরে পড়ল। প্রথমে তার মনে হল, কোনো লাশই বুঝি হাত জাগিয়ে দিয়েছে। তাই সে ভালো করে দেখল, হাতটা যেন ইশারায় তাদের ডাকছে। পরক্ষণেই হাতটা নেতিয়ে পড়ল।

রুকাইয়া নাঈমাকে নিয়ে উত্থিত হাতটার কাছে চলে এল। অকুস্থলে পৌঁছে তারা হতবাক হয়ে গেল। এ যে লাশের হাত নয়, তাদের পতিদ্বয় মুমূর্ষু অবস্থায় কাতরাছে! তারা উভয়ে চিৎকার দিয়ে তাদের মাথার কাছে বসে পড়ল। নাড়ি ধরে দেখল, উভয়েই জীবিত; তবে বেহুঁশ। এ অবস্থায় হাত কীভাবে জাগিয়েছিল, আল্লাহই ভালো জানেন।

নাঈমাকে মুমূর্ষু ঈগল-সালমানের কাছে রেখে রুকাইয়া ছুটল গাড়ির সন্ধানে। প্রথমেই তাদের গাড়িটা যেখানে ছিল সেখানে গেল। দেখল, সেটা আর অক্ষত নেই, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাই উদ্বাস্তু শিবিরের সন্নিকটে স্থাপিত রেডক্রিসেন্টের জরুরি চিকিৎসাসেবা তাঁবুতে গেল। তার সাথে দুজন সাহায্যকর্মী দিতে আবেদন জানাল। অল্প সময়ের মধ্যেই দুজন সাহায্যকর্মী এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তার সাথে চলল এবং রোগী নিয়ে এসে দ্রুত চিকিৎসা দিতে শুরু করল। আল্লাহর ইচ্ছায় ঈগল ও সালমান এ যাত্রায়ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। রাখেন আল্লাহ মারে কে?

– ২য় খণ্ড সমাপ্ত –

বাগদাদের
ঈগল
রফরফ বুক পয়েন্ট
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
COVER DESIGN
SALAHUDDIN JAHANGIR